

আউলিয়ায়ে নকশবন্দ

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

Special

Internet Edition

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আউলিয়ায়ে নকশবন্দ

(নকশবন্দী-মুজাদ্দিদী তরিকার মাশাইখে আজমের জীবন ও সাধনা)

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

KAA Publication

খানক্বায়ে-আমীনিয়া-আসগরিয়া

হাদিয়ায়ে সওয়াব-

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদীয়া তরিকার সকল আউলিয়ায়ে কিরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এর প্রতি।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের মাক্বামাতকে আরো বুলন্দ করুন।

কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জলিলুল ক্বদর খলিফা, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার সম্মানিত পরিচালক

হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী দা.বা. এর পক্ষ থেকে-

প্রাক কথন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা-বাদ-

আলহামদুলিল্লাহ! খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে আরো একটি দ্বীনি গ্রন্থ প্রকাশ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। খানক্বার প্রতিষ্ঠাতা সচিব লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী "**আউলিয়ায়ে নকশবন্দ**" শিরোনামের এই বড়ো বইটি রচনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত পাঠ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ উপকৃত হবে। আর তাঁর ওয়ারিস হিসেবে স্বীকৃত উলামা ও ওলিআল্লাহগণের জীবনী পাঠ করলেও অনুরূপ উপকৃত হওয়া যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় দীর্ঘদিনের চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে লেখক এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠকদের সম্মুখে হাজির করেছেন। আমি আশারাখি প্রত্যেক পাঠকই এ থেকে উপকৃত হবেন।

গ্রন্থে প্রথমত, পেয়ারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক ও সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। সকল সুফি তারিকার সিলসিলাই শেষোক্ত দুজন সাহাবী অথবা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছুয়েছে। সুতরাং যে কোনো তরিকার সিলসিলা মুতাবিক ওলিদের জীবনালোচনায় সিরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকবেই। সেসাথে থাকবে হযরত আলী কিংবা আবু বকর সিদ্দীক ও সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের জীবনাদর্শের আলোচনা।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগ পর্যন্ত জন্ম নেওয়া নকশবন্দিয়া সুফি তরিকার ৩৫ জন ওলির জীবন ও সাধনার উপর আলোচনা হয়েছে এ গ্রন্থে। ওলিদের জীবন খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের জীবনভর সাধনার বর্ণনা আমাদেরকে প্রভুপ্রেমের প্রতি আকর্ষিত করে। ওলিরা আমাদের আদর্শ। তাঁদের জীবনকাহিনী পাঠ করে যে কোনো বুদ্ধিমান

ব্যক্তিমাত্র উপদেশ গ্রহণ করে দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়ামী হাসিল করতে পারেন। আমি আশারাখি সুন্দর প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ থেকে সবাই উপকৃত হবেন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রার্থনা জানাই তিনি যেনো আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা। পাঠকরাও যাতে ওলিআল্লাহদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করে দ্বীনদারিত্বের প্রতি, তাসাওউফের সাধনার প্রতি আরো বেশি আগ্রহান্বিত হন, আমি এই কামনাই করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য করুন। আমিন।

ফারুক আহমদ
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।
২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

সূচিপত্র

হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পরবর্তী নকশবন্দী কয়েকজন মাশাইখের জীবন ও সাধনা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ তা'আলার শুকুর-গুজার করে শেষ করা যাবে না। তাঁর অনুগ্রহে এ অধম, বিখ্যাত সুফি তরিকা 'নকশবন্দি' শায়খদের জীবন ও সাধনার ওপর আলোচিত এ গ্রন্থটি সুপ্রিয় পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমার এ প্রচেষ্টা। এ থেকে একজন পাঠকও যদি উপকৃত হন তবুও আমার কষ্ট-সাধনা সফল হবে। আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনালোচনা থেকে উপকৃত হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। বিখ্যাত নকশবন্দী শায়খ খাজা ইউসুফ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো: "**যখন আল্লাহর ওলিগণ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান তখন আমরা কী করবো?**" তিনি বললেন, "**তাঁদের কথা ও উপদেশবাণীর পুনরাবৃত্তি করো।**" এতে বুঝা গেলো ওলিদের জীবনালোচনা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হওয়া যায়। বিশিষ্ট ওলিআল্লাহদের চিত্তাকর্ষক জীবনী গ্রন্থ পড়ে অনেক লোক সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমিয়েছেন বলেও বহু প্রমাণ বিদ্যমান। সুতরাং '**আউলিয়ায়ে নকশবন্দ**' শিরোনামের এ গ্রন্থটি পাঠ করে যদি কেউ সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমান তাহলে সবিনয় আবদার থাকবে, অনুগ্রহপূর্বক এ অধমের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে দুআ করবেন।

মহাত্মন আউলিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর প্রিয়জন। তাঁদের জীবন ও সাধনা সকল মুসলমানের জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা ও অনুসরণযোগ্য। তাঁদের জীবনালোচনা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা একটি দীর্ঘ সাধনা। আল্লাহর খাস অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া এরূপ কঠিন কাজ আঞ্জাম দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা-সাধনার বিনিময়ে চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি লিখে শেষ করার তাওফিক এনায়েত করায়, আমি অধম আবারও মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বেশ কিছুদিন হলো '**আউলিয়ায়ে চিশত**' শিরোনামে অনুরূপ আরেকটি গ্রন্থ রচনা করার তাওফিক হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার শায়খ

হযরত কুতবে জামান মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত মোট ৪২ জন '**চিশতি**' ওলিআল্লাহর জীবন ও সাধনার বর্ণনা এতে স্থান পায়। গ্রন্থটির প্রিন্ট প্রকাশনা করতে এখনও সক্ষম হই নি। তবে আল্লাহর দয়ায় এটি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া হিসেবে ইন্টারনেটে প্রকাশ করতে পেরেছি। দু-তিনটি ওয়েভসাইটে আপলোড করার পর বহু লোক এটি অনলাইনে ও ডাউনলোড করে পাঠ করেছেন এবং করছেন। সফলভাবে এটি প্রকাশের পর আমার মনে আগ্রহ জন্মে অনুরূপ '**নকশবন্দিয়া**', '**কাদিরিয়া**' ও '**সুহরাওয়ার্দিয়া**' তরিকার মাশাইখে কিরামের জীবন ও কর্মের ওপর যদি গ্রন্থ রচনা করা যেতো তাহলে কতোই না ভালো হতো। আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমান এ গ্রন্থটি সে আগ্রহের ফসল। সবার নিকট দুআপ্রার্থী বাকি দুটি প্রসিদ্ধ তরিকার শায়খদের জীবন ও সাধনার ওপর যেনো গ্রন্থ রচনা করে প্রকাশের তাওফিক আল্লাহ তা'আলা দান করেন।

সকল হক্কানি সুফি তরিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। সবগুলোর উৎপত্তিস্থল রাহমাতুল্লিল আলামিন, সায়্যিদিল মুরসালীন, ইনসানে কামিল, স্রষ্টার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম। '**তরিকা**' শব্দের অর্থ রাস্তা বা পদ্ধতি। প্রত্যেক সুফি তরিকার লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। যুগ যুগ ধরে বিশিষ্ট মাশাইখে কিরাম এ চরম-পরম লক্ষ্যর্জনের উপায় অবলম্বন হিসেবে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। প্রাথমিক যুগের আউলিয়ায়ে কিরাম বিভিন্ন তরিকার নামকরণ আলাদাভাবে করেন নি। অনেক পরে বিশিষ্ট শায়খ বা স্থানের নামে বিভিন্ন তরিকার নামকরণ হয়েছে। যেমন: '**চিশতিয়া**' নামকরণের কারণ হচ্ছে শাম [সিরিয়া] থেকে হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী [মৃ. ৯৪০ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাসাওউফচর্চার বিকাশ ঘটাতে স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে আফগানিস্তানের '**চিশত**' নামক জনপদে আসেন। তিনি পরবর্তীতে আবু ইসহাক শামী চিশতি হিসেবে পরিচিত হন। অনুরূপ বিখ্যাত ওলি হযরত আবদুল কাদির জিলানী [মৃ. ১১৬৬ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারে '**কাদিরিয়া**', হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী [মৃ. ১৩৮৯ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারে '**নকশবন্দিয়া**' এবং হযরত শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দী [মৃ. ১২৩৪ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির [মতান্তরে তাঁর চাচা হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি [মৃ. ১১৬৮ ঈ.] রাহিমাহুল্লার] নামানুসারে '**সুহরাওয়ার্দিয়া**' তরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত প্রত্যেক তরিকার ‘**জিকির**’, ‘**শুগুল**’, ‘**মুরাক্বাবা**’ ইত্যাদির মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া তরিকার মধ্যে জিকিরের ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো এই: চিশতি শায়খগণ জিকরে জলি [স্বরবে] এর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। অপরদিকে নকশবন্দি শায়খগণ জিকরে খফি [নিরবে] এর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেহেতু এ গ্রন্থে নকবন্দিয়া তরিকার শাইখুল মাশাইখের জীবন ও কর্মের ওপর আমরা আলোচনা করেছি তাই এ তরিকার নিয়ম-কানুন সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনার প্রয়াস পাচ্ছি।

নকশবন্দি সুফি তরিকা[1]

নকশবন্দিয়া তরিকামতে মানবদেহে ১০টি সূক্ষ্ম বিন্দু আছে যেগুলোকে ‘লাতাইফ’ [একবচনে লতিফা] বলে। এগুলো হচ্ছে: ৫টি যার মূল আলমে আমর [নির্দেশ জগত]। যথা:- (১) ক্বলব, (২) রূহ, (৩) সির, (৪) খফি ও (৫) আখফা। ৫টি যার মূল আলমে খালক্ব [সৃষ্ট জগত]। যথা:- (১) নফস, (২) আব [পানি], (৩) আতশ [আগুন], (৪) খাক [মাটি] ও (৫) বাদ [বাতাস]।

‘**আলমে আমর**’ থেকে আগত সূক্ষ্ম বস্তু এসেছে আল্লাহর ‘**কুন**’ [হও!] নির্দেশের মাধ্যমে। এ নির্দেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাথে সাথে যা হওয়ার হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আছে:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ * وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

-“তিনি [আল্লাহ] নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, ‘হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।” [২:১১৭]

‘**আলমে খালক্ব**’ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

[1] সূত্র: http://maktabah.org

-"নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে [৬টি কালে] সৃষ্টি করেছেন।" [৭:৫৪]

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে '**আলমে খালক্ব**' সৃষ্ট হয়েছে ক্রমান্বয়ে। নকশবন্দী সৃষ্টিতত্ত্ব মুতাবিক '**দাইরাল ইমকান**' বা '**সম্ভাব্যতার চক্র**' হচ্ছে আলমে আমর ও আলমে খালক্বের সমন্বিত আলম বা জগত। আরশে আজিম স্থিত আছে দাইরাল ইমকানের মধ্যস্থলে। আরশ দ্বারা দাইরাল ইমকান দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। আলমে আমর আরশের উর্ধ্বে ও আলমে খালক্ব আরশের নিচে। নিচের টেবিলে ৫টি আলমে নির্দেশের লাতাইফের আরো পরিচিতি তুলে ধরেছি।

ক্র. নং	**নাম**	**অর্থ**	**রং**	**নবী (আ.)**	**উপশম**
১	কলব	হৃদয়	হলুদ	আদম (আ.)	জৈবাকাঙ্ক্ষা
২	রূহ	আত্মা	লাল	ইব্রাহিম ও নূহ [আ.]	রাগ
৩	সির	সঙ্গুপ্ত	সাদা	মূসা [আ.]	লিপ্সা
৪	খফি	লুকানো	কালো	ঈসা [আ.]	হিংসা
৫	আখফা	সর্বাধিক লুকানো	সবুজ	মুহাম্মদ [সা.]	ঔদ্ধত্য

আলমে আমরের পাঁচ লতিফার জিকির

[**বিশেষ দ্র:** *এটা জানা থাকা দরকার যে, নকশবন্দি হক্কানী কোনো শায়খের মুরিদ এবং নির্দেশনা ছাড়া নিচে বর্ণিত জিকির-মুরাক্বাবার আমল সবার জন্য করা উচিৎ নয়। মুরিদ না হয়ে বিনা অনুমতিতে জিকির করলে উপকারের বদলে অপকার হতে পারে। সুতরাং পাঠকরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন এটাই কাম্য।*]

১. লতিফায়ে কলবের জিকির: কলবের অবস্থান হচ্ছে বায়ের স্তনের বোঁটা থেকে দু আঙ্গুল নিচে কিছুটা বুকের দিকে। শায়খ যখন নতুন মুরিদকে জিকিরের প্রশিক্ষণ শুরু করেন তখন তিনি তাঁর তর্জনী [নির্দেশক আঙুল] কলবের উপর রেখে কিছুটা চেপে ধরেন। এরপর বলেন, "**আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ**"। একই সময় তিনি মুরিদের কলবের মধ্যে আধ্যাত্মিক তাওয়াজ্জু প্রদান করেন। [অবশ্যই এ পদ্ধতি শুধুমাত্র পুরুষ মুরিদের

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।] প্রথমিক পর্যায়ে মুরিদ স্বরবে নিজের কলবের দিকে খিয়াল করে এ জিকির করবে। পরে এ জিকির হবে ধ্যানের মাধ্যমে নিরবে। এ জিকির সর্বদা চালিয়ে যেতে মুরিদকে তাগিদ করা হয়। এ জিকির দ্বারা হৃদয়ে স্বচ্ছতা আসে। দুনিয়াবী আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শরীয়তের ও রাসূলের সুন্নাত পালনে আগ্রহ জন্মে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বত অন্তরে পয়দা হয়। প্রাথমিক এই জিকিরে সফলতা আসলেই পরবর্তী জিকিরের নির্দেশ আসবে শায়খ থেকে।

২. লতিফায়ে রূহের জিকির: রূহের অবস্থান হচ্ছে ডান স্তনের বোঁটা থেকে দু আঙ্গুল নিচে কিছুটা বুকের দিকে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে মুরিদকে এই লতিফার দিকে খিয়াল করে '**আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ**' জিকির করতে হবে। এই জিকিরের সফলতার নিদর্শন হচ্ছে মুরিদের মধ্যে ধৈর্যশক্তি বৃদ্ধি পাবে। রাগ-গোস্বা কমবে ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে। তার দিল হবে নরম। সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণের প্রতি সে আরো বেশি অনুরক্ত-আসক্ত হবে।

৩. লতিফায়ে সির-এর জিকির: লতিফায়ে সির-এর অবস্থান হচ্ছে স্তনের বোঁটা থেকে দু আঙ্গুল নিচে কিছুটা বুকের কড়ির দিকে। উপরে বর্ণিত [১ নং] পদ্ধতিতে এ লতিফার দিকে খিয়াল করে মুরিদকে '**আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ**' ইসমে জাতের জিকির করতে হবে। এ জিকিরের মাধ্যমে মুরিদের অন্তর থেকে লিপ্সা নামক আধ্যাত্মিক রোগ বিলুপ্ত হবে। সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে আগ্রহী হবে। গরীব-মিসকিনদের প্রতি দয়ার্দ্রদিল হবে।

৪. লতিফায়ে খফির জিকির: এই লতিফার অবস্থান ডানের স্তনের বোঁটা থেকে দু আঙ্গুল নিচে কিছুটা বুকের কড়ির দিকে। এ লতিফার দিকে খিয়াল করে মুরিদকে ইসমে জাত তথা '**আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ**' এর জিকির করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ জিকিরের সফলতার চিহ্ন হচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষের অনুভব থেকে মুরিদ নিষ্কৃতি পাবে। মানুষের দুনিয়াবী উৎকর্ষতা দেখে সে কখনও হিংসা করবে না।

৫. লতিফায়ে আখফার জিকির: এই লতিফার অবস্থান হচ্ছে বুকের ঠিক মধ্যস্থলে। মুরিদকে এই স্থানের দিকে খিয়াল রেখে ইসমে জাতের জিকির করতে হবে। এই জিকির জারি হয়ে গেলে আধ্যাত্মিক রোগ গর্ব ও ঔদ্ধত্যতার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

আলমে খালকের পাঁচ লতিফার জিকির

৬. লতিফায়ে নফসের জিকির: কোনো কোনো শায়খের মতে নফসের অবস্থান নভিমূলে। তবে হযরত আহমদ ফারুকী মুজাদ্দিদী আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহর মতে এর অবস্থান ভ্রূযুগলের মধ্যখানে কপালে। শায়খ যেখানেই এর অবস্থান বললেন সেদিকে খিয়াল করে মুরিদকে ইসমে জাতের জিকির করতে হবে। এই জিকির দ্বারা নফসের ঔদ্ধত্যতা, বাতিল খাহিশাত ইত্যাদি মুছে যাবে।

৭. আব, আতশ, বাদ ও খাকের জিকির: এই চারটি লতিফা মূলত মানবদেহের উপাদান। এগুলোর সমন্বয়ে পুরো দেহ গঠিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মানবদেহ মূলত মাটি থেকেই সৃষ্টি। তবে জানা থাকা প্রয়োজন যে, বাতাস অর্থে সব ধরনের গ্যাসীয় বস্তু বুঝায়। যেমন: অক্সিজেন, কার্বন ডাইয়োক্সাইড ইত্যাদি। আগুন অর্থে দেহের তাপমাত্রা বুঝায়। দেহের ৬০% পানির তৈরি। সুতরাং বলা যায়, দেহের মধ্যস্থ চারটি লতিফা সর্বাঙ্গে বিস্তৃত আছে। নকশবন্দী শায়খগণ সাধারণত এই চার লফিফার জিকিরের সময় মাথার উপরিস্থ উম্মুগ দিমাগের দিকে খিয়াল করার কথা বলে থাকেন। এ জিকিরের অপর নাম **সুলতানুল আজকার**। এই জিকির দ্বারা সালিকের দেহের প্রতিটি অনু-পরমাণু আল্লাহর স্মরণে ডুবে যায়। ক্রমান্বয়ে সালিক দেখতে পাবে সমগ্র মহাবিশ্বের সবকিছু ইসমে জাতের জিকিরে প্রতিনিয়ত লিপ্ত আছে। সে বুঝতে সক্ষম হয় যে, সবকিছুর অস্তিত্ব মূলত আল্লাহর স্মরণের ওপর নির্ভরশীল। এক ক্ষণকালও কোনো কিছু মহাপ্রভুর স্মরণ থেকে গাফিল থাকতে পারে না। গাফিল হলে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

উচ্চ পর্যায়ের জিকির-মুরাক্বাবা

উপরোক্ত ৭ ধরনের জিকির যখন সালিকের মধ্যে জারি হবে তখনই শায়খ তাকে আরো অগ্রসর হতে আদেশ দিবেন। নিচে বাকি জিকির-মুরাক্বাবার বর্ণনা তুলে ধরছি।

৮. নফি-ইসবাতের জিকির: '**নফি**' শব্দের অর্থ '**অস্বীকৃতি**' এবং '**ইসবাত**' শব্দের অর্থ '**স্বীকৃতি**'। '**লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ**' -জিকিরের মধ্যে দুটি অংশ আছে। প্রথমটি হচ্ছে: লা-ইলাহা [কেনো ইলাহ নেই], এ অংশের নাম নফি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে: ইল্লাল্লাহ [আল্লাহ

ছাড়া, কিন্তু আল্লাহ আছেন, শুধু আল্লাহ], এ অংশের নাম ইসবাত। তরিকতের মাশাইখে কিরাম বলেন, নফি অংশ পাঠের সময় খিয়াল করতে হবে '**সবকিছু ধ্বংস হয়েছে**'। আর ইসবাত অংশ পাঠের সময় খিয়াল করতে হবে '**আছেন শুধু এক আল্লাহ**'। নকশবন্দিয়া তরিকায় নফি ইসবাতের জিকিরকালে মুরিদকে প্রথমত শ্বাস গ্রহণ করে দম বন্ধ রাখতে হবে। খিয়াল রাখবে নাভিমূরের নিচে। এরপর খিয়ালের মাধ্যমে '**লা-**' শব্দকে সেখান থেকে টেনে কপাল পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এরপর '**ইলাহা**' শব্দকে অনুরূপ কপাল থেকে টেনে ডান কাঁধে নিয়ে আসতে হবে। এবার এখান থেকে '**ইল্লাল্লাহ**' শব্দ টেনে এনে কলবের মধ্যে ধাক্কা [জরব] দিতে হবে। প্রত্যেক দমে এভাবে তিনবার জিকির করা হয়ে থাকে। যখন দম ছাড়বে তখন মনে মনে '**মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**' বলবে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে নফি-ইসবাতের জিকির হবে নিরবে। দেহের মধ্যে কোনো ধরনের হরকতও স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করা যাবে না। মনে রাখা দরকার যে, লা-ইলাহা বলার সময় খিয়াল করতে হবে, কিছুই অস্তিত্বশীল নয়- সবকিছু বিলুপ্ত হয়েছে। আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় খিয়াল করতে হবে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা চিরঅস্তিত্বশীল আছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই জিকির প্রত্যেক দমে তিনবার করে হবে। ক্রমে এর মাত্র বাড়িয়ে ৫, ৭, ৯ থেকে ২১ বার পর্যন্ত করতে হবে। লক্ষ্য করুন, জিকির হবে 'বিজোড়' সংখ্যায়। একে '**উকুফী আদাদি**' বলে। তবে বিজোড় হওয়া শর্ত নয়- উত্তম। এছাড়া মুরিদ যদি দম আটকে রাখতে অপারগ হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

৯. জিকরে তাহলিল লিসানী: উপরোক্ত '**লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ**' -জিকির জিহ্বা দ্বারা স্বরবে করাকেই বলে জিকরে তাহলিল লিসানী। এ ক্ষেত্রে আরো পার্থক্য হচ্ছে জাকিরকে দম আটকানোর প্রয়োজন হয় না। প্রত্যহ অন্তত ১১০০ বার এ জিকির করতে হয়। ক্রমান্বয়ে এর মাত্রা বাড়িয়ে ৫০০০ করা হবে।

মুরাক্বাবার পদ্ধতিসমূহ

মুরাক্বাবা [ধ্যান] হচ্ছে এই তরিকার উচ্চ পর্যায়ের সালিকদের জন্য খাস। এর মাধ্যমে আলমে আমরের লাতাইফকে পরিশুদ্ধ করা হয়। মুরাক্বাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে '**ফয়েজের**

সূত্র থেকে ফয়েজ লাভের জন্য অপেক্ষা করা'। যখনই প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো ফয়েজ কোনো বিশেষ লতিফায় অবতরণ করে তখন এ লফিফাকে বলে, "**ফয়েজের প্রাপক**" [হিদায়াতুত তালিবীন]।

মুরাক্বাবার মৌলিক পদ্ধতি হচ্ছে এই: মনকে সম্পূর্ণরূপে যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করা। এরপর যে লতিফার দিকে নিবিষ্ট থকবে সেথায় ফয়েজ অবতরণের জন্য অপেক্ষা করা। যেহেতু ফয়েজ একই সময় একাধিক লতিফায় অবতরণ করতে পারে তাই একাধিক লতিফার মুরাক্বাবা করার সবক দেওয়া হয়।

প্রত্যেক মুরাক্বাবার একেকটি নিয়ত আছে। নিয়ত করার পরই মুরাক্বাবা শুরু হবে। নিচে কয়েকটি মুরাক্বাবার বর্ণনা তুলে ধরছি।

১. দাইরাতুল ইমকান: এ শব্দ দুটোর অর্থ হচ্ছে সম্ভাব্যতার চক্র। এটাই হচ্ছে নকশবন্দী মুরাক্বাবার প্রথম চক্র। এতে একটি মুরাক্বাবা করা হয় যাকে বলে, "**মুরাক্বাবায়ে আহাদিয়াত**" [একত্বের মুরাক্বাবা]। এর পূর্ণ নাম '**মুরাক্বাবায়ে আহাদিয়াতাস সিরফাহ**' [পবিত্র এককত্বের মুরাক্বাবা]। এ মুরাক্বাবার হিদায়াতুত তালিবীন [প্রাপক] হচ্ছে লতিফায়ে কলব। এটা শুরুর পূর্বে নিয়ত করতে হবে:
"**আমার কলবের মধ্যে আল্লাহর এককত্বের পবিত্র সত্তা থেকে ফয়েজ আসছে। সে সত্তা সকল ধরনের কমতি থেকে মুক্ত। যে সত্তার পবিত্র জাত নাম আল্লাহ।**"

এই মুরাক্বাবার মাধ্যমে সালিকের মনে অপকারী অধিক চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটবে এবং সে সর্বদা মহাপ্রভু আল্লাহর দিকে নিজের চিন্তা-চেতনাকে নিবদ্ধ রাখতে সক্ষম হবে। এই মুরাক্বাবার মাধ্যমে সফলতা লাভের ইঙ্গিত হচ্ছে: বারো ঘন্টা পর্যন্ত সালিকের অন্তরে অপর কোনো চিন্তা প্রবেশ করবে না।

বেলায়েতে সুগরা: বেলায়েতে সুগরা অর্থ "**গৌণ ওলিত্ব**"। এটাই হচ্ছে ওলিদের বেলায়েতের স্তর। বেলায়াতে কুবরা বা '**উচ্চ ওলিত্ব**' হচ্ছে একমাত্র নবী-রাসূলদের জন্য খাস। গৌণ ওলিত্বের স্তরের কিছু মুরাক্বাবা নিচে বর্ণিত হলো।

২. মুরাক্বাবায়ে লতিফায়ে কলব: এ মুরাক্বাবার ফয়েজ প্রাপক হচ্ছে লতিফায়ে কলব। সালিক তাঁর হৃদয়কে নিজের মুর্শিদের ওয়াসিলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় মুবারকের সামনে রাখবে। এরপর নিয়ত করবে:

“ইয়া আল্লাহ! তাজাল্লিয়াতুল আলিয়া’র যে ফয়েজ আপনি রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কলবে ঢেলে দিয়েছেন, সে ফয়েজ আমার কলবেও আমার মুর্শিদের মাধ্যমে ঢেলে দিন।”

এই মুরাক্বাবা থেকে কলবের লতিফা ফানার স্তরে উপনিত হয়। সালিক কলবের বেলায়েত লাভ করেন। আর এটা হচ্ছে বেলায়েতের নিম্ন বা গৌণ স্তর। এই স্তরে উন্নীত সালিক জগতের যাবতীয় ক্রিয়া একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকে হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং আনন্দ-ফুর্তি ও কষ্ট-যন্ত্রণা তাকে আর প্রভাবিত করতে পারে না। সে সবকিছু প্রেমাস্পদের নিকট থেকে আসছে দেখতে পায়। আর প্রেমাস্পদের তরফ থেকে আগত সবই প্রেমাস্পদই।

৩. মুরাক্বাবায়ে লতিফায়ে রূহ: এ মুরাক্বাবার ফয়েজের প্রাপক হচ্ছে লতিফায়ে রূহ। সালিক তার রূহকে স্বীয় পীরের রূহের ওয়াসিলায় রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারকের সম্মুখে উপস্থিত করবে। এরপর নিয়ত হবে নিম্নরূপ:

“ইয়া আল্লাহ! তাজাল্লিয়াতে সিফাতুত তুবুতিয়্যা’র যে ফয়েজ আপনি রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রূহতে ঢেলে দিয়েছেন, সে ফয়েজ আমার মুর্শিদের ওয়াসিলায় আমার রূহতেও ঢেলে দিন।”

এই লতিফার সম্পর্ক হচ্ছে সিফাতুত তুবুতিয়্যা বা অস্তিত্বের গুণবলীর সঙ্গে। এগুলো হলো: **হায়াত [জীবন], ইলম [জ্ঞান], কুদরত [ক্ষমতা] ও অন্যান্য।**

৪. মুরাক্বাবায়ে লতিফায়ে সির: এই মুরাক্বাবার ফয়েজের প্রাপক হচ্ছে লতিফায়ে সির। সালিক তার সিরকে স্বীয় মুর্শিদের সির-এর ওয়াসিলায় রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সির মুবারকের সম্মুখে উপস্থিত করবে। এরপর নিয়ত হবে নিম্নরূপ:

“ইয়া আল্লাহ! তাজাল্লিয়াতে শুয়াইনি জাতিয়া’র তুবুতিয়্যা’র যে ফয়েজ আপনি রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সির-এ ঢেলে দিয়েছেন, সে ফয়েজ আমার মুর্শিদের মাধ্যমে আমার সিরেও ঢেলে দিন।”

৫. মুরক্কাবায়ে লতিফায়ে খফি: এ মুরাক্বাবার ফয়েজের প্রাপক হচ্ছে লতিফায়ে খফি। সালিক তার খফিকে স্বীয় মুর্শিদের খফির মাধ্যমে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খফি মুবারকের সম্মুখে উপস্থিত করবে। এরপর নিয়ত হবে নিম্নরূপ:
“ইয়া আল্লাহ! তাজাল্লিয়াতে সিফাতে সালবিয়া’র যে ফয়েজ আপনি রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খফিতে ঢেলে দিয়েছেন, সে ফয়েজ আমার খফিতেও আমার মুর্শিদের ওয়াসিলায় ঢেলে দিন।”

৬. মুরাক্বাবায়ে মা’ইয়াত: এটা হচ্ছে আল্লাহ হাজির-নাজির এর হাক্বিকাত লাভের মুরাক্বাবা। আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

-“তিনি [আল্লাহ] তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যেখানেই থাক, তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।” [হাদিদ: ৪]

উক্ত আয়াতের দিকে গভীরভাবে ধ্যান করা ও অর্থের প্রতি খিয়াল রাখা হচ্ছে এই মুরাক্বাবার উদ্দেশ্য। এর ফয়েজ অবতরণ করে লতিফায়ে কলবে।

উপরে আমরা কয়েকটি মাত্র জিকির-মুরাক্বাবার বর্ণনা তুলে ধরেছি। নকশবন্দিয়া তরিকায় আরো অনেক ধরনের উচ্চতর মুরাক্বাবা আছে। শায়খগণ মুরিদের হাল মুতাবিক এসব মুরাক্বাবার সবক দিয়ে থাকেন।

এ গ্রন্থে আমরা প্রথমে নকশবন্দিয়া স্বর্ণালী সিলসিলা মুতাবিক হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত সালমান ফারসি রাহিদ্বাআল্লাহু আনহুমার জীবনালোচনা এসেছে। এরপর ধারবাহিকভাবে সিলসিলা মুতাবিক ইমামুত তারিকা হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত ওলিদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

এখান থেকে হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত সিলসিলা মুতাবিক ওলিদের জীবনী লিপিবদ্ধ করার পর আধুনিক যুগ পর্যন্ত আরো কয়েকজন ওলির জীবনালোচা করেছি। সুতরাং গ্রন্থে রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবি আবু বকর সিদ্দীক ও সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনমহ্মা ছাড়াও নকশবন্দি তরিকার আরো ৪৫ জন শাইখুল মাশাইখের জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা হয়েছে। আমি আশারাখি পাঠকরা এ গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হবেন।

গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে যাঁরা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের মধ্যে খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং আমার শায়খ কুতবে জামান হযরত মাওলানা শায়খ মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর জলিলুল ক্বদর খলিফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম অন্যতম। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা হযরতকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন। আরো যাঁরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন খলিফায়ে মদনী হারযম মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি রাহিমাহুল্লাহর নাতি মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান [খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার সম্মানিত সচিব], কবি আবদুল মুকিত মুখতার [খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা বিভাগের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী] এবং ড. মোহাম্মদ শামিম খান [খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা বিভাগের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী]। আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াব করুন। আমীন।

ভুল-ত্রুটির জন্য সর্বাগ্রে আমি মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকদের নিকট ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করবো। হে আল্লাহ! গ্রন্থের পাঠকদেরকে আপনি দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াব করুন। আমিন।

গ্রন্থকার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرفالنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওফাৎ ১০ হিজরি, ১২ই রবিউল আউয়াল, মাজার শরীফ-মদীনা মুনাওয়ারাহ

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইতিহাস।

রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, রাহাতুল আশিকীন, সায়্যিদিল মুহিব্বীন, ইমামুত তারিক্বাত ওয়াশ শারিয়াত হযরত মুহাম্মদ আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয় পবিত্র মক্কা নগরীতে ঈসায়ী ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ প্রভাতকালে। তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের একটি দুআর বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের শুভাগমনের সুসসংবাদ দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ দু'আটি উল্লেখিত হয়েছে:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

-হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও

হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হিকমাতওয়ালা। [২:১২৯]

হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতে করীমের তাফসীরে বলেন:
"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র কুরআন শিক্ষা দেন নি। কারণ তাঁর মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রাজ্ঞতার সঠিক দিক-নির্দেশানাও প্রদান করতে চেয়েছেন। সুতরাং তিনি শুধুমাত্র শরীয়তের আইন-কানুন শিক্ষা দেন নি, বরং সাধারণ লোকদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন জীবন-চলার সঠিক পথনির্দেশনা এবং বিশেষ ব্যক্তিদেরকে শিখিয়েছেন সূক্ষ্ম জ্ঞান ইঙ্গিত-ইশারায়। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গুরু। তাদের পবিত্র করবেন- কথাটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে, অন্তর বা হৃদয়কে পবিত্রকরণ। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের মিশন শুধুমাত্র কথা ও আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। তিনি উত্তম চরিত্রগঠন ও নিয়তের বিশুদ্ধতাও প্রবর্তন করেন। রাসূল হিসেবে তাঁর চতুর্থ দিকটি হচ্ছে, তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ চরিত্র গঠনের মহাসংস্কারক।"

জগতে শুভাগমন ও নামকরণ

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত, আসহাবে ফীলের বছর তথা হস্তীবাহিনী দ্বারা ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা যে বছর মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল সে বছরই রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরার বুকে শুভাগমন করেন। ঠিক কোন তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায়। সকলেই এটা মেনে নিয়েছেন যে, শুভজন্মের দিন ছিলো সোমবার এবং সময় ছিলো সুবহে সাদিক। তারিখের ব্যাপারে চারটি রিওয়ায়েত বিদ্যমান: ২য়, ৮ম, ১০ম ও ১২তম রবিউল আউয়াল। এছাড়া ঈসায়ী ৫৭০ এবং কারো কারো মতে ৫৭১ সন হযরতের জন্মের বছর ছিলো বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিশ্ব-ভূবন আলোকিত করে হিদায়াতের নূরের রবি একদিকে মক্কা মুকাররমায় মা আমিনার কোলে উদিত হলেন আর অপরদিকে ভীষণ ভূমিকম্পে পারস্যের সম্রাট খসরুর রাজপ্রাসাদ ধ্বসে পড়লো। অগ্নিপূজার হাজার বছরের নিদর্শন যুগ যুগব্যাপী জ্বলন্ত অনির্বাণ অগ্নিশিখা নিভে গেল। শুকিয়ে গেল পারস্য উপসাগর। এসব অলৌকিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণ হলো যে, আখিরী নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মনোনীত মহাসত্যের মহান দ্বীন মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করতে ধরার বুকে শুভাগমন করেছেন। তাঁর জন্মক্ষণে স্বীয় স্নেহময়ী মা আমিনার উদর হতে নূরের ঝলক সৃষ্টি হয়েছিল যার আলোতে সারা বিশ্বজগৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের জন্য। সীরাত লেখকগণ হযরতের জন্মক্ষণের সময়কার আরোও অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সবই ছিলো আখিরী নবীর শুভাগমনের নিদর্শন।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে হযরতের ‘মুহাম্মদ’ নামটি তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব রেখেছিলেন। জন্মের পর আরবের রীতি অনুযায়ী শিশুর 'আক্বীকা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন আব্দুল মুত্তালিব। সবাই যখন জিজ্ঞেস করলেন, শিশুর নাম কি রেখেছেন? তিনি তখন বলে উঠলেন, "মুহাম্মদ"। সকলে অবাক হয়ে বলতে লাগলেন, মুহাম্মদ! এই নামটি তো আমরা কেউ কোনদিন শোনি নি! আব্দুল মুত্তালিবের মুখ থেকে এই নতুন নামটি যেনো অদৃশ্যের ইশারায় বেরিয়ে আসে। সুতরাং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামকরণ হলো 'মুহাম্মদ'। তবে তাঁর মাতা আমিনাও একটি নাম রাখেন আর তাহলো- 'আহমদ'। উভয় নামই ঐশি ইশারায় রাখা হয়েছিল। মুহাম্মদ (محمد) শব্দের অর্থ প্রশংসিত আর আহমদ (احمد) অর্থ প্রশংসাকারী। বলাই বাহুল্য আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত ব্যক্তি। এছাড়া মানবজাতির মধ্যে মহান আল্লাহ পাকের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসা যে ব্যক্তি করেছেন তিনিও ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং তাঁর উভয় নামই স্বার্থক হয়েছে। এ দু'টো নাম ছাড়াও হযরতের আরো অনেক গুণবাচক নাম ছিলো।

দুগ্ধমাতা হালিমার গৃহে গমন ও শৈশবকাল

আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীম অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছিলেন। এরপর আরবের প্রথানুযায়ী তাঁকে দুগ্ধ পানের জন্য ধাত্রী মা হালিমার গৃহে গমন করতে হয়েছিল। সহীহ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মা হালিমার গৃহে গমন করার পর থেকেই বরকত নাজিল হতে থাকে। বিবি হালিমার উট, বকরি ইত্যাদি পোষা পশুর মধ্যে এই বরকত আত্মপ্রকাশ করে। এগুলো অতিরিক্ত দুধ যোগান দিতে থাকে। হালিমার সংসারে উত্তরোত্তর উন্নয়ন হওয়া শুরু হয়। এ সম্পর্কিত বর্ণনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে এসেছে। তবে বিবি হালিমার গৃহে থাকাকালে চার বছর বয়সের সময় শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম সীনা ছাকের ঘটনাটি ঘটে। তাঁর জীবনে আরোও তিনবার সীনা ছাক হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়বার সীনা ছাক হয়েছিল দশ বছর বয়সের সময়। তৃতীয়বার এই মু'জিযা ঘটে নুবুওয়াত-প্রাপ্তির প্রাক্কালে এবং চতুর্থবার সীনা ছাকের ঘটনা ঘটে মিরাজে গমনের পূর্ব মুহূর্তে।

মাতৃবিয়োগ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট পাঁচ বছর ধাত্রীমাতা বিবি হালিমা সা'দিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তবে আপন মাতা বিবি আমিনার গৃহে প্রত্যাবর্তনের মাত্র বছর খানেকের মধ্যেই তিনি দুঃখের সাগরে ভেসে গেলেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটি বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি উল্লেখ করলাম।

বিবি আমিনার গৃহে উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা নামক একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। পরবর্তীতে এই মহিলা সাহাবিয়্যাহ, মুক্ত হয়ে যান। এই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বিবি আমিনা একদা ছয় বছরের শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ ইয়াসরিব (মদীনা) ভ্রমণে যাত্রা করলেন। ইয়াসরিব ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতামহের মাতুতালয়। কিছু কিছু সীরাত লেখকের মতে এই সফরের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। বিবি আমিনা তাঁর আদরের দুলালকে স্বীয় স্বামীর কবরটি জিয়ারত করানোরও নিয়ত

করেছিলেন। যা হোক, মাতা-পুত্র ও পরিচারিকা উম্মে আইমান উটের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চললেন। কয়েকদিন পর তারা ইয়াসরিবে এসে উপনীত হন। এখানে হযরতের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মাতা সালমা বিনতে আমর বানূ আদিয়্যা ইবনুন নাজ্জার গোত্রের মেয়ে ছিলেন, বিধায় তারা এই বংশের 'দারুন-নাবিগা'য় অবস্থান করেন। উল্লেখ্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের জন্ম ও শৈশবকাল এখানেই কেটেছিল।

দারুন-নাবিগায় দীর্ঘ এক মাস অবস্থানের পর বিবি আমিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আবওয়া নামক স্থানে এসে পৌঁছলে আমিনা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং একমাত্র প্রাণপ্রিয় আদুরে দুলালের দিকে করুণ নেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে এই ধরার কোল থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করলেন। উম্মে আইমান শিশু মুহাম্মদ মুস্তফাকে নিয়ে এই বিপদক্ষণে বিরাট ধৈর্য ধারণ করলেন ও আমিনাকে সেখানেই দাফন করে দ্রুত মক্কা শরীফের পথে পাড়ি জমালেন। এই করুণ হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিপটে জাগরুক ছিলো। হিজরতের পর বানূ আদিয়্যা ইবনুন-নাজ্জার এর মনযিল ও আবাসস্থল অতিক্রমকালে তিনি একবার বলেছিলেন: "শৈশবে আমি যখন আমার মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, তখন বানূ আদিয়্যার এই স্থানে আমি আমার মাতুতালয়ের শিশুদের সাথে খেলা করতাম এবং টিলার উপর বসে থাকা পাখীদেরকে আমরা সবাই উড়িয়ে দিতাম।" এরপর তিনি দারুন-নাবিগার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন: "আমার মাতা এবং আমি এখানেই এসেছিলাম। এই গৃহের মধ্যেই আমার পিতা আব্দুল্লাহর কবর রয়েছে। আর এই ঝিলের জলেই আমি প্রচুর সাঁতার কেটেছি।"

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে

উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে মক্কা শরীফ পৌঁছে আমিনার মৃত্যুর দুঃসংবাদ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে বর্ণনা করলেন। আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং পিতামাতাহীন অসহায় আদুরে পৌত্রের ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। নিজের পুত্র-পৌত্রদের তুলনায় অধিক

বেশী আদর করে তিনি শিশু মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালন করতে থাকেন। সীরাত লেখকগণ উল্লেখ করেছেন, আব্দুল মুত্তালিব তার আদুরে নাতি ছাড়া খাওয়া-পিনা করতেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামও অবাধে স্বীয় দাদার নিকট আসা-যাওয়া করতেন, তার আসনে উঠে বসে যেতেন। কুরাইশ নেতা আব্দুল মুত্তালিবের জন্য কাবা শরীফের পাশেই একটি বড় আসন পাতা ছিলো। গোষ্ঠির অন্যান্য সকলেই এই আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় আব্দুল মুত্তালিবের চতুর্পার্শ্বে বসতেন। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলে আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে আদর করে নিজের কাছে এনে আসনে বসিয়ে দিতেন। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে সেখান থেকে নেমে আসতে বলতেন, তখন আব্দুল মুত্তালিব তাদের থামিয়ে অত্যন্ত গর্বভরে মন্তব্য করতেন, আমার এই সন্তানকে এখানে বসতে দাও। সে ভবিষ্যতে এমন বড় মসনদের অধিকারী হবে যা ইতোমধ্যে কোনো আরব ব্যক্তির ভাগ্যে জুটে নি এবং কোনো কালেও জুটবে না। তিনি হযরতের একান্ত পরিচারিকা উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহাকেও সতর্ক করে দিতেন যে, তিনি যেনো তাঁকে দেখাশোনার ক্ষেত্রে একটুও অলস কিংবা উদাসীন না হোন। হযরত উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা এই দায়িত্ব অত্যন্ত স্নেহ-প্রীতি ও দৃঢ়চিত্তে পালন করেছিলেন। এই ভাগ্যবতী মহিলার আসল নাম ছিলো বারাকাত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরাধিকারসূত্রে আবিসিনীয় হাবসী এই ক্রীতদাসীর মালিক হোন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তিনি উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে চিরতরে মুক্ত করে দেন। পরবর্তীতে হযরতের পালকপুত্র হযরত যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এই বিয়ের ফলেই তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উসামা বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হযরত উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

পিতা-মাতা হারা শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র দু'বছর স্বীয় দাদা আব্দুল মুত্তালিবের অফুরন্ত স্নেহ-মমতায় লালিত পালিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কারণ দুই বছর পরই তিনি পরলোকগমণ করেন। এই মৃত্যুতে নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকাহত হয়েছিলেন এবং তিনি অনেকের মতো চোখের পানি আটকে রাখতে পারেন নি। বাস্তবে কুরাইশদের প্রসিদ্ধ এই নেতার মৃত্যুতে পুরো মক্কা শহরই শোকাকুল ছিল। আব্দুল মুত্তালিব তার দীর্ঘ জীবনে (কারো কারো মতে তিনি ১৪০ বছর জীবিত ছিলেন) অনেককিছু দেখেছেন। আবরাহা কর্তৃক মক্কা শহর আক্রমণ থেকে যমযম কূপ আবিষ্কার ও হযরতের পিতা আব্দুল্লাহকে 'কুরবানী' করার সংকল্প এবং পরে একশত উট দ্বারা কাফফারা প্রদান ইত্যাদি সবই তার হাতে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন মক্কা শহরের অবিসংবাদিত নেতা। সুতরাং তার মৃত্যুর পর স্বভাবতই মক্কা শহরে কয়েক দিন যাবৎ শোক পালিত হয়। বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পিতামহের জানাযায় সকলের সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন।

চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে শৈশব-কৈশোর- যৌবনকাল

বর্ণিত আছে আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুশয্যায় থেকে আদুরে নাতির ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বীয় পুত্র আবু তালিবের হস্তে সোপর্দ করে যান। আবু তালিব অত্যন্ত হৃদয়বান প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের তত্ত্বাবধান সঠিক ও পূর্ণ দায়িত্বশীলতার মধ্যে পালন করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের পরে কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন দক্ষ ব্যবসায়ীও ছিলেন এবং সময় সময় তদানীন্তন পৃথিবীর বিখ্যাত পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের কেন্দ্র সিরিয়ার দামেস্ক শহরে প্রায়ই বাণিজ্য ভ্রমণে যেতেন। সুতরাং হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন মাত্র নয় বছর পূর্ণ হয়েছে, তখনই চাচার সঙ্গে তিনি সিরিয়ায় সর্বপ্রথম বাণিজ্য ভ্রমণে যান। এই ভ্রমণেই 'বাহীরা' নামক এক খৃষ্টান সন্ন্যাসের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটি কিছু কিছু সীরাত লেখক উল্লেখ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। 'সীরাতুন-নবী' গ্রন্থের লেখক আল্লামা শিবলী নোমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও 'নবীয়ে রাহমাত' গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেন নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ যৌবনকালে আরেকবার সিরিয়ায় বাণিজ্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার একজন কর্মকর্তা হিসাবে এই ভ্রমণে যান। তাঁর বয়স তখন ২৫ বছর ছিলো। এই বাণিজ্য সফরে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন

করেছিলেন এবং তার সবই স্বীয় চাচা আবু তালিবের হাতে হস্তান্তর করেন। এই বছরই খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্র ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চল্লিশ বছর বয়স্কা (কোন কোন রিওয়ায়েত মতে ৪৫ বছর বয়স্কা) বিধবা সতী-সাধ্বী খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা স্বেচ্ছায় পঁচিশ বছর বয়সের তরুণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে এতোই ভালোবাসতেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অপর কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকাবস্থায় খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা চারজন কন্যা ও তিনজন পুত্র সন্তানের জননী হোন। কন্যা সন্তানদের নাম হলো রুকাইয়া, জায়নব, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না। পুত্র সন্তানদের নাম হলো আব্দুল্লাহ, তায়্যিব, তাহির এবং কাসিম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। হযরতের আরেক পুত্র সন্তানের নাম ছিলো ইব্রাহীম রাদ্বিআল্লাহু আনহু। মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহার গর্ভে এই সন্তানের জন্ম হয় মদীনা মুনুওয়ারায়। পুত্রদের সকলেই বাল্য বয়সে পরলোকগমণ করেন। চারজন কন্যা সন্তানের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজীর ইন্তিকালের পরও জীবিত ছিলেন।

কাবাঘরে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তিকরণ, আল-আমীন খেতাবে ভূষিত হওয়া, খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ, সন্তানাদির পিতা হওয়া, হিলফুল ফুযুল সংস্থায় নেতৃত্ব প্রদান এবং ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সবই তাঁর যৌবনকালীন সময়ে সংঘটিত হয়। নুবুওয়াত-প্রাপ্তির সময় ঘনিয়ে আসলে পরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মানসিক অবস্থায় রদবদল শুরু হয়। তিনি দিন দিন ভাবুক হয়ে ওঠেন এবং নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে থাকেন।

নুবুওয়াত প্রাপ্তি

মক্কা শরীফের মসজিদুল হারাম থেকে ৩ মাইল দূরে ঐতিহাসিক হেরা পর্বতটি অবস্থিত। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোট্ট গুহা আছে যাকে গারে হেরা বলে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একান্ত একাকী ও নীরবে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্যে এই গুহাটি বেছে নিলেন। তিনি খাবার ও পানীয়সহ একাধারে কয়েকদিন অবস্থান করতেন এই গুহাটিতে। নিশ্চয় আল্লাহর অদৃশ্য ইঙ্গিতে এই বিশেষ পাহাড় ও এর মধ্যস্থিত গুহাটি নুবুওয়াত প্রাপ্তির স্থান হিসাবে তিনি পছন্দ করেছিলেন। যারা পবিত্র মক্কা শহরে গিয়েছেন তাদের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই পড়েছে যে, এই পাহাড়খানা মক্কাস্থ অন্যান্য সকল পাহাড়-পর্বত ও টিলার তুলনায় একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বর্তমানে 'জাবালে নূর' নামক এই পাহাড়ের উপরস্থ অংশটি কিবলার দিকে 'সিজদাবনত' আছে বলে প্রতীয়মান হয়। গুহার শৃঙ্গ থেকে বাইতুল্লাহ শরীফ আগের যুগে স্পষ্ট দেখা যেতো। এখন অবশ্য অনেক উঁচু ও বিরাট বড় বড় অট্টালিকায় ঘেরা মসজিদুল হারাম এবং বাইতুল্লাহ শরীফ ঐ পাহাড় থেকে আর আগের মতো তেমন পরিষ্কারভাবে দেখায় না।

ঠিক কতদিন তিনি জাবালে হেরায় আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়েছিলেন এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ দীর্ঘ ১১ কিংবা ১২ বছর পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। যা হোক, নবীজীর বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখন যে তিনি ঘন ঘন সেখানে গিয়েছিলেন এবং সময় সময় এক মাস পর্যন্ত একাধারে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটাতেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। বিশেষ করে পবিত্র রমজান শরীফে তিনি হেরা গুহায় থেকে যেতে বেশী পছন্দ করতেন। এই রমজান শরীফেরই একটি মুবারক রাতে তাঁর প্রতি প্রথম ওহী নাজিল হয়।

নুবুওয়াত-প্রাপ্তির ৬ মাস পূর্ব থেকেই অত্যধিক পরিমাণ সত্যস্বপ্ন দেখতে লাগলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হেরা পর্বতে আসা যাওয়ার সময়ও তিনি শুনতে পেতেন কে যেনো বলছে, "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!"। গুহার মধ্যে থেকে তিনি মুজাহাদা, ত্যাগ স্বীকার ও রিয়াজতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহির ভার বহনের যোগ্যতা অর্জন করেন। এরপর একদা জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম সূরা আলাক্ব এর প্রথম পাঁচটি আয়াত শরীফ নিয়ে হেরা গুহায় আত্মপ্রকাশ করলেন। ঠিক

কিভাবে ওহী নাযিলের সূচনা ঘটে তা বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত একটি প্রখ্যাত হাদীস থেকে নিম্নে তুলে ধরছি।

হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রথম প্রথম ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী প্রেরণ শুরু হয়েছিল। এ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা ভোরের আলোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। আর তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে লাগলেন। তাই হেরা গুহায় চলে যেতেন আর পরিবার পরিজনের কাছে আসার পূর্বে এক নাগাড়ে কয়েক রাত পর্যন্ত তাহান্নুস করতেন। তাহান্নুস হলো বিশেষ এক নিয়মে ইবাদত বন্দেগী করা। এ জন্য তিনি কিছু খাবার দাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তারপর বিবি খাদীজার কাছে আসলে তিনি আবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে নিতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে সত্য এসে পৌঁছুল। ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি পড়ুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি পড়তে জানি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করেন। আমি এতে প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন! আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তিনি আমাকে আবার ধরলেন এবং ছেড়ে বললেন, আপনি পড়ুন! আমি আবার বললাম, আমি পড়তে জানি না। এরপর তিনি আমাকে তৃতীয়বারের মতো খুব জোরে ধরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি কষ্ট পেলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: ... ... اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ [ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক্ব ... ...]" [বুখারী]

সর্বপ্রথম এই ওহী নাযিলের পরই কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনার আকষ্মিকতায় ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে স্বগৃহে ছুটে গিয়ে হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে বলতে লাগলেন, "আমাকে ঢেকে দাও! আমাকে ঢেকে দাও! আমার বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে!"। এতদশ্রবণে বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তাঁকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি সবকিছু খুলে বললেন।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ স্ত্রী। তিনি স্বীয় স্বামী সম্পর্কে যা কিছু গত ১৫ বছরের বিবাহিত জীবনে অবগত হয়েছিলেন তা ইতোমধ্যে আর কেউ বুঝতে পারেন নি। তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্য, তাঁর চলাফেরা ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মুহাব্বাত, তাঁর পবিত্র চেহারায় সদা প্রকাশিত স্বর্গীয় নূর ইত্যাদি সবকিছুই খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার নিকট স্বচ্ছ পানির মতো আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি জানতেন, এই মহাপুরুষ নিশ্চয়ই কোনো মহান দায়িত্বপালন হেতু স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তি। সুতরাং তিনি দৃঢ়চিত্তে স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কখনো নয়! আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহনপূর্বক তার ভার হালকা করেন, অভাবী লোকের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, মেহমানের খাতির-যত্ন ও মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথে চলতে গিয়ে তাকলিফ ও বিপদ-মুসিবতে সাহায্য করেন।" [বুখারী, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ:) প্রণীত 'নবীয়ে রহমত' [বঙ্গানুবাদ] থেকে উদ্ধৃত]

এরূপ সান্ত্বনা প্রদানের পর বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জার নিকট চলে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী আলিম। অতিরিক্ত বয়স হওয়ার দরুন তিনি তখন অন্ধ। সবকিছু অবগত হয়ে বললেন, "সুবহানাল্লাহ! ইনিই তো সেই মঙ্গলময় বার্তাবাহক জিব্রাঈল ফিরিশতা! যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিসসালামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আপনার নুবুওয়াতের প্রচারকালে যদি আমি শক্তিশালী যুবক থাকতাম! হায়, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে"। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শ্রবণ করে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, "সত্যিই কি আমার লোক আমাকে দেশান্তর করবে?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যে সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। আপনার ন্যায় যাঁরা আপনার পূর্বে এরূপ সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, জগদ্বাসী তাঁদের সঙ্গেও শত্রুতা না করে ছাড়ে নি।" [বুখারী]

এরপর বেশ কিছুদিন যাবৎ ওহী অবতীর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে হতাশ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত একদা তাঁর প্রতি সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হলো। এ সম্পর্কে যাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন, "একদা আমি পথ চলার সময় আসমানের দিক থেকে বিকট আওয়াজ শ্রবণ করলাম। উপর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম হেরা গুহায় যে ফিরিশতা আমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি আসমান যমীনের মধ্যখানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। আমি এতে ভীষণ ভয় পেলাম। ভয়ার্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে বললাম, আমাকে কম্বল দ্বারা ঢেকে দও। কম্বলে ঢাকা অবস্থায় আমার উপর পবিত্র কুরআনের সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হলো:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ*

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, আপনি লোকদিগকে সতর্ক করুন। আপনার প্রভুর মহিমা প্রচার করুন। আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" [সূরা মুদ্দাসসিরের : ১-৫]

এরপর নিয়মিত ওহী নাযিল হতে থাকে। কিন্তু ওহীর ভার বহন করা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট খুব কষ্টকর ব্যাপার ছিলো। একটি হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, "প্রথম প্রথম যখন ওহী নাযিল হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্মরণ রাখার জন্য অনেক কষ্ট করতেন। জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম ওহী পড়ে শোনাবার সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওষ্ঠদ্বয় মুবারক নাড়তে শুরু করতেন।" এরপর পবিত্র কুরআনের এই ক'টি আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ*

"আপনি তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার উদ্দেশে আপনার ওষ্ঠদ্বয় নড়াবেন না; পবিত্র কুরআন আপনার অন্তরে সংরক্ষণ আমারই দায়িত্ব; অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন; এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব।" (ক্বিয়ামাহ : ১৬-১৯)

দাওয়াত ও তাবলীগ

স্বভাবতই যাদের সঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিলো তাদেরকেই প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তবে সর্বপ্রথম যিনি এই দাওয়াত অকপটে গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন হযরতের একান্ত বন্ধুজন ও প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা। এরপর আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রায় দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ গোপনে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত ছিলো। শুধু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন, তাঁর নবদীক্ষিত সাহাবীরাও দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজে জড়িত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী চেষ্টা ও সফলতা লাভ করেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁরই দাওয়াতের ফলে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু, যুবায়ির ইবনে আওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী ইসলামে দীক্ষিত হন। এই গোপনে দাওয়াতী কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়ী হয় নি।

আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দিলেন তাঁর হাবীবকে। ইরশাদ হলো:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

এবং

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও। আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও।" [২৬: ২১৪-২১৫]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন। তিনি প্রথমেই আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসলেন। আহার শেষে যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন আবু লাহাব অশ্লীল বাক্যবাণে এই প্রচেষ্টার জোর বাধা প্রধান করলো।

এরপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আবার নির্দেশ এলো:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"আপনি যে বিষয় আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন।" [১৫ ঃ ৯৪]

এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফ নিকটস্থ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে মক্কাবাসীদের আহ্বান করলেন। কোনো বিশেষ ব্যাপার ব্যক্ত করতে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে ডাক দেওয়ার রিওয়াজ ছিলো তখনকার মক্কা শহরে। সুতরাং তাঁর ডাকে সবাই জমায়েত হলো। তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যদি বলি, ঐ পাহাড়ের অপরপ্রান্তে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছে। এরা তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই সমস্বরে বললো, অবশ্যই বিশ্বাস করবো। কারণ আপনি মিথ্যাবাদী নন। এরপর তিনি মক্কার একেকটি গোত্রের নাম ধরে ধরে বললেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যদি ইহ-পরকালের সাফল্য কামনা করে থাকো তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো। এখানেও আবু লাহাব অত্যন্ত মন্দ ভাষায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আচরণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা লাহাব নাযিল হয়। এই সূরায় আবু লাহাবকে লানত করা হয়েছে।

দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করে তাঁর দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কুরাইশরা বিশেষ করে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়লো। তারা লক্ষ্য করলো নতুন এই ধর্মমত হেতু তাদের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তাদের পূর্বপুরুষের পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। সুতরাং তারা যে কোনো উপায়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দমিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলো। প্রথমে তারা জাগতিক বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে কাজটি সারার চেষ্টা চালালো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। অবশেষে তারা কঠোরতা অবলম্বন করার হুমকি দিল।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একদা নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিবের নিকট এসে বললো, "আবু তালিব! আপনি আমাদের মধ্যে একজন প্রবীণ জ্ঞানবান ব্যক্তি। আমরা ইতোমধ্যে আরেকবার আপনার নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে এই নতুন ধর্মমত প্রচার করতে নিষেধ করুন। আপনি তা উপেক্ষা করে গেছেন। আল্লাহর কসম! আমরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। আমাদের উপাস্য দেবদেবীর উপর দোষারোপ আর কতো সহ্য করবো। হয় আপনি তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন না হয় আমরা তাঁর ও আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো যতক্ষণ না আমাদের কোনো এক পক্ষ খতম হয়ে যায়।"

আবু তালিবের বয়স কম ছিলো না। একে তো বয়সের ভার তার ওপর নেতা হিসাবে তিনি চাচ্ছিলেন না যে, নিজস্ব জাতিগোষ্ঠির বিচ্ছিন্নতা ঘটুক। অপরদিকে এটাও তার উদ্দেশ্য ছিলো না যে, আপন ভাতিজাকে তাদের মর্জির উপর ছেড়ে দিতে। তিনি উভয় কুল যাতে রক্ষা পায় সে ভাবনা করছিলেন। তাই তিনি একদিন স্বীয় ভাতিজার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, "প্রিয় ভাতিজা আমার! তোমার গোষ্ঠির লোকেরা আমার কাছে এসেছিল। তারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তোমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলেছে। এখন দয়া করে আমার দিকে একটু খেয়াল দাও। নিজের জানেরও মায়া করো। আমার ওপর এত বোঝা চাপিয়ে দিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই।"

প্রিয় চাচার মনে দুর্বলতা এসেছে লক্ষ্য করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ভাবলেন হয়তো তিনি আর তাঁকে সাহায্য-সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারবেন না। কুরাইশদের একটি প্রস্তাব ছিলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান তা তারা তাঁকে প্রদান করবে। এমনকি তিনি যদি রাজত্ব চান কিংবা আরবের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী চান তাহলেও তারা দ্বিধা করবে না। কিন্তু বিনিময়ে তাঁকে শুধুমাত্র এই দাওয়াতী কাজ ছেড়ে দিতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবু তালিবকে বললেন: "চাচাজান! আল্লাহর কসম! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও তুলে দেয় তথাপি আমার কাজ থেকে বিরত হবো না। হয় আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করবেন না হয় এটা করতে করতে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।" কথা শেষ হতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো।

ভাতিজার কণ্ঠে এরূপ দৃঢ় সংকল্পের কথা শ্রবণ করে আবু তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, "ভাতিজা! আমার কাছে এসো। যাও! তোমার মনে যা চায় বলো। যেভাবে ইচ্ছে তোমার প্রচার কাজ চালিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আমি কখনোই তোমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না।"

কুরাইশ কর্তৃক চরম নির্যাতন

কুরাইশরা দাওয়াত পেয়ে ইসলাম-গ্রহণ থেকে শুধু দূরেই থাকে নি বরং কিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসরণকারীদেরকে স্তব্ধ করবে সে চিন্তায় মগ্ন হলো। তারা অনুরোধ, প্রলোভন, অসৌজন্যমূলক আচরণ, কঠোর কথাবার্তা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত নওমুসলিমদের উপর শারীরিক নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে দিল। প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের সংখ্যা, শক্তিবল কম থাকায় তারা নির্বিচারে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এসময় হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু, খাব্বান ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু, সুহায়ব ইবনে সিনান আর-রূমী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আমের ইবনে ফুহায়রা রাদ্বিআল্লাহু

আনহু, আবু ফুকায়হা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও তাঁর মাতা সুমাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু, পিতা ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং ভ্রাতা আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, লাবীবা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, যিন্নীরা বা যানবারা রূমিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, উম্মু উবায়স (বা 'উনায়স) রাদ্বিআল্লাহু আনহা, আন-নাহদিয়্যা ও তাঁর কন্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর মাতা হামামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা প্রমুখ সাহাবী/সাহাবিয়া কুরাইশদের এমন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন যে তাঁদের উপর দৈহিক অত্যাচারের ঘটনাবলী শ্রবণ করলে গাঁ শিউরে ওঠে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তা কখনো নিভে যায় নি।

এদের কেউ কেউ নির্যাতনের ফলে শহীদও হয়েছেন। মহিলা সাহাবী হযরত সুমাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা হচ্ছেন ইসলামের প্রথম শহীদ। নরাধম আবু জাহিল তাঁকে বর্শার আঘাতে হত্যা করে। এছাড়া তাঁর স্বামী ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু নির্যাতনের ফলে শহীদ হোন। সুতরাং পুরুষদের মধ্যে তিনি হলেন প্রথম শহীদ। শুধু তাই নয়, এই দম্পতি শহীদী দরোজা লাভ করার পর তাঁদের আদুরে সন্তান হযরত খাব্বাব ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরাইশদের চরম দৈহিক নির্যাতনের শিকার হোন। একদা আরেক সাহাবী তাঁকে শুধুমাত্র একটি পাজামা পরিহিত অবস্থায় দেখলেন। লক্ষ্য করলেন, তাঁর পিঠে প্রচুর দাগ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কিসের দাগ? খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, কুরাইশগণ মক্কার কঙ্করময় মরুভূমিতে আমাকে যে শাস্তি দিত এগুলো তারই চিহ্ন। এই পরিবারের উপর এমন অমানবিক নির্যাতন স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি একদা এই নৃশংসতা স্বচক্ষে অবলোকন করে পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন: "হে আম্মার ইবনে ইয়াসিরের পরিবার! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের ঠিকানা জান্নাত" [বাইহাকী]।

হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঘটনা সবার জানা। কিন্তু ঈমানের কী বিরাট শক্তি! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখে এসব মহাত্মন সাহাবীরা ঈমানের নূরে নূরান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁদের ঈমান হলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত যাবতীয় মুসলমানের ঈমানের তুলনায় বহু বহু গুণ বেশী। তাঁদের তুলনা নেই। এরা ঈমানের জন্য

যেরূপ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। এছাড়া দেশত্যাগসহ জান-মাল কুরবানী করেছেন, জিহাদের মাঠে সহাস্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। দ্বীনের জন্য তাঁদের অবদানের তুলনা নেই। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের যুগকে 'সর্বোত্তম যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে ওঠলো। ইতোমধ্যে হযরতের চাচা হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু এরপরও কুরাইশরা থামলো না। যে কোন মূল্যে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে তারা বদ্ধপরিকর। সুতরাং এই নির্যাতন থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায় তা ভেবে একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে বললেন, সম্ভব হলে তোমরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করো। সেখানে একজন হৃদয়বান বাদশাহ আছেন। তিনি হকপন্থী ব্যক্তি। সে দেশে কারোর উপর অন্যায় অত্যাচার হয় না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা না করেন ততদিন তোমরা সেখানে নিরাপদে অবস্থান করতে পারবে। সুতরাং ১২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা (মতান্তরে ১২ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা বা ১০ জন পুরুষ ৪ জন মহিলা কিংবা ১২ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলার কথাও বলা হয়েছে) আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত করেন। এই দলে ছিলেন তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা।

হিজরতকারীদের কথা কুরাইশরা অবগত হয়ে তাঁদের পেছনে ছুটে গেল। উদ্দেশ্য তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা। কিন্তু মুসলমানগণ সতর্কতার সাথে সমুদ্র তীর পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছুয়েই দু'টি নৌকা ভাড়া করে নিয়ে উপকূল এলাকা ছেড়ে সমুদ্রপথে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এদিকে কাফিররা সমুদ্র তীরে পৌঁছুয়ে নৌকো চলে গেছে জেনে বিফলমনোরথে ফিরে এলো। হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) গিয়ে সাহাবায়ে কিরাম সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশীর অনুমতিক্রমে পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে দ্বীন পালন করতে থাকেন। তবে

একটি গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, মক্কার সকল মুশরিক মুসলমান হয়ে গেছে। এ সংবাদ যখন হাবশায় পৌঁছায় তখন সাহাবায়ে কিরাম ভাবলেন, আর এখানে থেকে লাভ নেই। সুতরাং তারা মক্কা শরীফ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। মক্কার নিকটবর্তী হয়েই কিন্তু আসল সত্য তাঁদের নিকট ধরা পড়লো। সুতরাং তারা ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। শেষ পর্যন্ত অনেকেই আর ফিরে না যেয়ে গোপনে মক্কা শরীফ প্রবেশ করলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনামতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হাবশায় ফিরে গিয়েছিলেন।

হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত

মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের মাত্রা কমলো না বরং আরো বেড়ে ওঠলো। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে মুসলমানদের একটি বড় দল হাবশায় হিজরত করলেন। এই দলে ৯৮ জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলা ছিলেন বলে বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরতের চাচা জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। কুরাইশরা এদেরকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। দু'জন বিজ্ঞ কুরাইশ দূত অনেক উপঢৌকনসহ সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন আমর ইবনুল আস, যিনি পরবর্তীতে মিশর বিজয়ী প্রখ্যাত মুসলিম সেনাপতি হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অবশ্য তখনও মুসলমান হন নি। তার সঙ্গী ছিলেন উমারা ইবনুল ওয়ালীদ (কারো কারো মতে আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ রবীআ)। এরা দরবারে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত কৌশলে উপঢৌকনগুলো নাজ্জাশীকে উপহার করলেন এবং সভাসদবর্গের সাথে আগেই আলোচনা করে তাদেরকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসলেন।

খৃস্টান সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে কুরাইশ দূতদ্বয় তাঁর নিকট অভিযোগ করলেন, "হে মহামহিম বাদশাহ! আমাদের কিছু নির্বোধ লোক স্বীয় কওমের দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে। তারা আপনাদের দ্বীনকেও মানে না। তারা একটি মনগড়া দ্বীনের অনুসরণ করে। এ নতুন দ্বীন সম্পর্কে আপনিও কিছু জানেন না আমরাও জানি না। আমাদের বংশের সম্ভ্রান্ত কিছু ব্যক্তি আমাদেরকে এই সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, আপনাকে অনুরোধ জানানো- এসব ধর্মত্যাগীদের তাদের কওমের নিকট ফেরৎ পাঠিয়ে

দেবেন।" সভাসদবর্গ আগে থেকেই কুরাইশদের পরামর্শ অনুযায়ী বলে উঠলো, হে মহামতি বাদশাহ! এই লোকগুলো সত্য বলেছেন। আমাদের মনে হয় এসব ভ্রান্ত লোকগুলোকে তাদের কওমের নিকট প্রেরণ করে দেওয়াই হবে উচিত কাজ।

সম্রাট নাজ্জাশী কিন্তু এসব কথায় সহজে মাথা নত করার পাত্র ছিলেন না। রাগান্বিত হয়ে বললেন, এই তথাকথিত ভ্রান্ত লোকগুলো কোথায়? কুরাইশরা বললো, তারা আপনার রাজ্যে বসবাস করছে। বাদশা বললেন, তোমাদের কথায় আমি কখনো তাদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো না। আমাকে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তাদেরকেই আগে জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি অভিযোগ সত্য হয় তখন আমি তাদেরকে এই দূতদ্বয়ের হাতে সোপর্দ করতে পারি। সুতরাং হিজরতকারী সাহাবীদেরকে সম্রাটের দরবারে ডেকে পাঠানো হলো। সাহাবায়ে কিরাম সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সকলের পক্ষে সম্রাটের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু দেবেন।

এরপর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রথমে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীরা শুধুমাত্র সালাম জানালেন- সিজদা করলেন না। এতে সম্রাটের সভাসদবর্গ রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা বাদশাহকে সিজদা করলেন না? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করি, আর কাউকে নয়। নাজ্জাশী জানতে চাইলেন, স্বীয় কওমের ধর্ম ত্যাগ করে তোমরা কোন্ ধর্ম গ্রহণ করেছো? তোমরা তো খৃস্টধর্ম কিংবা সমসাময়িক অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের অনুসারী নও। জাফর ইবনে আবি তালিব জবাব দিলেন, আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করি না, তাঁর সাথে কাউকে শরীকও করি না।

এবার নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, এই দ্বীন কে এনেছে? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি। হে বাদশাহ! আমরা যাহিলী যুগের এক জাতি ছিলাম। আমরা মূর্তিপূজা করতাম। মৃত জন্তুর গোশত আহার করতাম, অশ্লীলতার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতাম না, প্রতিবেশীর প্রতি খারাপ ব্যবহারে লিপ্ত ছিলাম।

সবলরা দুর্বলকে অত্যাচার করতো। এই অবস্থায় আমরা দিনাতিপাত করেছি। এরপর আল্লাহ পাক আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, আমানতদারিতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে জানি। তিনিই আমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন, তাঁরই ইবাদত করা ও তাঁকে শরীক না করতে বললেন। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব মূর্তির ইবাদত করে তা বর্জন করো-এগুলো মিথ্যা। এতে কোনো লাভ নেই বরং বিরাট ক্ষতি। তিনি আমাদেরকে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আমানতের মালের হিফাজত করা, অশ্লীলতা বর্জন, প্রতিবেশীর হক্ব আদায় করা ইত্যাদি। আমরা তাঁকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছি। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। আমাদের কওম এতে আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। নির্যাতন নিপীড়নে আমাদের জীবন বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য আমাদেরকে আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করিয়ে পূর্বের ন্যায় মূর্তি পূজায় নিয়ে যাওয়া। এই অসহ জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে রেহাই ও আমাদের দ্বীন পালনে স্বাধীনতা পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা আপনার দেশে হিজরত করেছি। সুতরাং আমরা আশা করি আপনার মতো স্বনামধন্য ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আমদেরকে অত্যাচারে ঠেলে দেবেন না।

হযরত জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক এই বক্তব্য সম্রাট নাজ্জাশীকে অনেকটা প্রভাবান্বিত করলো। তিনি এবার নতুন ধর্মমত সম্পর্কে আরো জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তিনি যা এনেছেন তার কিছুটা কি তোমার নিকট আছে? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আছে। নাজ্জাশী তা শোনতে ইচ্ছাপোষণ করলেন। জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা মরিয়মের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করতে লাগলেন:

كهيعص . ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا . إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا . قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا . وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ * وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا . يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ

قَبْلُ سَمِيًّا . قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا . قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا . قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً * قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا....

-"কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স- ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হই নি। আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া ইতোপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করি নি। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত? তিনি বললেন: এমনিতেই হবে- তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন: এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না।"

সম্রাট নাজ্জাশীর চোখ দু'টো গড়িয়ে অশ্রু পড়তে লাগলো। তার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল। সভাসদবর্গসহ উপস্থিত সবাই কাঁদতে লাগলেন।

নাজ্জাশী বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এই আয়াতগুলো ও ঈসা আলাইহিসসালাম যা এনেছিলেন তা একই উৎস থেকে এসেছে। এরপর তিনি আমর ইবনে আসের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই লোকগুলো কি তোমাদের দাস? ইবনে আস জবাব দিলেন, না। তিনি বললেন, তাহলে এরা কি তোমাদের নিকট ঋণগ্রস্ত? ইবনে আস আবার জবাব

দিলেন, জি না। নাজ্জাশী বললেন, তাহলে তোমরা চলে যাও। আমি কখনো এদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো না।

আমর ইবনে আস খুব কূটকৌশলী ছিলেন। তিনি বের হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আগামীকাল এমন এক বিষয় বাদশাহর দরবারে উত্থাপন করবো যে, এর দ্বারা মুসলমানদের মূলোৎপাটন করে ছাড়বো। পরদিন দরবারে গিয়ে বললেন, রাজন! এরা ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে মারাত্মক আপত্তিকর কথা বলে। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। তিনি বললেন, তারা ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে কী এমন মারাত্মক ধারণা রাখে? তাদেরকে দরবারে হাজির করো!

জাফর ইবনে আবি তালিব এবং অন্যান্য সাহাবা জানতেন, ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকিছু বলেছেন তা-ই তাঁরা ব্যক্ত করবেন। সবার অনুমতিক্রমে এবারও জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সকলের পক্ষে বাদশাহর দরবারে ভাষ্যকার নির্বাচিত হলেন।

নাজ্জাশীর দরবারে প্রবেশ করে তাঁরা লক্ষ্য করলেন, তিনি স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছেন। তার ডানে আমর ইবনে আস এবং বায়ে উমারা। উভয় দিকে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক পাদ্রী।

এরপর নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিসসালাম সম্পর্কে কী বলো? জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, "আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন আমরা তা-ই বলি। তিনি হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি কুমারী মরিয়মের উদরে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়ে তাঁকে অস্তিত্বদান করেন।" এটা শ্রবণ করে নাজ্জাশী হাতদ্বয় মাটিতে মারলেন এবং সেখান থেকে একখণ্ড কাষ্ঠ উঠিয়ে বললেন, "তুমি যা বলেছো ঈসা ইবনে মরিয়ম এই কাষ্ঠখণ্ডের পরিমাণও বেশী কিছু নন।" একথা

শোনে সভাসদবর্গের সবাই ফিস ফিস শব্দ করতে লাগলো। তিনি আবার বললেন, 'তোমরা যাই বলো না কেন, ঈশ্বর সম্পর্কে আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি।' তিনি এবার মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা আমার রাজ্যে নিরাপদ। যে তোমাদের অভিসম্পাত দেবে তাকে জরিমানা করা হবে। এক পাহাড় স্বর্ণ দিলেও আমি কাউকে তোমাদের উপর আঘাত করতে দেবো না। ওদের (কুরাইশদের) উপঢৌকন তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও; ওসব আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

কুরাইশ দূতদ্বয় বিফল মনোরথে দেশে ফিরে আসলেন। আবিসিনিয়ায় আগত মুসলমান মুহাজিররা নিরাপদে বসবাস করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ ও হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইসলাম-গ্রহণ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম দিকে ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুআয় আল্লাহ পাক তাঁকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে বিরাট মর্যাদার অধিকারী করে দিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সত্যিই চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর।

হযরত উমর একদা কুরাইশ নেতা আবু জাহিল ও অন্যান্যদের প্ররোচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জঘন্য সংকল্প করে বসলেন। তিনি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন। উমর কী তখন জানতেন, এই ভ্রমণটি ছিলো তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়? তিনি যে শীঘ্রই সত্যের সন্ধান পেয়ে যাবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। কারণ ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পবিত্র দরবারে দুআ করে নিয়েছিলেন যে, "হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহিল কিংবা উমরের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও!"। লক্ষণীয় যে, তিনি দুআর সময় উভয়ের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করতে বলেন নি- যে কোনো একজনের জন্য আল্লাহর দরবারে আবদার করেন। আল্লাহ পাক উমরকেই পছন্দ করলেন।

পথিমধ্যে নু'আম ইবনে আব্দুল্লাহ নামক এক নওমুসলিমের সঙ্গে উমরের সাক্ষাৎ ঘটলো। নু'আম বুঝতে পারলেন, উমর নিশ্চয়ই কোনো কঠিন সংকল্প করেছেন তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই উমর! এভাবে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?'
'মুহাম্মদের শিরচ্ছেদ করবো!' কঠিন ভাষায় জবাব দিলেন উমর। নু'আম একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আগে তোমার নিজের ঘর সামলাও- তুমি কি জানো না, তোমার বোন ও তার স্বামী ইসলামধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছেন?'

উমর গর্জে উঠলেন, 'কী বললে? আমি এক্ষুণি তাদের শায়েস্তা করে নেবো!' এই বলে তিনি ছুটে গেলেন বোনের বাড়িতে। তিনি শুনতে পেলেন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি। বুঝতে পারলেন, সত্যিই এরা মুসলমান হয়ে গেছেন। ঘরের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত উমরের বোন ও তার স্বামীকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ভাইয়ের আগমনে ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা কুরআনের পাতাটি লুকিয়ে ফেললেন। খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেকে আত্মগোপন করলেন। ভগ্নিপতি দরজা খোলার পর উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কী পাঠ করছিলে? আমাকে দেখাও!'। এই বলে তিনি স্বীয় ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীকে রক্ষার্থে ফাতিমা এগিয়ে আসলে তাকেও তিনি প্রহার করলেন। এতে ফাতিমার শরীর ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসলো। উমর বোনের রক্ত দেখে থেমে গেলেন। তিনি কিছুটা লজ্জাবোধ করে বললেন: 'তোমরা কী পাঠ করছিলে? আমাকে একটু দেখাও। আমার শুধু জানা দরকার তোমাদের এই নতুন দ্বীনটি কি জিনিস।' হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কণ্ঠে নম্রতার ভাব লক্ষ্য করে বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি উভয়ে আশান্বিত হলেন। তবে যেমন ভাই তেমন বোন- ফাতিমা উত্তেজিত হয়ে ধমকের সুরে বললেন, 'আপনি অপবিত্র! যান গোসল করে আসুন।'

সুতরাং উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু গোসল করে আসলেন। ইতোমধ্যে বেশ উত্তেজিত ও আশান্বিত হয়ে আত্মগোপনে থাকা হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু

বেরিয়ে আসলেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঐ কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বা-হা এর প্রথম কটি আয়াত শরীফ পাঠ করলেন:

طٰهٰ * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى * إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشٰى * تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا * الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى * وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّه' يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى * اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى*

"ত্বোয়া-হা। আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নি। কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে। এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।" (ত্বা-হা: ১-৮)

পাঠ শেষে তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'আহ! কী অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী এই আয়াতমালা!' হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না- ঈমানী নূরের ঝলক তাঁর অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করে দেহ-তনু-মনে জেগে তুললো রোমাঞ্চকর শিহরণ। বললেন, "আমাকে এক্ষুণি বলো, কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়?"।

ভাই উমরের হৃদয় ঈমানী নূরের ছোঁয়ায় দীপ্ত হয়েছে বুঝতে পেরে ফাতিমার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। শিক্ষক খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু আনন্দের আতিশয্যে হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে জানালেন, 'হে উমর! গতকালই আমি শ্রবণ করেছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আবু জাহিল কিংবা

উমরের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও। সেই পবিত্র মুখের দু'আর ফলেই আপনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন।'

এরপর তিনি উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে বায়তুল আকরামে উপস্থিত হলেন। দরোজায় কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে উমরকে দেখে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসংকোচে উমরকে ভেতরে আসতে দাও। হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহু উপস্থিত বিপদের আশঙ্কায় উমরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন আসল খবর। তিনি উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কাপড় ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "হে উমর! তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছো?" হযরত উমর তৎক্ষণাৎ কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন। আকস্মিক ও অভাবনীয় এই ঘটনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর দিয়ে উঠলেন, "আল্লা-হু আকবার!"। সাহাবায়ে কিরামও এতো সজোরে 'আল্লা-হু আকবার' ধ্বনি তুললেন, এতে আশপাশ এলাকা প্রতিধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। এরপর উমর তখনই আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কুফর নিজেকে সাড়ম্বরে প্রকাশ করছে আর আমরা হক্ব দীনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কেনো তা গোপন করবো? উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এই দৃঢ় সাহসী উক্তিতে উপস্থিত ত্রিশ-চল্লিশ জন সাহাবী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলে পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফের নিকটে যেয়ে প্রকাশ্যে জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করলেন। সেখানে অনেক কাফির ছিলো, কিন্তু নীরবে এই অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন ছাড়া তাদের কারোর সাহসে দেয় নি উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে চ্যালেঞ্জ করার।

কুরাইশদের কর্তৃক সামাজিক বয়কট

মহাবীর হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, উমর ইবনে খাত্তাব এবং উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের মতো প্রভাবশীল ব্যক্তিদের ইসলাম-গ্রহণ হেতু মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরাট ফায়দা হলেও কুরাইশদের দুশমনী একটুও কমে নি। বরং তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে নতুন নতুন

কৌশল অবলম্বন করতে লাগলো। সেমতে নুবুওয়াতের ৭ম বছরের ১লা মুহাররম থেকে কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ তাঁর যাবতীয় পরিবারবর্গকে সামাজিক বয়কটের শিকার করে।

মক্কার অদূরে শা'ব আবি তালিব নামক উপত্যকায় তাদেরকে বন্দী করে রাখলো। উপত্যকা থেকে তাঁদের কাউকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। মক্কার কেউ বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ পেলো না- উপত্যকার বাইরে এসে খাবার দাবারসহ জীবন রক্ষার জন্য জরুরী কোনো বস্তু পর্যন্ত সংগ্রহের অধিকার তাদের ছিলো না।

সামাজিক এই অমানুষিক বয়কটে আক্রান্ত হয়ে সবাই জর্জরিত হয়ে পড়লেন। খাবারের চরম অভাব হেতু শিশু-মহিলা এবং বৃদ্ধরা উপবাসে থেকে দুর্বল হয়ে পড়লেন। এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ তাঁর পরিবারবর্গের উপর এতো বড় বিপদ আপতিত হয় নি। নরাধম কাফিররা সবাই মিলে এমন জঘন্য মহাসঙ্কটে পতিত করে নবী-পরিবারকে। তারা একটি কাগজে বয়কটের শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করে কাবা শরীফের দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে। এই দলীলে মক্কার বড় বড় কাফির নেতাদের সই ছিলো। দলিল লেখক ছিলো নরাধম মানসি ইবনে ইকরিমা আবারদী। আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়াতে শস্তি দিয়েছেন। যে হাতদ্বয় দ্বারা সে লিখেছিল তা তিনি চেতনহীন করে দিয়েছিলেন।

সুদীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ এই বয়কট স্থায়ী ছিলো। আহ! এই সময়ে নবী-পরিবারের উপর কী না কষ্ট! কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সবাই তা সহ্য করে গিয়েছেন। এই চরম বিপদের দিনেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে নিরাশ হন নি। অবশেষে এক দু'জন মুশরিকের মনেও দয়ার উদ্রেক ঘটলো। মুসলমানদের উপর এরূপ চরম নির্যাতন উচিত হয় নি ভেবে তারা ব্যাপারটি নিয়ে কথাবার্তা শুরু করলো। এদিকে কাবা শরীফের দেওয়ালে লটকানো ঐ কাগজের টুকরো বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর হুকুমে একজাতীয় উই পোকা তা খেয়ে ফেলে। একমাত্র আল্লাহর নামটি অক্ষত ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন।

এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবকে জানালেন। তিনি মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাবা গৃহের সামনে গিয়ে কুরাইশদের সঙ্গে কথা বললেন। চুক্তিপত্র বা বয়কটের দলীলটি যে উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে তা তাদের জানিয়ে দিয়ে বয়কট অবসানের দাবী জানালেন। অনেক কথা কাটাকাটির পর চুক্তিপত্র সত্যিই উই পোকা খেয়ে ফেলেছে দেখে কুরাইশরা লজ্জায় মাথা নত করলো। এদিকে আবদে মনাফ ও কুসাই গোত্রের লোকগণ ঘোষণা দিলো, আমরা এই বয়কট মানি না! শীঘ্রই বয়কটের অবসান ঘটলো। যুহায়র ও তার সাথীগণ নাঙ্গা তরবারি হস্তে ছুটে গেলেন শি'ব আবি তালিবের দিকে। অভ্যন্তরীণ সকল মুসলমানকে তারা মুক্ত করে দিলেন। এভাবেই দীর্ঘ ৩ কিংবা মতান্তরে ২ বছর কঠিন বিপদে আপতিত থেকে নুবুওয়াতের দশম সালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপরিবারে মুক্ত হলেন।

গিরিসঙ্কট থেকে বের হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর চাচা আবু তালিবসহ হিশাম ও মুত্তালিব গোত্রের সকল নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-যুবা আল্লাহর ঘরের সামনে গিয়ে গিলাফে ধরে এই চরম দুর্ভোগের জন্য দায়ী কুরাইশ মুশরিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বদদু'আ করলেন:
'হে আল্লাহ! যারা আমাদের উপর এই জঘন্য যুলুম করেছে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে, আমাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে, আমাদের পক্ষে তুমি এর বদলা নিও'।

দুঃখের বছর (عام الحزن)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনে বিরাট দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-আপদ পতিত হয়েছে। কাফিরদের জ্বালা-যন্ত্রণা তো ছিলোই সেসাথে ইয়াতীম অবস্থায় পৃথিবীতে আসা তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই ছিলো দুঃখ-ভারাক্রান্ত। তবে যে দু'জন মানুষ তাঁকে কঠিন বিপদ-আপদের সময় কাছে থেকে সর্বাধিক বেশী সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন তাঁরা হলেন হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা এবং চাচা আবু তালিব। তাঁদের জীবদ্দশায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা নিরাপত্তা

অনুভব করতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এই দু'জনকেও তাঁর থেকে চিরতরে দূরে সরিয়ে দিলেন।

তখন নুবুওয়াতের ১০ম বছর। হযরত ও পরিবারবর্গ সবেমাত্র সামাজিক বয়কট থেকে মুক্ত হয়েছেন। দীর্ঘ দিন শি'ব আবি তালিবে দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটানোর পর ক'টা দিন যেতে না যেতেই সান্ত্বনাদাত্রী প্রিয় স্ত্রী হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করলেন। এর অল্পদিনের মাথায় চাচা আবু তালিবও এই ধরা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এ দু'টি মৃত্যুর ফলে হযরতের যেনো ডানা ভেঙ্গে পড়লো। কুরাইশ কাফির-মুশরিকরা সুযোগ বুঝে তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করলো। একান্ত আপনজনদের হারানো এবং সেসাথে কুরাইশদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিতে তিনি নিরাপত্তাহীন ও অসহায় বোধ করলেন। এ কারণেই এই বছরটিকে ''আমুল হুযন' বা দুঃখের বছর নামে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা মক্কা শরীফের বিখ্যাত কবরস্থান 'জান্নাতুল মা'ল্লা' -তে সমাহিত আছেন।

তায়েফ গমন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্দিক থেকে ভীষণ মানসিক চাপের মধ্যে আপতিত হয়েও তাঁর পবিত্র মিশন চালিয়ে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আল্লাহর উপর অগাধ ভরসা রেখে তিনি তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। তবে মক্কা শহরে এই কাজের মাধ্যমে তেমন বেশী সফলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো না। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। আপাতত তিনি মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৭৫ মাইল দূরবর্তী জনবহুল তায়েফ শহরে যেতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সফরসঙ্গী হিসাবে প্রিয় পালকপুত্র হযরত যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নির্বাচিত করে নুবুওয়াতের ১০ম বছর শাওয়াল মাসে তিনি তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছকীফ নামক একটি প্রভাবশালী গোত্রের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তবে এদের কাছ থেকে কোনো আশানুরূপ জবাব মিললো না- বরং তারা তাঁকে কটাক্ষপূর্ণ কিছু বাক্য শুনিয়ে দিল। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুরোধ করলেন, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করলে না, তবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমার বিষয়টি গোপন রেখো। কিন্তু এতে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠলো। হৈ-হল্লা ও চিৎকার দিয়ে সেখানে অনেক লোক জড়ো করে দিল। সবাই তাঁকে ঘিরে ফেললো এবং বিভিন্ন ধরনের খারাপ উক্তির মাধ্যমে তাঁকে উত্যক্ত করে তোলার চেষ্টা করলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতান্তরে এক মাস তায়েফে থেকে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। ছকীফ গোত্রের নিকট থেকে ফিরে তিনি তায়েফের বিভিন্ন প্রভাবশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা কেউই দাওয়াত গ্রহণ করলো তো না-ই, উপরন্তু তারা তাঁকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলো। তাদের বেওকুফ দাসদাসীদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। এরা অত্যন্ত বে-আদবীপূর্ণ আচরণ করতে লাগলো দু'জাহানের বাদশাহ, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে। এমনকি তারা তাঁকে রাস্তায় ঠেলে দিয়ে পবিত্র দেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করলো। প্রচণ্ড আঘাতে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীর মুবারক থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। প্রিয় পালকপুত্র হযরত যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নবীজীকে রক্ষা করতে। তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে অনেক পাথরের আঘাত নিজে সহ্য করে দ্রুত চলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র পদদ্বয়ে রক্ত জমা হয়ে পড়লো। এদিকে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে রক্ষা করতে যেয়ে পাথরের আঘাতে তাঁরও মাথা ফেটে গেল। এরপর কোনমতে একটি বাগানের দেওয়ালের পাশে গিয়ে উভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আপাতত নরাধম হামলাকারীদের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেলেন।

সেখানে একটি আঙ্গুর গাছ ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির নীচে বসে পড়লেন। অত্যন্ত ক্লান্ত, রক্তে রঞ্জিত, ব্যথিত, ক্ষুধার্ত এবং নিরাশপূর্ণ অবস্থায় পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রুভরা চোখে মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে হাত উত্তোলন করে দু'আ করতে লাগলেন।

না জানি কোন্ বদদু'আ করে তায়েফবাসীকে আজ ধ্বংস করে দেওয়া হবে! কিন্তু না, দয়াল নবীজী এক হৃদয় নিংড়ানো দু'আ করলেন নিজেরই অক্ষমতা স্বীকার করে! তিনি আল্লাহর পবিত্র দরবারে আকুতি-মিনতি করে বললেন:
"হে আল্লাহ! আপনার দরবারে আমি আমার দুর্বলতার ফরিয়াদ জানাই, আমার মধ্যে হিকমাতের অভাব আছে। আমি দুর্বল। ওগো সর্বাধিক দয়াময় আল্লাহ তা'আলা! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক এবং আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করেছেন? দূরবর্তী কারো নিকট, যে আমার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবে অথবা শত্রুর নিকট যাকে আমার মালিক বানিয়ে দেবেন? যদি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ না থাকে তবে আমার আর কোনও পরোয়া নেই। অবশ্যই আপনার ক্ষমা আমার জন্য প্রশস্ত। আমি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ আপতিত হওয়া থেকে অথবা আমার প্রতি আপনার কঠোরতা প্রদর্শন করা হতে। আমি আপনার সেই নূরের আশ্রয় চাচ্ছি যার দ্বারা যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া-আখিরাতের সকল কাজ সুসম্পন্ন হয়। আমি আপনারই সন্তুষ্টি চাই। নেক কাজ করার কিংবা অন্যায় ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি একমাত্র আপনার কাছ থেকেই আমি পেয়ে থাকি"।

যাদুল মাআদে বর্ণিত আছে, উক্ত দু'আ শেষে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সমূহের ফিরিশতাদের পাঠিয়ে দিলেন তাঁর হাবীবের নিকট। তারা অবতরণ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে দু'টি পাহাড়ের মাঝে তায়েফ নগর অবস্থিত, আপনি দু'আ করুন এ দু'টো একত্রে মিলিয়ে দিয়ে তায়েফবাসী সবাইকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য। আমরা এ কাজের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মায়ার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা এ কী বলছো? আমাকে আল্লাহ পাক মানুষের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন- ধ্বংসের জন্য নয়। তারা যা করেছে তা আমার দুর্বলতা হেতু করেছে- আমি তাদেরকে সঠিকভাবে বুঝাতে পারি নি। আমি তো আশাবাদী তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক জন্ম নেবে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর হাবীবের কী মুহাব্বাত মানুষের জন্য! এতো জঘন্যভাবে অপমানিত ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলেন যে সম্প্রদায়ের কাছে তাদের প্রতি এই অকল্পনীয় ব্যবহার! প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের চিত্র কতো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে তায়েফের এই ঘটনা থেকে। শিক্ষা হিসাবে ইসলামের দায়ীদের জন্য এই ঘটনাটি চিরদিন যাবৎ আদর্শ হয়ে থাকবে।

তায়েফের ঘটনাবলী থেকে আরো একটি চিরন্তন সত্য দিবালোকের মতো আত্মপ্রকাশ করেছে- আর তাহলো, ধন-সম্পদের মোহে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। সে সত্যকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে বসে। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে এই ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

"যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, সেখানকার ধনাঢ্য অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা-সহ প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরো বলতো, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না [সূরা সাবা : ৩৪-৩৫]।

আল-মি'রাজ (المعراج)

সকল নবী-রাসূলের জীবনেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কিছু অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে এসব 'মু'জিযাহ' (مُعْجِزَة) সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং নবী-রাসূলদের মু'জিযা সত্য এবং তার উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের অঙ্গ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নুবুওয়াতী জিন্দেগীতেও অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিল। কোনো কোনো সীরাত লেখক ১ হাজারেরও বেশী মু'জিযা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাবতীয় মু'জিযার মধ্যে

সর্বাপেক্ষা বড়ো মু'জিযা হলো পবিত্র কুরআন শরীফ। মহান এই ঐশীগ্রন্থ একটি জ্যান্ত মু'জিযা। আর এর পরবর্তী স্থানে আছে হুজুরের নভোভ্রমণ বা মি'রাজ। এমন অত্যাশ্চর্য মু'জিযা অপর কোনো নবীর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় নি। মি'রাজের দু'টি দিক আছে। যেহেতু মি'রাজের ঘটনা ছিলো বাস্তব তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে মি'রাজে গমণ করেন, তাই মু'মিনদের জন্য এ থেকে আখিরাতের জিন্দেগীতে যে আমরা সশরীরে ঊর্ধ্বজগতে যাবো তার নমুনা ভেসে এসেছে। অপরদিকে দুনিয়ার জীবনে 'আধ্যাত্মিক ভ্রমণের' সূত্রও এই মি'রাজ। এজন্য বলা হয়েছে 'আসছোলাতু মি'রাজুল মু'মিনীন' - নামায মু'মিনের জন্য মি'রাজ।

পবিত্র মি'রাজের ঘটনাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। প্রথমত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সশরীরে মক্কা শরীফের মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ- যাকে আরবীতে 'ইসরা' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যার অর্থ রাতের ভ্রমণ। মাসজিদুল আকসা থেকে সপ্ত আসমান পেরিয়ে বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি ভ্রমণ শেষে আরশে আজীম পর্যন্ত ভ্রমণকে বলে 'মি'রাজ' বা ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ। তবে উভয় ভ্রমণকেই পারিভাষিক অর্থে একত্রে মি'রাজ বলে। ঠিক কোন্ সময় মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। অধিকাংশের মতে নুবুওয়াতের দশম বছর রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে ইশা থেকে ফযরের মধ্যে তা সংঘটিত হয়।

পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে ঠিক কোথায় ঘুমন্ত ছিলেন সে ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি তাঁর ফুফু হযরত উম্মে হানী রাদ্বিআল্লাহু আনহার ঘরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম এর ডাকে সেখান থেকে উঠে বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন হিজরে ইসমাঈল (বা হাতীমে) চলে যান। সেখানে পৌঁছার পর তিনি আবার নিদ্রামগ্ন হন। তখন তাঁকে ফিরিশতা আবার জাগিয়ে তুলে বুরাকে চড়িয়ে যাত্রা শুরু করেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর সেখানে সকল আম্বিয়া আলাইহিস্সালাম এর রূহের সাথে নিজে ইমামতি করে দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণের প্রাক্কালে তাঁর সম্মুখে দুগ্ধ ও শুরার দু'টি পেয়ালা পেশ করা হলো। তিনি দুগ্ধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম মন্তব্য করলেন, আপনি যদি শরাবের পেয়ালা গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেতো। এরপর শুরু হলো মি'রাজের পর্ব।

নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম একে একে প্রথম থেকে সপ্তম আসমানের প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে গেলেন। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারেই দ্বাররক্ষী ফিরিশতাদের সঙ্গে বাক্যালাপ হলো: ফিরিশতারা প্রশ্ন করলেন, 'হে জিব্রাঈল! আপনার সাথী কে? তাঁকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে?' ইত্যাদি। জিব্রাঈল প্রত্যেকবারই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় দিলেন এবং স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপনীত হতে তাঁকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে- তা অবগত করলেন। দ্বাররক্ষীরা তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দিল। তিনি প্রত্যেক আসমানেই একেকজন পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ নবীর সাক্ষাৎ পেলেন।

প্রথম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত আদম আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। আদম আলাইহিস্সালাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'সুসন্তান', 'সৎকর্মশীল', 'সত্য নবী' ইত্যাদি আখ্যায়িত করে তাঁকে স্বাগত জানালেন। দ্বিতীয় আসমানে আরোহণ করে অসংখ্য ফিরিশতা ছাড়াও দেখা হলো হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্সালাম এর সাথে। তাঁরা উভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সম্ভাষণ জানালেন। তৃতীয় আসমানে সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। তাঁর সাথে অনেক কথাবার্তার পর চতুর্থ আসমানে আরোহণ করে দেখতে পেলেন হযরত ইদরীস আলাইহিস্সালামকে। এরপর পঞ্চম আসমানে সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত হারুন আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলিত হলেন যথাক্রমে হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম এর সাথে। তাঁদের সবার সাথেই

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথোপকথন হয়েছে। সবাই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা ও মুবারকবাদ জানিয়েছেন।

সিদরাতুল মুনতাহায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম আরো ঊর্ধ্বলোকে গমন করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' তথা বদরিকা বৃক্ষের নিকটে যেয়ে পৌঁছুলেন। এখানে তিনি পবিত্র কাবাঘরের অনুরূপ একটি ইবাদাতগৃহ দেখতে পেলেন। এই গৃহের নাম 'বাইতুল মা'মুর'। এই পবিত্র ঘরকে সত্তুর হাজার ফিরিশতা দৈনিক তাওয়াফ করেন। একজন ফিরিশতাকে একবার তাওয়াফ শেষে আরেকবার করার জন্য সত্তুর হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ঊর্ধ্বে 'রফরফের' মাধ্যমে আরোহণ করলেন। এই শেষ সফরে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম যেতে অপারগতা জানালেন। কারণ হিসাবে বললেন, আর যদি এক কদম আমি অগ্রসর হই তাহলে আমার সকল পাখা আল্লাহর তাজাল্লিতে জ্বলে পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাবে!

আল্লাহর পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজীমে যেয়ে পৌঁছুলেন। আরোহণের সময় মনে পড়লো হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম এর কথা। তুর পাহাড়ে আরোহণ শেষে একটি বৃক্ষের নিকট আল্লাহর তাজাল্লির সম্মুখে পৌঁছার পর আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'হে মূসা! তুমি পবিত্র স্থানে আগমন করেছো, তোমার জুতা খুলে ফেলো!'। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজীমে আরোহণের পূর্বে নিজের পা মুবারকে যে খড়ম ছিলো তা খুলে ফেলার জন্য উদ্যত হলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশীবাণী উচ্চারিত হলো, 'হে আমার হাবীব! আপনি জুতা খোলার চেষ্টা করবেন না। আপনার পাদুকার স্পর্শ পেলে আমার আরশ ধন্য হবে!' সুবহানাল্লাহ! আমাদের নবীজীর মর্যাদা স্বয়ং মহাপ্রভুর দরবারে কতো ঊর্ধ্বে!

অতঃপর একান্ত সঙ্গোপনে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা তাঁর হাবীবের সাথে কথোপকথন করলেন যার সঠিক বর্ণনা আমি অধমের কলম থেকে বের হবার কোন উপায় নেই। তবে মি'রাজ হতে প্রত্যাবর্তনকালে কয়েকটি বিশেষ উপহার আমাদের নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল উম্মতের জন্য নিয়ে এসেছেন। এগুলো হলো: ১. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ২. শিরকের গুনাহ থেকে বাঁচতে পারলে অন্যান্য যে কোনো গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ হওয়ার নিশ্চয়তা এবং ৩. সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত।

আল-মি'রাজ এমন এক বিস্ময়কর ও বিরাট ঘটনা যে, এর পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। ঘটনা সংঘটিত হওয়াকালে পৃথিবীতে 'সময়' অতিবাহিত হয় নি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে সময়কে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। সাত আসমান, আট বেহেশত, সাত দোযখ, সিদরাতুল মুনতাহা, আরশে আজীম ইত্যাদি বিরাট বিরাট জগৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভ্রমণ করিয়ে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবকিছু অবলোকন করিয়ে অনেক জ্ঞান দান করেন এই মি'রাজের রাতে। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা তাঁর অন্তরাত্মা ভরপুর করে দেন। এরূপ একটি বিরাট কাজ আঞ্জাম দিতে সময়কে স্তব্ধ রাখা একান্ত জরুরী ছিলো। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যদি কেউ আলোকের গতিতে চলতে পারে তাহলে তার উপর দিয়ে 'সময়ের' গতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। আর মি'রাজের রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাহন বুরাকের গতি ছিলো আলোকের গতি থেকে দ্রুত- তার একেক পদক্ষেপ ছিলো দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত।

মি'রাজের ঘটনা ছিলো বাস্তব এবং সশরীরে এই ভ্রমণ হয়েছিল। এ ব্যাপারে ঈমানদারদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু সে যুগের কাফির, মুশরিকদের মতো আজকের যুগের কাফির, মুশরিক, মুনাফিকরা এই মি'রাজের ঘটনাকে মানতে নারাজ। এমনকি কোনো কোনো দুর্বল 'ঈমানদার' ব্যক্তিরাও একে 'আধ্যাত্মিক', 'স্বাপ্নিক' ইত্যাদি উপায়ে হওয়ার ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। আমরা জোর গলায় বলবো, যে মহান আল্লাহ তা'আলা 'কুন' শব্দের মাধ্যমে সারা মহাবিশ্বসহ, বেহেশত, দোযখ, আরশ, কুরসী ইত্যাদি বিরাট বিরাট জগৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন সেই অসীম ক্ষমতাধর প্রভুর পক্ষে তাঁর হাবীবকে সময় নামক উপাদানকে সাময়িকভাবে গতিহীন রেখে, পুরো মহাবিশ্ব ঘুরিয়ে দেখানো মোটেই কঠিন কিছু নয়। তাঁর জন্য সবকিছুই অতি সহজ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। মি'রাজের

ঘটনা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং আমরা শ্রবণ করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

মি'রাজের রাতে অসংখ্য অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল এবং আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে অনেক অপূর্ব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআন শরীফে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرٰى بِعَبْدِه لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত- যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল" [বনী ইসরাঈল : ১] এবং

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى * لَقَدْ رَأٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

"তাঁর চোখ না অন্যদিকে ঝুঁকেছে আর না সীমা অতিক্রম করেছে। তিনি তাঁর প্রতিপালকের কুদরতের বিরাট বিরাট নিদর্শনই না প্রত্যক্ষ করেছেন" [সূরা নাজম : ১৭-১৮]।

মদীনায় হিজরতের পূর্বাভাস

মি'রাজের ঘটনার পরে এবং এর পূর্বে তায়েফের ব্যর্থ ও দুঃখজনক সফর শেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে নিরাশ না হয়ে তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। মক্কা শহর ও আশপাশের বিভিন্ন গোত্রের নিকট যেয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়ের আহ্বান জানালেন। তিনি কালব, ফিজারা, আমির ইবনে সা'সা, হানীফা, শায়বান, হারিস, কা'ব, কিনদা প্রভৃতি গোত্রের নিকট দাওয়াত পৌঁছালেন। মক্কা শরীফের বাৎসরিক

প্রসিদ্ধ তিন মেলা তথা 'যুল মাজায', 'মাজান্না' এবং 'উকাজ' মেলায় গিয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কুরাইশ নেতাদের কৌশল ও অপপ্রচারের ফলে কেউই ইসলাম গ্রহণ করলো না- বরং অনেকে তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলো। তাদের সবাই এই দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো।

আকাবার প্রথম বাইআত: কিন্তু এই চরম নিরাশার মধ্যেও একদা ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে ওঠলো আল্লাহর অপরিসীম কৃপায়। বর্তমান জামারাতের নিকটে আকাবা নামক উপত্যকায় ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র জামাআতের সঙ্গে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ ঘটলো। এরা প্রাচীন প্রথানুযায়ী হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ (তখনকার নাম ইয়াসরিব) থেকে এসেছিলেন। মদীনার প্রখ্যাত 'খাজরাজ' গোত্রের এসব হজ্জযাত্রীদের নাম ছিলো: ১. আসআদ ইবনে যিয়ারা, ২. 'আওফ ইবনে হারিস, ৩ রাফি' ইবনে মালিক, ৪. কুতবা ইবনে 'আমীর, ৫. 'উকবা ইবনে 'আমির এবং ৬. জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন)। নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাঁরা সবাই সাথে সাথে ইসলাম কবুল করে নিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তারা সহজেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়।

এরপর সবাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই অঙ্গীকার করেন যে, দেশে প্রত্যাবর্তন শেষে তাঁরা সকলে ইসলামের দায়ী হিসাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এই ঘটনাই হলো 'আকাবার প্রথম বাইআত'।

আকাবার দ্বিতীয় বাইআত: অনেক সীরাত লেখক উপরোক্ত আকাবার বাইআতকে ঠিক 'বাইআত' বলেন নি। সুতরাং কারো কারো মতে আকাবার বাইআত মোট দু'টি। তবে আসলে এতে কোন মতানৈক্য নেই বরং বর্ণনার মধ্যে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন মাত্র। যা হোক আমরা মোট তিনটি বাইআত হয়েছিল বলে এখানে উল্লেখ করলাম।

প্রথম বাইআতের ছ'জন পুরুষ তাঁদের অঙ্গীকার পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। স্বদেশে ফিরে তাঁরা দীর্ঘ এক বছর যাবৎ দ্বীনের সফল দায়ী হিসাবে কাজ করেন। তাঁদের চেষ্টার ফলে মদীনা শরীফের প্রখ্যাত গোত্রদ্বয় 'আওস ও খাজরাজ বংশের সবার ঘরে ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামের আলোচনা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। নুবুওয়াতের একাদশ বছরে অর্থাৎ আকাবার প্রথম বাইআতের পরবর্তী বছরেই হজ্জের মাওসুমে উপস্থিত হলেন পূর্বোক্ত ছয় ব্যক্তি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরো সাতজন। মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ এসে আকাবায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন। ইসলামে দীক্ষিত হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষক হিসাবে মদীনা মুনুওয়ারায় প্রেরণ করা হোক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজে নির্বাচিত করলেন হযরত মুসআব ইবনে উমায়ার রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে।

হযরত উমায়ার রাদ্বিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। আওস ও খাজরাজ গোত্রের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেন। সুতরাং মদীনা মুনুওয়ারায় ইসলামের দীপ্তিময় আলো দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো।

আকাবার তৃতীয় বাইআত: এই বাইআতকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বাইআত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যা হোক এটাই মদীনা শরীফে হিজরতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। কারণ এই বাইআতের সময় মদীনা শরীফ থেকে আগত ৭৩ জন মুসলমান হজ্জযাত্রী আকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইআত গ্রহণের পরই তাঁকে হিজরত করার জন্য দাওয়াত করেছিলেন। তাঁরা বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনিসহ সকল মুসলমান মক্কা শরীফ থেকে হিজরত-পূর্বক আমাদের ইয়াসরিবে গমন করলে আমরা আপন পরিবার-পরিজনসহ আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধান করতাম।" সবাই অঙ্গীকারও করলেন যে,

"এজন্য যদি আমাদেরকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়, তবুও আমরা পিছপা হবো না- আমরা প্রস্তুত আছি এবং সকল ব্যাপারে আমরা আপনাকেই অনুসরণ করবো।"

বলা বাহুল্য, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোমধ্যেই হিজরতের আভাস পেয়ে গিয়েছিলেন তাই তিনি বিনাবাক্যে তাঁদের দাওয়াত কবুল করে নিয়ে বললেন, "আজ হতে তোমাদের প্রতিশোধ স্পৃহা আমারও প্রতিশোধ স্পৃহা বলে গণ্য হবে এবং তোমাদের ক্ষমা প্রদর্শন আমারও ক্ষমা প্রদর্শন বলে বিবেচিত হবে। আমি তোমাদেরই একজন আর তোমরাও আমারই।"

মদীনায় হিজরত

মক্কা শরীফের তখনকার কুখ্যাত কাফির-মুশরিকরা শেষ পর্যন্ত পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেওয়ার এক ঘৃণিত পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। মক্কাস্থ তখনকার চারটি প্রধান গোত্রের সবাই এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনায় জড়িত হলো। তারা জানতো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার পর বিরাট সমস্যা দাঁড়াবে- এমনকি হাসিম গোত্রের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাঁধতে পারে। তাই তারা সকল গোত্রের পক্ষ থেকে চারজন নওজোয়ানকে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য নির্বাচিত করলো। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আর যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে ওহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের খবর জানিয়ে দিলেন এবং মদীনা মুনুওয়ারায় হিজরতের নির্দেশ প্রদান করলেন।

কুরাইশরা নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘর ঘেরাও করে নিল। কিন্তু আল্লাহর অপরিসীম কুদরতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং তাদের সামন দিয়ে চলে গেলেন অথচ কেউ তাঁকে দেখলোই না! একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে ছিটাতে ছিটাতে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা ইয়া-সীনের "ফা-আগশাইনাহুম ফাহুম লা-ইয়াবসিরূন" পর্যন্ত পাঠরত অবস্থায় তিনি নিশ্চিন্তে বেরিয়ে আসলেন- কেউ টেরও পেলো না। নিজের বিছানায় রেখে আসলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে এভাবে রেখে আসার মূল কারণ ছিলো, নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জমাকৃত মানুষের মালামাল সমজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য। জানা থাকা দরকার, শুধু মুসলমানদের মালামাল তাঁর নিকট জমা ছিলো না- কট্টর বিরোধীরাও তাঁকে এতোই বিশ্বাস করতো যে, তাঁর চরম বিরুদ্ধবাদী হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের মালামাল নির্বিঘ্নে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমানত হিসাবে রেখে দিত। যা হোক, অল্প বয়স্ক আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্য বিছানায় এভাবে শুয়ে থাকা সত্যিই বিরাট সাহসের পরিচায়ক ছিলো। কারণ, ঘরের ভেতর ঢুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেয়ে কাফিররা হযরত আলীকে রাগের আতিশয্যে সহজেই হত্যা করতে পারতো। তবে শেষ পর্যন্ত তা করা থেকে বিরত থাকে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাওয়ায় কিন্তু পুরো মক্কা শহরব্যাপী এক হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেলে। যে কোনো মূল্যে তারা তাঁকে হত্যা করতে যারপরনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বাড়িতে যেয়ে পৌঁছলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে তিনি ঐ রাতেই মক্কা শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে সুর পর্বতের উপর আরোহণ করলেন। পর্বতশৃঙ্গের একটি গুহায় উভয়ে প্রবেশ করে আত্মগোপন করলেন। দীর্ঘ তিনদিন এখানে অবস্থান করতে হয়েছিল। অপরদিকে শত্রুপক্ষ তাঁকে খুঁজে না পেয়ে খুব পেরেশান হয়ে উঠলো। আবু জাহিল ঘোষণা দিল, "যে কেউ মুহাম্মদের মস্তক আমার নিকট এনে দেবে আমি তাকে একশত উট পুরস্কার দেবো"। এ ঘোষণার ফলে চতুর্দিকে লোকজন দলে দলে বেরিয়ে আসলো। সবারই ইচ্ছা একশত উঠ পুরস্কার হিসাবে লুফে নেওয়া।

পুরো মক্কা শহরে খোঁজাখুঁজির পরও কাফিররা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধান পেলো না। শেষ পর্যন্ত একদল লোক সুর পাহাড়ে আরোহণ করে ঐ গুহার একেবারে নিকটে এসে হাজির হলো। একসময় গুহার ভেতর থেকে তাদের পা দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠলো। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু

ভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন কী হবে? দুশমনদের সংখ্যা অনেক আর আমরা মাত্র দু'জন!" তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন: "তুমি ভুল বলছো আবু বকর! আমরা দু'জন নই- তিনজন। মনে রেখো, আমাদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ পাক আছেন! ভয়ের কোনো কারণ নেই। তিনিই আমাদেরকে রক্ষা করবেন।" পবিত্র কুরআন শরীফে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"যখন তাকে কাফিররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" [সূরা তাওবাহ : ৪০]

আল্লাহর কী অপূর্ব কুদরত! কুরাইশরা দেখতে পেলো গুহার মুখে প্রকাণ্ড এক মাকড়সার জাল। এছাড়া একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধে সেখানে ডিম পেড়ে বাচ্চা ফুটানোর জন্য তা দিচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখে তারা ভাবতেই পারলো না যে, এই গুহার ভেতর কেউ থাকতে পারে! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে দুর্বলতম মাকড়সার একটি জাল ও একজোড়া কবুতর দ্বারা দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করে দিলেন। একমাত্র তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই।

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ফাতাহ]

রাতের অন্ধকারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর গোলাম আমির ইবনে ফাহিরা যাত্রা করলেন মদীনা মুনুওয়ারার পথে। পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেগভরা কণ্ঠে বললেন: "হে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা! কতো সুন্দর শহর তুমি, আর আমার কতো প্রিয় ভালোবাসার তুমি! যদি আমার জাতি আমাকে এখান থেকে বের করে না দিতো তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতাম না।"

সুরাকা ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঘটনা

সচরাচর রাস্তা পরিত্যাগ করে অন্য এক রাস্তায় তাঁরা পাড়ি জমালেন। কুরাইশরা তাঁদের কোনো সন্ধানই পেলো না। তবে মুদলিজ গোত্রের সর্দার সুরাকা ইবনে মালিক [পরবর্তীতে ইসলামধর্মে দীক্ষিত] একশত উটের লোভ সামলাতে না পেরে হিজরতকারীদের পশ্চাদ্বাবন করলেন। অশ্বারোহী সুরাকা যখন মুবারক সেই কাফিলার নিকটবর্তী হলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছুটা বিচলিত হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীকে সান্ত্বনা দান করলেন এবং সাথে সাথে এই দু'আও করলেন: "আয় আল্লাহ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা তাকে (সুরাকাকে) দমন করুন"। সুবহানাল্লাহ! দু'আর সাথে সাথেই সুরাকার ঘোড়ার পাগুলো বালুকার মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেলো। তিনি আর আগে পা বাড়াতে পারলেন না। সুরাকা এই অবস্থা দেখে বুঝতে সক্ষম হলেন, যা তিনি ইচ্ছা করেছেন তা তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর হবে এবং হিজরতকারী এই কাফিলা সাধারণ নয়। তাই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে সাথে সাথে ক্ষমা করে দিলেন। এছাড়া তার ব্যাপারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন:

"হে সুরাকা! সে সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন পারস্য সম্রাটের কঙ্কন তুমি তোমার হাতে পরবে?"

পরবর্তীতে এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সামনে যখন পারস্য সম্রাট কিসরার কঙ্কন, কোমরবন্দ, মেখলা ও শাহী মুকুট এনে হাজির করা হলো তখন তিনি এই সুরাকাকে ওগুলো পরার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কুবা পল্লীতে অবস্থান

যে ভ্রমণ পুরো মানবজাতির ইতিহাসকে সর্বকালের জন্য পরিবর্তন করে দিয়েছিল সেই হিজরতের ভ্রমণ শেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উপকণ্ঠে কুবা নামক পল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন। অবশ্য পাঁচ শতাধিক আনসারসহ মদীনার আবালবৃদ্ধবনিতা এই মুবারক কাফিলাকে এমন এক অপূর্ব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিল যে, ইতিহাসে তার তুলনা খুবই বিরল। বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে এই অভ্যর্থনার বর্ণনা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মদীনার কিশোর-কিশোরীরা ধপ বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে বলতে লাগলো:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَتِ الْبِوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَادَعىٰ لِلّٰهِ دَاعٍ

اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا * جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

ছানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের দিক থেকে পূর্ণিমার চাঁদের উদয় ঘটেছে।

যতোদিন আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো একজনও থাকবে, ততোদিন আমাদের উপর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব হবে।

আমাদের মধ্যে প্রেরিত ওহে সজ্জন! আপনি বাধ্যতামূলক আনুগত্যের নির্দেশ নিয়ে এসেছেন।

এই ঐতিহাসিক দিনটি ছিলো ১২ রবিউল আওয়াল হিজরি ১ম সন, ৩১শে মে ৬২২ ঈসায়ী। কুবা পল্লীতে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদই ছিলো ইসলামের প্রথম মসজিদ। এছাড়া এখানেই সর্বপ্রথম জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঐতিহাসিক এই উভয় স্থানে দর্শনার্থীদের জন্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতান্তরে ১৪ দিন পর্যন্ত কুবায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি মদীনার মূল শহরের দিকে অগ্রসর হোন।

অসংখ্য আনসার পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বীয় উট আল-কাসওয়ায় আরোহণ করে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। আনসার গোত্রপতিরা বার বার

তাঁকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটনীর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। বললেন, এটা আদিষ্ট হয়েছে। যেখানে গিয়ে এটা বসে পড়বে সেখানেই হবে তাঁর আবাসস্থল। আনসারদের কারো মনে দুঃখ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত বর্তমান মসজিদে নববী যেখানে অবস্থিত সেখানে এসে উটনী বসে পড়লো। সে যুগে এই জায়গাটি ছিলো একটি উন্মুক্ত ময়দান। তবে নিকটস্থ বাড়িটি ছিলো প্রখ্যাত আনসার সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর। তিনি তো খুশীতে পঞ্চমুখ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই বাড়িতে মেহমান হওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন।

মদীনা শরীফ পৌঁছেই তিনি উটনী যেস্থানে বসেছিল সেই ময়দান দু'জন ইয়াতীম ছেলের নিকট থেকে ক্রয় করে নিলেন। এরপর সেখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য গৃহ নির্মাণের কাজ আঞ্জাম দিলেন। এরপর তিনি স্ব-পরিবারে নিজের বাড়িতে যেয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে মাত্র ১০ বছর বয়স্ক হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা হযরতের নিকট হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্রটিকে আপনার খাদিম হিসাবে আমি দান করতে চাই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাসের মাতার এই আবদার গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজীর গৃহে খাদিম হিসাবে ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে দাম্পত্য জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর বেশ কিছু হাদীস শরীফ আমরা হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে পেয়েছি।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদীনা শরীফ পৌঁছার স্বল্পকাল পরই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। এই ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মাণের কাজে স্বয়ং আল্লাহর হাবীবও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইট বহনকালে তিনি আবৃত্তি করতেন:

اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاَخِرَة
فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة

হে আল্লাহ! আখিরাতের পুরস্কারই তো প্রকৃত পুরস্কার;
অতএব, আনসার ও মুহাজিরদেরকে আপনি দয়া করুন।

আনসার ও মুহাজিররা উক্ত কবিতা পুনরাবৃত্তি করতে করতে তাঁকে অনুসরণ করতেন। সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব সুন্দর ও আনন্দময় ছিলো সে দৃশ্য!

প্রথম হিজরি

হুজুরে পাক নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের উপর অত্যল্প কিছু বর্ণনা তুলে ধরা ছাড়া আর বেশী গভীর গবেষণা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। নকশবন্দী-মুজাদ্দিদী শায়খদের জীবনালোচনার পূর্বে সব তরীকার মূল সূত্র তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যময় জীবনের উপর আলোকপাত একান্ত জরুরী মনে করেই এই লেখার অবতারণা। যা হোক, এখন আমরা হযরতের মাদানী জিন্দেগীর দশটি বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী একে একে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

এই হিজরিতেই সর্বপ্রথম আযানের প্রথা শুরু হয়। নামাযে আসার জন্য 'ডাক' দেওয়ার ব্যাপারে সাহাবারা বিভিন্ন মতামত পেশ করেন। কেউ বললেন একটি পতাকা উত্তোলন করা যাবে; কেউ বললেন, শিঙ্গা বাজানো যায়; অন্যরা বললেন, ঘন্টা বাজিয়ে নামাযে আসার ইঙ্গিত দেওয়া যাবে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসব মনঃপুত হলো না- এসব উপায় অন্যান্য ধর্মেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলামের জন্য একক একটি ব্যবস্থা থাকা জরুরী। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের যে কোনো ঐতিহ্য অনুসরণ মুসলমানদের জন্য আদৌ ঠিক নয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই সঠিক সিদ্ধান্ত এসে গেলো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্বপ্নে দেখলেন, একজন ফিরিশতা এসে তাঁকে আযানের বাক্যগুলো শিক্ষা দিচ্ছেন। পরে জানা গেলো হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুও অনুরূপ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট এভাবে ডেকে মানুষকে নামাযের জন্য মসজিদে জড়ো করার প্রস্তাবটি ভালো লাগলো- তাই তিনি হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সর্বপ্রথম আযান দিতে নির্দেশ দিলেন।

এ বছরই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রাথমিক দিনগুলোতেই আনসার ও মুহাজিরীনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরের শা'বান মাসে হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্ত্রী হিসাবে বসবাস শুরু করেন- যদিও তাঁর বিবাহ বেশ পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় হিজরি

এ বছর রমজান মাসের রোজা, যাকাত, ঈদের নামায এবং সাদক্বায়ে ফিতরা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া তখনও মুসলমানদের কিবলা ছিলো বাইতুল মাক্বদিস। এ বছর মসজিদে ক্বিবলাতাইনে নামাযরত অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল্লাহ তথা কাবা শরীফের দিকে ঘুরিয়ে কিবলা পরিবর্তন করা হয়। সুতরাং মক্কা শরীফের বাইতুল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব-মুসলিমের কিবলা হিসাবে নির্দিষ্ট হলো। প্রথম ঈদুল আযহার নামাযও এ বছর সংঘটিত হয়।

জঙ্গে বদর

এ বছরের রমজান মাসের ১৭ তারিখ বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রখ্যাত যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩১৩ জন। অপরদিকে কাফিরদের সংখ্যা ছিলো ৯৫০ জন। কিন্তু স্বয়ং রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন এবং এক মহান বিজয় প্রদান করেন। এই যুদ্ধে মক্কাস্থ বড় বড় কাফির মুশরিক নেতারা নিহত হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিলো মোট ১৪ জন। এদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন আনসার এবং বাকী ৬ জন মুহাজির। কাফিরদের নিহতের সংখ্যা ছিলো মোট ৭০ জন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শেষে বিজয়ী বেশে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদেরকে সামরিক শক্তি হিসাবে

দৃঢ়পদ করে তুলে। পরবর্তীতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে '**বদরী**' খেতাব প্রদান করা হয়।

যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে সাহায্যের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। এই দু'আটুকু মহান রাব্বুল আলামীন কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দু'আ করেন: "হে আল্লাহ! যদি তুমি এই ক্ষুদ্র জামাআতটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদত করবার কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূর্ণ করো। ও আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্য চাই; তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।"

বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বদর যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। সে সময় তোমরা ছিলে অসহায়। অতএব আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো" [সূরা আলে-ইমরান : ১২৩]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا * سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

"যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ আমি কাফিরদের মনে ভীতির সার করে দেব কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়।" [সূরা আনফাল : ১২]।

তৃতীয় হিজরি

মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে প্রথম মৃত্যুবরণকারী সাহাবীর নাম ছিলো উসমান বিন মা'জুন রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এ বছর তাঁর মৃত্যু হয়। মদীনা মুনুওয়ারার প্রখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। এ বছরের রমজান মাসে হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।

জঙ্গে উহুদ

তৃতীয় হিজরির সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো জঙ্গে উহুদ। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে মদীনার উপকণ্ঠে ৭০০ মুসলিম বাহিনী ৩০০০ কাফির সৈন্যদের সঙ্গে চরম মরণপণ সমর-পরীক্ষার সম্মুখীন হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের পূর্বেই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনীকে ছোট্ট এক টিলায় থাকার নির্দেশ প্রদান করলেন। বললেন যুদ্ধের সময় তোমরা আমার নির্দেশ ছাড়া এই স্থান পরিত্যাগ করবে না। এদিক থেকে কাফিরদের অশ্বারোহী বাহিনী হামলা করতে পারে। তাদেরকে যে কোনো মূল্যে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই নির্দেশের উপর অটল থাকতে ব্যর্থ হওয়ায়, যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত তখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে কাফির অশ্বারোহী বাহিনী পেছন দিক থেকে হামলা করে মুসলমানদের অবস্থা নাজুক করে ফেললো। নিশ্চিত বিজয় মুহূর্তে পলায়নরত কাফিরদেরকে দেখে ঐ ৫০ তীরন্দাজদের অধিকাংশ গনিমতের মাল তুলে নিতে স্বস্থান পরিত্যাগ করলেন। তাদের আমীর আবদুল্লাহ বিন যুবাইরসহ ১১ জন স্বস্থান পরিত্যাগ করলেন না। তারা সেখানেই যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এদিকে স্থানত্যাগকারীরা ভেবেছিলেন যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, কাফিররা পলায়ন করছে, তাহলে এখানে অবস্থানের আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের এই মারাত্মক ভুলের জন্য শেষ পর্যন্ত অনেক সাহাবীকে শাহাদতবরণ করতে হয়েছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবননাশের আশঙ্কা দাঁড়ায়। কাফিররা তাঁকে ঘিরে ফেলে। অবশ্য সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের শরীরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, শহীদ হয়ে

তাঁকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়ে যান। এরপরও উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস নামক এক নরাধম কাফিরের প্রচণ্ড প্রস্তরাঘাতে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দন্ত মুবারক শহীদ হয়ে যায়। ইবনে কুমাইয়্যাহ নামক আরেক কাফির তরবারি দ্বারা তাঁকে আঘাত হানে। এই আঘাতে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল, তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর এক কাফির গুজব তুললো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন। এই সংবাদ পুরো যুদ্ধের ময়দানব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো। এতে কাফিররা যুদ্ধের উৎসাহ হারিয়ে ফেললো। এদিকে মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিল চরম দুঃখ-বেদনা। এভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলো।

উহুদ যুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আসাদুল্লাহ হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ ৭০ জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল কারো পক্ষেই ছিলো না। কাফিররা এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এমনটি ভাবা ঠিক নয়। যুদ্ধের ময়দান থেকেই তারা ফিরে যায়। বিজয়ী হলে তারা অবশ্যই মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে মদীনা শরীফ দখল করার উদ্দেশ্যে হামলা করতো। যুদ্ধ শেষে (তখনও) কাফির নেতা আবু সুফিয়ান মুহাজির প্রখ্যাত সাহাবীদের নাম ধরে ধরে ডাকছিলেন। ইতোমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী গারে উহুদ নামে একটি স্থানে অবস্থান করলেন। আবু সুফিয়ানের ডাকাডাকি তাঁদের কর্ণগোচর হচ্ছিল। কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কথা বলতে নিষেধ করলেন। শেষ পর্যন্ত যখন আবু সুফিয়ান বললেন, "যুদ্ধ পাশা খেলার মতো অনিয়মে ভরা। আজ কারো জয় হচ্ছে তো কাল জয় হচ্ছে অন্যের। দেবতা হোবলের জয় হোক!" এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, উমর! ওকে বলো, "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান। তিনি ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ নেই। আমাদের নিহতরা যাবে জান্নাতে আর তাদের নিহতরা যাবে জাহান্নামে!" উমর ইবনে খাত্তাবের কণ্ঠে আবু সুফিয়ান এসব কথা শোনে জবাব দিলেন, "আমাদের রয়েছে উয্যা দেবতা- তোমাদের উয্যা নাই!"

সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা এর জবাব কি দেবো?"। তিনি বললেন, "তোমরা বলো, الله مولنا ولامولى لكم -"আল্লাহ

আমাদের প্রভু, তোমাদের কোন প্রভু নাই!" এরপর যখন উভয় পক্ষ যার তার গন্তব্যপথে রওয়ানা হয়ে গেলেন তখন, কাফিরদের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জের সুরে একজন বললো, "হে মুসলমানগণ! আগামী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় আমরা তোমাদের মুকাবিলা করবো"। এতদশ্রবণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে জবাব দিতে বললেন, "বলো! হ্যাঁ। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এই তারিখই বহাল রইলো।"

এদিকে মদীনা মুনুওয়ারায় যুদ্ধের খবর দ্রুত পৌঁছে গেল। মহিলা, কিশোর-কিশোরী ও বৃদ্ধরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কাফিররা বিজয়ী হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অসংখ্য মুসলিম সৈন্য নিহত হয়েছেন। এরূপ খবর শ্রবণে তারা ভীষণ মনঃক্ষুন্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পুরুষ-মহিলাদের অনেকেই ছুটে চললেন উহুদের দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জানা গেলো পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আছেন তখন তারা সুস্থির বোধ করলেন। যদিও অনেকেই তাদের নিকটাত্মীয়- পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র ইত্যাদি হারিয়েছিলেন, তথাপি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আছেন দেখে সকলে সেসব হারানোজনদের দুঃখ ভুলে গেলেন। নবীজীর প্রতি ভালোবাসার কী অপূর্ব নিদর্শন!

চতুর্থ হিজরি

এ বছর হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরের সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিলো বীর মাউনায় ৬৯ জন সাহাবীর করুণ শাহাদাতবরণ। এদের সকলেই হাফিজ ও অনেকে আসহাবে সুফফার সদস্য ছিলেন। একমাত্র কা'ব ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু জীবন নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে করুণ এই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা প্রদান করেছিলেন। এই ঘটনার উপর সঠিক বর্ণনা আমরা বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থ থেকে এখানে তুলে ধরছি।

নজদ অঞ্চলের আমির বিন মালিক নামক এক ব্যক্তি একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আবেদন জানালো যে, সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে। তবে সে তার গোত্রকে ভয় করে সুতরাং একদল

বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানবান সাহাবী যদি সেখানে ইসলামের দাওয়াতের জন্য পাঠানো হয়, তাহলে বেশ উপকার হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। সত্তুর জন সাহাবীর এক কাফিলা যখন বীর মাউনা নামক স্থানে পৌঁছুলো তখন বনী সুলায়ম এর উসাইয়্যা, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্র সম্মিলিতভাবে একরূপ নিরস্ত্র এই কাফিলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাহাবারা যেটুকু সম্ভব প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন কিন্তু একমাত্র কা'ব ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পান। তিনি পরবর্তীকালে খন্দক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ লাভ করেন।

বীর মাউনায় হযরত ইবনে মিলহান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জাব্বার ইবনে সুলমা নামক একব্যক্তি হত্যা করেছিল। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সাহাবী যে বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা শ্রবণ করে এই ঘাতক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন: আমাকে ইসলামের দিকে যে জিনিস ধাবিত করেছিল তা ছিলো এই যে, আমি বীর মাউনায় ইবনে মিলহানের দিকে বল্লম নিক্ষেপ করি। এটা তাঁর বক্ষদেশ ভেদ করে গেল। তিনি এ সময় যে বাক্য তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন তা ছিলো: "কাবার প্রতিপালকের কসম! আমি কামিয়াব হয়ে গেছি, হয়েছি সফলকাম"। তিনি আরো বলেন, এই বাক্যটি শ্রবণ করে আমি অবাক হলাম। আমি তাঁকে হত্যা করলাম, আর তিনি মৃত্যুর সময় বললেন, সফলকাম হয়েছি! পরবর্তীতে বুঝতে সক্ষম হলাম, শাহাদাতবরণের অমিয় সুধাপানে আত্মহারা হয়ে তিনি এরূপ বলেছিলেন। আমি তাই এই মহান ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করলাম ও ইসলামে দীক্ষিত হলাম।

বীর মাউনার এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবতই খুব বেশী মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে সেখানে প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল।

এ বছরের রবিউল আওয়াল মাসে ইয়াহুদী গোত্র বনী নাদিরের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে অভিযান সংঘটিত হয়। এই গোত্রটি ছিলো ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হযরত আবু বকর

সিদ্দীক, হযরত উমর ও হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। উদ্দেশ্য ছিলো বনী আমিরের দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণের ক্ষেত্রে সাহায্য কামনা করা। বনী আমিরের সঙ্গে এদের মৈত্রী চুক্তি ছিলো। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে প্রকাশ্যে খুব ভালো মিষ্ট ব্যবহারের ভান করে এবং গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

সাহাবায়ে কিরামসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘরের দেওয়াল সংলগ্ন স্থানে বসা ছিলেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলো যে, এরূপ সুযোগ আর কোনদিন মিলবে না। উপর থেকে তাঁর মস্তকে বড় একটি পাথর ছুড়ে মারতে পারলেই হয়! তাঁর থেকে আমরা চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়ে যাবো। তাঁদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে সাথে সাথে সেখান থেকে উঠে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং এদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের আয়োজন শুরু হলো।

একদল মুজাহিদসহ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নাদিরে পৌঁছে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখলেন। দীর্ঘ ৬ দিন অবরোধ রাখার পর বনী নাদিরের নেতারা প্রস্তাব দিলো যে, তারা উট যা বহন করতে পারে সে পরিমাণ মালামাল নিয়ে এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে প্রস্তুত- অবশ্য কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নেবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। সুতরাং বিনা রক্তপাতেই বনু নাদিরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কার করা হলো। এই অভিযানের সময়ই সুরা পান নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাজিল হয়।

এ হিজরির শাওয়াল মাসে উম্মে সালামাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। অপরদিকে তাঁর স্ত্রী হযরত জায়নাব বিনতে খুজাইমাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা মাত্র ৮ মাসের বৈবাহিক জীবন অতিক্রান্ত করে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পঞ্চম হিজরি

এ হিজরির মুহাররম মাসে 'যাতুর রিক্বা' অভিযান সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদের দুষ্ট বনী মাহারিব ও বনী ছা'লাবা গোত্রদ্বয়কে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নাখলা নামক স্থানে পৌঁছার পর অনেকের পায়ে ফোসকা পড়ে যায়, কারণ উটের সংখ্যা কম থাকায় অধিকাংশ মুজাহিদকে হেটে যেতে হয়েছিল। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমাদের ৬ জনের মধ্যে মাত্র ১টি উট ছিলো। ফলে পদব্রজে চলতে গিয়ে সকলের পায়ে ফোসকা পড়ে যায় এবং পায়ের নখ পর্যন্ত উপড়ে যায়।" এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য লোকে নিজেদের পায়ে পট্টি বেঁধেছিলেন। এজন্য এ যুদ্ধ গাযওয়া যাতুর রিক্বা বা পট্টিওয়ালা যুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করে। তবে আসলে যুদ্ধ হয় নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসময় সালাতুল খাওফ বা ভয়ের নামাযও আদায় করেন।

এই যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলা একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। সাহাবায়ে কিরামও অন্যান্য বৃক্ষরাজির ছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বীয় তলোয়ার গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমাদের তন্দ্রা এসে গেলো। কিছুক্ষণ পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাক দিলেন। সেখানে গিয়ে দেখি এক বেদুঈন বসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অবগত করলেন, এই লোকটি আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখে আমার তলোয়ার হাতে তুলে নেয়। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি আমার মাথার উপর তলোয়ারখানা উঁচিয়ে রেখেছে। সে বললো: এখন তোমাকে কে বাঁচাবে? আমি জবাব দিলাম: আল্লাহ। এই দেখো, সে এখন বসে আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো সাজা দিলেন না। আসলে লোকটির হাতদ্বয় সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গিয়েছিল।

এ বছরের অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অশ্ব থেকে পড়ে যেয়ে আহত হন এবং মাশরাবায় তিনি ৫দিন অবস্থান করেন; হযরত জওয়ারিয়্যাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোন; মুনাফিকরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার চেষ্টা করে। পরে স্বয়ং আল্লাহ পাক হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার উত্তম নিষ্কলুষ চরিত্রের স্বীকৃতি হিসাবে আয়াত নাযিল করেন। অপবাদকারীদেরকে সনাক্ত করে শরয়ী নিয়মানুযায়ী ৮০ দুররা মারা হয়।

খন্দকের যুদ্ধ

এ হিজরির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো খন্দকের যুদ্ধ। একে আরবীতে গাযওয়ায়ে আহযাব বলে। এ বছরের (অর্থাৎ ৫ম হিজরির) শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের সূচনা হয়। মক্কার কুরাইশ কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে নও-মুসলিমদের এটিই ছিলো চূড়ান্ত যুদ্ধ। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। এই বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যেয়ে মুসলমানরা বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হোন। সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধ সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ
الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

"যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে, সে সময় মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল" [সূরা আহযাব : ১০-১১]।

কুরাইশ, ইয়াহুদী ও গাফফান গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত এই বিরাট ফৌজ যখন মদীনার পানে অগ্রসর হলো তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্থিতির নাজুকতা সকলকে জানালেন। এরপর পরামর্শ হলো কী করা যায়। অনেকের প্রস্তাব শেষে হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্যদের একটি অতি পরিচিত ও কার্যকর সামরিক কৌশল হলো পরিখা খনন করা। অশ্বারোহী বাহিনীর হামলার বিরুদ্ধে এই কৌশল বেশ উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা মদীনা শরীফের

যেসব এলাকা দিয়ে হামলার আশঙ্কা করছি সেখানে খন্দক বা খাল খনন করতে পারি। আরবদের নিকট এই কৌশল ছিলো সম্পূর্ণ অভিনব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পছন্দ করলেন। সুতরাং মদীনার উত্তর-পশ্চিম দিকের ময়দানে খন্দক খননের নির্দেশ দিলেন। এদিক থেকেই মদীনা শরীফ আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো সর্বাধিক।

প্রতি চল্লিশ হাত পর্যন্ত খন্দক খননে দশ জন করে সাহাবা নিযুক্ত করা হলো। খন্দকের দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় পাঁচ হাজার হাত, অর্থাৎ ২৫০০ গজ (১.৩ কি.মি)। এর গভীরতা ছিলো সাত থেকে দশ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ১০ হাত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক খননে নিজে শরীক হোন। এ সময় শৈত্যপ্রবাহ বেশ তীব্র ছিলো। খাদ্যের পরিমাণ সীমিত থাকায় একাধারে তিন-চারদিন পর্যন্ত অত্যল্প খাবার খেয়ে কিংবা উপবাসে থাকতে হয়েছিলো সাহাবায়ে কিরামকে। হযরত আবু তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা ক্ষুধার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম এবং নিজেদের পেট খুলে দেখালাম। আমাদের পেটে তখন একটি করে পাথর বাঁধা ছিলো। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবস্থা দেখে নিজের পেট মুবারক উন্মুক্ত করলেন। আমরা দেখতে পেলাম তাঁর পবিত্র পেটে দু'টি পাথর বাঁধা আছে। এরূপ ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই সবার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোন ভাটা পড়ে নি- কারণ, তাঁরা যা করছিলেন তা ছিলো সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে: একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে খন্দকের নিকট যেয়ে দেখতে পেলেন ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যে মুহাজির ও আনসাররা খনন কার্যে লিপ্ত আছেন। তাদের নিকট না ছিলো কোনো গোলাম কিংবা কর্মচারী যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। সাহাবায়ে কিরামের এই কঠিন পরিশ্রম দেখে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান মুবারক থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'আ উচ্চারিত হলো:
"হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন; অতএব আনসার ও মুহাজিরদের তুমি ক্ষমা করো।"

উপরোক্ত দু'আ যখন খননকারীদের কর্ণগোচর হলো তখন তাঁরাও বলতে লাগলেন:

نحن الذين بايعوا محمدا * علىٰ الجهاد مابقينا ابدًا

"আমরা তো তারাই, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের জীবন প্রদীপ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত জিহাদের বাইআত গ্রহণ করেছি।"

ভবিষ্যদ্বাণী

খন্দক খননকালে এক বিরাট পাথর সামনে পড়লো। সাহাবাদের কেউই একে ভাঙ্গতে পারছিলেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানানোর পর তিনি নিজেই কোদাল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসলেন। এরপর বিসমিল্লাহ বলে এমন জোরে আঘাত হানলেন যে, পাথরটি এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেলো। সাথে সাথে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, "আল্লা-হু আকবার!" ধ্বনি। বললেন, আমাকে সিরিয়ার চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়বার আঘাত করার ফলে পাথরখানার আরেক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তিনি আবারো 'আল্লা-হু আকবার!' ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, আমাকে পারস্যের চাবিগুচ্ছও দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের চোখে মাদায়েনের শ্বেত প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। এরপর আবার প্রচণ্ড আঘাত করলেন পাথরের উপর- এতে তা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল। এবার আরো জোরে উচ্চারণ করলেন 'আল্লা-হু আকবার!' ধ্বনি, বললেন, আমাকে ইয়ামনের চাবিগুচ্ছও দেওয়া হয়েছে। এখনই আমি সান'আ শহরের তোরণ অবলোকন করছি। সুবহানাল্লাহ! এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণ করছিলেন যখন আরবের বিরাট এক বাহিনী কর্তৃক মুসলমানরা পরিবেষ্টিত হচ্ছিলেন, তাদের জান-মালের তথা অস্তিত্বের নিশ্চয়তা পর্যন্ত ছিলো না। তীব্র শৈত্য প্রবাহ, ক্ষুধা, অভাব-অনটন ও বিরাট ক্লান্তিক্ষণে এই কথাগুলো যেনো সাহাবায়ে কিরামের কান-মন-দৃষ্টিতে দীর্ঘ ট্যানেল শেষে ক্ষীণ আলোর আভা ছিলো। কারণ, তাঁরা জানতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে উচ্চারিত এসব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন হতে যাচ্ছে। আর তা অবশ্যই হয়েছিল। হযরতের মক্কী জিন্দেগী শেষ হতে না হতেই সিরিয়া, পারস্য, মিশর, ইয়ামন ইত্যাদি অঞ্চলের বিরাট বিরাট শক্তিধর রাজাধিরাজদের পরাজিত করে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি মু'জিযা প্রকাশিত হয়। এখানে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরছি।

১. পাথরগুলো নরম হওয়া

খননকারীরা যখন কোন পাথর ভাঙ্গার ব্যাপারে কষ্টের সম্মুখীন হতেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের পানি দ্বারা কুলি করতেন ও কিছু পাঠ করে দু'আ করে এই পানি পাথরে ছিটিয়ে দিতে বলতেন। এতে পাথরগুলো বালির ঢিবির মতো নরম হয়ে যেতো।

২. খাবারে বরকত ও বড়ো পাথর ভাঙ্গা

খাবারের মধ্যে এমন বরকত হতো যে, অনেক লোক সামান্য খাবারেও তৃপ্ত হতেন এমনকি সমগ্র বাহিনীই পরিতৃপ্ত হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু একটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের দিন খননকাজে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় এক বিরাট প্রস্তর দেখা দিলো। এটা খন্দক খননে বাঁধার সৃষ্টি করছিলো, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বললেন, আমি নামছি। আমরা দেখতে পেলাম তাঁর পবিত্র পেটে পাথর বাঁধা আছে। আমরা এ সময় তিনদিন যাবৎ উপবাসে ভুগছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাথরে কোদাল দিয়ে আঘাত হানার সাথে সাথে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরো বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে নিজের গৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। ঘরে পৌঁছে স্ত্রীকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে অবস্থায় দেখেছি তাতে আমার ধৈর্য রাখতে পারছি না। তুমি খানাপিনার কোনো ব্যবস্থা করো। স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ- কিছু যব আর ঐ বকরির বাচ্চা দ্বারা খাওয়ানো যাবে। বাচ্চাটি জবাই করো। সুতরাং রান্নার ব্যবস্থা করে ফিরে গেলাম পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে। তাঁকে বললাম, আমি অল্প কিছু খানার ব্যবস্থা

করেছি। আপনি দু'এক জনকে সাথে নিয়ে চলুন। তিনি জানতে চাইলেন খানার পরিমাণ কি? আমি বিস্তারিত বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, এতো অনেক বেশী খাবার! তুমি ফিরে যাও। তোমার স্ত্রীকে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত ডেগচি চুলা থেকে নামাবে না এবং রুটি উনুন থেকে বের করবে না। এরপর সবাইকে ডেকে বললেন, হে লোকসকল বিসমিল্লাহ বলো! সকল আনসার ও মুহাজির দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি আমার বাড়িতে মেহমানদারির জন্য সবাইকে দাওয়াত করলেন। বললেন, জাবির এক বিরাট দাওয়াতের আয়োজন করেছে, আমরা সবাই তার বাড়িতে যেয়ে মেহমানদারী করবো।

বাড়ি পৌঁছে আমি স্ত্রীকে বললাম, খবর রাখো কিছু? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত লোকদের নিয়ে তোমার বাড়িতে খেতে আসছেন! স্ত্রী বললেন, খাবারের ব্যাপারে তিনি কিছু বলেছেন কি? তাকে আমি সব খুলে বললাম। ইতোমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে লোকসকল ভিড় করো না। সবাই বসে যাওয়ার পর তিনি ডেগচির ঢাকনা না খুলে রুটি ও গোস্ত পরিবেশন করতে বললেন। সুবহানাল্লাহ! সবাই পেট পুরে খেলেন কিন্তু রুটি ও গোস্ত শেষ হলো না। তিনি বললেন, এবার তোমার গৃহের সকলে খেয়ে নাও।

কুরাইশদের কর্তৃক মদীনা অবরোধ

দশ হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কুরাইশরা মদীনার উপকণ্ঠে এসে ছাউনি ফেললো। খন্দকের অপরদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'লা পাহাড়কে পেছনে রেখে তিন হাজার মুসলিম সৈন্যবাহিনীসহ তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান নিলেন। শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী সৈন্য সামনে এসে খন্দকের পারে থমকে দাঁড়ালো। তারা এরূপ যুদ্ধকৌশল কখনো অবলোকন করে নি। একটি স্থানে খন্দকের প্রশস্ততা কিছু কম ছিলো। সেদিকে আরবের প্রখ্যাত অশ্বারোহী বীর আমর ইবনে আবদুদ অগ্রসর হয়ে হাঁক ছাড়লো: কে এমন আছে যে, আমার মুকাবিলা করবে? হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এগিয়ে এসে বললেন, আমর! তুমি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলে যে, কুরাইশদের কেউ তোমাকে দু'টো বিষয়ে দাওয়াত করলে তার একটি তুমি অবশ্যই কবুল করবে।

আমর স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দিলো। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, ঠিক আছে। আমি তোমাকে আল্লাহ, তদীয় রাসূল ও ইসলামের দিকে দাওয়াত করছি। সে বললো, আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই! হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে আমি তোমাকে যুদ্ধের মুকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছি! সে বললো, ভাতিজা! আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করতে চাই।

আমর এতে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। শুরু হলো যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শের-ঈ-খোদা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু তলোয়ারের আঘাতে আমরের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। আমরের সঙ্গী নওফাল এই অবস্থা দেখে দ্রুত সেখান থেকে পালালো।

খন্দকের যুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষ তেমন বেশী হয় নি। বার বার শত্রুরা খন্দক পার হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হচ্ছিলো। আবু সুফিয়ান ভাবলেন, মদীনার মুসলমানদেরকে জব্দ করার একটি পথ হলো পুরো শহরকে অবরোধ করে রাখা। এতে সবাই অনাহারে অর্ধাহারে জর্জরিত হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। সুতরাং অবরোধের পন্থাই তারা বেছে নিল। দীর্ঘ এক মাস এই অবরোধ স্থায়ী ছিলো। এমনিতেই সে বছর ছিলো আকাল- তার উপর এই অবরোধের ফলে মদীনা মুনুওয়ারায় কোনো পণ্যদ্রব্য বাইর থেকে আসছিলো না। ফলে সবার উপর নেমে আসে প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশা। এদিকে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন হলো। তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে চাই। আসলে তা ছিলো না- এ ছিলো তাদের পালাবার একটি কৌশল মাত্র।

ভয় ও পেরেশানীর মধ্যে মুসলিম বাহিনী কালাতিপাত করছিলেন। শত্রু বাহিনী অবরোধ ওঠানোর কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছিলো না। একদিন গাতাফান গোত্রের নু'আম ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কওমের অজান্তে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আপনার

অভিপ্রায়মাফিক হুকুম করুন। তিনি বললেন, যুদ্ধ হলো কৌশল বা হিকমাতের নাম। তুমি গোয়েন্দাগিরি করতে পারো। শত্রুপক্ষের মধ্যে ঐক্যের ফাটল ধরাতে তুমি চেষ্টা চালাও। তার চেষ্টার ফলে বনী কুরাইজা ও কুরাইশদের মধ্যে বিশ্বস্ততার সন্দেহ সৃষ্টি হলো। পরিণতিতে তাদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি ভয়ের সঞ্চার হলো। সুতরাং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বাসনা কুরাইশদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

এদিকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সাহায্য এসে গেল। এক রাতে কাফির-মুশরিক বাহিনীর উপর দিয়ে এমন এক প্রবল শৈত্যপ্রবাহ শুরু হলো যে, তাদের তাঁবুগুলো উপড়ে পড়তে লাগলো। রান্নার সরঞ্জামাদি উল্টে-পাল্টে পড়লো। এই করুণ অবস্থাদৃষ্টে আবু সুফিয়ান বললেন, হে কুরাইশগণ! এখন আর এখানে অবস্থান করার উপায় বাকী নেই। আমাদের খচ্চর ও ঘোড়াগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। বনী কুরাইজা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। খুব ভয়ঙ্কর এই প্রবল ঝড়-তুফানে যে কী বিরাট কিয়ামত কাণ্ড ঘটাচ্ছে তা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। আমাদের কোনো আশ্রয়স্থলই নিরাপদ ও অক্ষত নেই। এখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। আমি ফিরে যাবার ইচ্ছা করছি। আবু সুফিয়ান এটুকু বলে নিজের উটে আরোহণ করে যেতে লাগলেন। পুরো কুরাইশ বাহিনী তার অনুসরণ করতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায আদায় করছিলেন। মুসলমানদের গোয়েন্দা হুজাইফা ইবনে ইয়ামন রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে তাঁর নিকট সব সংবাদ দিলেন। সুতরাং খন্দক যুদ্ধের অবসান হলো। ভোর হতেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্য-সামন্তদের নিয়ে মদীনা মুনুওয়ারায় ফিরে আসলেন। পবিত্র কুরআনে করীমে খন্দকের ঘটনার বর্ণনা এসেছে এভাবে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝা বায়ু এবং

এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন" [সূরা আহযাব : ৯]। আরোও ইরশাদ হয়েছে:

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

"আল্লাহ্ পাক কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায় নি। যুদ্ধ করতে আল্লাহই মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী" [সূরা আহযাব : ২৫]।

খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মোট ৭ জন শহীদ হয়েছিলেন। অপরদিকে মুশরিকদের পক্ষে নিহত হয়েছিল ৪ জন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধের পর বলেছিলেন: এ বছরের পর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হবে না। বরং তোমরাই তাদের ওপর হামলা করবে।

খন্দকের যুদ্ধের পরই বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী ইয়াহুদী গোত্র বনী কুরাইজার বিরুদ্ধে অভিযান সংঘটিত হয়। তাদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক বিচারকার্যে মনোনীত হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত অনুযায়ী ছয় শত পুরুষ বন্দীদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। এই ইয়াহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে সফল অভিযান শেষে মদীনা শরীফ শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য তাদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হলো।

ষষ্ঠ হিজরি

এ বছরে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিশুপুত্র হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিআল্লাহু আনহু সে সময় মারা যান। মদীনা শরীফে গুজব উঠলো, এই মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের সম্পর্ক বিদ্যমান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে অবগত করলেন: তাঁর সন্তানের মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। সূর্যগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম। তোমরা বরং এ সময় নামায আদায় করবে। এই

নামাযকে বলে, সালাতুল কুসূফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায আদায় করেছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

এই হিজরির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি মক্কা শরীফে প্রবেশ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। এই সত্য স্বপ্নের কাল, মাস বা বছর নির্ধারিত ছিলো না। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এই স্বপ্ন শ্রবণে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠলেন। কারণ, তাঁরা নিশ্চিত জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নও ওহীর মতো মহাসত্য। দীর্ঘ ছয় বছর মুহাজিররা নিজ জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত। মক্কা শরীফের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও সম্মানবোধ অস্থিমজ্জায় জড়িত হয়ে আছে, সেখানে ফিরে যেতে তাই সবাই উদগ্রীব। নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যেয়ে পবিত্র বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করার সৌভাগ্য হয়তো অচিরেই পূর্ণ হবে এই ভেবে সকলেই অধীর অপেক্ষায় রইলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, এই বছরই পবিত্র উমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। সুতরাং হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। উমরার ইহরাম বেঁধে সবাই মক্কার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গতিরোধ করলেন। জানা গেল কুরাইশরা তাঁর আগমনে ভীষণ অস্থির ও ঘাবড়ে গেছে। তিনি হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দূত হিসাবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন, হে উসমান! তুমি তাদের গিয়ে বলো, আমরা যুদ্ধের জন্য আসি নি। আমরা উমরা পালনের নিয়তে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ইসলামের দাওয়াতও দেবে।

বাইআতে রিদ্বওয়ান

উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফিরে আসছিলেন না। তারপর সংবাদ পাওয়া গেল যে, কুরাইশরা তাঁকে শহীদ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে

সকলকে একত্রিত করে এই দুঃসংবাদ জানালেন। এরপর তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে সবাইকে বাইআত গ্রহণের আহ্বান করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বসা ছিলেন। তাঁর আহ্বানে ১৪০০ সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে আল্লাহর রাসূলকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বাইআতের জন্য সর্বপ্রথম হাত বাড়ালেন হযরত আবু সিনান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এরপর সকলেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিহাদের মাধ্যমে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করলেন। ইতিহাসে এই বাইআতই 'বাইআতে রিদ্বওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। এক মুনাফিক ছাড়া সকলেই বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উপস্থিত থাকলে তিনিও বাইআতে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র হাত মুবারক দেখিয়ে সবাইকে বললেন, এই হাত উসমানের। অর্থাৎ তাঁর উভয় হস্ত মুবারক একটা আরেকটার উপর রেখে হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে বাইআত করলেন।

বাইআতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা বেহেশতে প্রবেশ করবেন। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বাইআত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"মু'মিনগণ যখন বৃক্ষের নীচে আপনার হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করেছিল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের হৃদয়ে যা ছিলো সে ব্যাপারে তিনি অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করেছেন। এবং তাদেরকে দিলেন আসন্ন বিজয়" [সূরা ফাতাহ : ১৮]।

আরও ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ * فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ * وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"যারা তোমার হাতে বাইআত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বাইআত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে, তার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন" [সূরা ফাতাহ : ১০]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাইআত সম্পর্কে বলেন: "ইনশাআল্লাহ! এই বৃক্ষের নীচে যারা বাইআত করেছে, তাদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"। একথা শ্রবণে হযরত হাফসা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا

"তোমাদের প্রত্যেকেই এটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত" [১৯ : ৭১]।

এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা এটাও বলেছেন:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا

"অতঃপর আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো"।

বাইআত শেষ হওয়ার পর আসন্ন যুদ্ধের জন্য সকল প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এমন সময় সকলে দেখতে পেলেন হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা শরীফ থেকে ফিরে আসছেন। এতে অবশ্যই সবাই যারপরনেই আনন্দিত হলেন, তাঁদের উদ্বেগ ও অশান্তির

অবসান হলো। হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু জানালেন যে, কুরাইশরা একা উমরাহ করার জন্য তাঁকে বলেছিলো, তিনি তা অস্বীকার করেন। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আটক করে রেখেছিল। পরে তারা জানালো, মুসলমানরা মরণপণ জিহাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাই তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়।

এদিকে কুরাইশরা বুঝতে সক্ষম হলো যে, মুসলমানরা সত্যিই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেন নি- তাই তাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র সীমিত ছিলো। সবাই মিলে দুরভিসন্ধি করলো যে, এই সুযোগে মুসলমানদেরকে খতম করে দেওয়া যায়। তাই তারা একদল অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করলো। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলো মিরকায। তারা একটি গোপন পথে মুসলমানদের নিকটবর্তী হলো আকস্মিক আক্রমণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আসলে মুসলিম বাহিনী মোটেই অপ্রস্তুত ছিলো না- তারা পুরো কাফিলা পাহারার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একদল দক্ষ সৈন্য কুরাইশদের ঘিরে ফেলেন ও প্রায় সবাইকে বন্দী করতে সক্ষম হন। শুধুমাত্র সেনাপতি মিরকায পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের সকলকেই বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। তাঁর মহানুভবতা কুরাইশদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করলো।

সন্ধির প্রয়াস

কুরাইশরা শেষ পর্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব দিলো। তারা একে একে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে লাগলো। প্রথমে আসলো উরওয়া ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী। সে কিছু অসংযত উক্তি করেছিল বিধায় তার দ্বারা কোনো কাজ হলো না। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মুহাব্বাত লক্ষ্য করে সে অভিভূত হয়েছিল। সে মক্কা শরীফ ফিরে যেয়ে বললো, "আমি বড় বড় রাজা-বাদশাহদের দরবারে গিয়েছি। তাদের শান-শওকত দেখেছি কিন্তু আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের সাহাবীগণ তাঁকে যে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন তা বিশ্বজগতের কোথাও দেখি নি।"

এরপর প্রতিনিধি হিসাবে হুলায়াস ইবনে আলকামা, মিরকায ইবনে হাফস এবং সবশেষে সুহায়ল ইবনে আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির আলোচনা চূড়ান্ত করা ও চুক্তি সম্পাদনের জন্যই সুহায়ল দূত হিসাবে এসেছিলেন। যা হোক কুরাইশদের শর্তাবলীর অনুকূলে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হলো। ঐতিহাসিক এই সন্ধির ক'টি শর্ত ছিলো:

১. এ বছর মুসলমানগণ উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যাবেন।

২. আগামী বছর এই মুলতবী উমরা কাযা করতে পারবেন। তবে মাত্র তিনদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থানের অনুমতি পাবেন।

৩. কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া উমরা পালনের সময় আর কোনো অস্ত্র আনতে পারবেন না।

৪. মক্কায় অবস্থানরত কোনো মুসলমান মদীনায় চলে গেলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে। কিন্তু মদীনা হতে কেউ মক্কায় চলে আসলে তাকে মদীনায় ফেরৎ পাঠানো হবে না।

৫. এই সন্ধি দশ বছর বলবৎ থাকবে।

সুহাইল খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু চুক্তিপত্র লিখতে বসলেন। তিনি প্রথমেই লিখলেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুহাইল বাঁধা দিয়ে বললেন, থামুন! রাহমান ও রহীম কে তা আমরা জানি না। আমরা লিখে থাকি: باسمك اللّٰهم (হে আল্লাহ! তোমার নামে), সুতরাং তা-ই লিখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ঠিক আছে, এটাই লিখো। এরপর লিখা হলো:

هذا ما قضى عليه محمد رسول الله

"এটা সেই চুক্তিপত্র যার প্রতি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীকৃতি প্রদান করেছেন"। সুহাইল এবারও বাঁধা দিয়ে বললেন, থামুন! আমরা যদি মুহাম্মদকে [সা.] আল্লাহর রাসূল মেনে নিতাম তাহলে আপনাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন হতো কেন? বরং লিখুন: محمد بن عبد اللّٰه অর্থাৎ 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ'। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল। এরপরও

তুমি যা চাও তা-ই লিখা হবে। কিন্তু আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমি কিছুতেই 'رسول الله' শব্দটি কাটতে পারবো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। শব্দটি আমাকে দেখিয়ে দাও- আমিই তা কেটে দিচ্ছি। তিনি তা কেটে দেওয়ার পর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেই স্থানে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ' শব্দ ক'টি লিখে দিলেন।

বন্দী অবস্থায় আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর আগমন

চুক্তিপত্র তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। শৃঙ্খল বেষ্টিত অবস্থায় কুরাইশ দূত সুহাইলের পুত্র হযরত আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেথায় এসে উপস্থিত হলেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছিলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে আবদার করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে মদীনা শরীফ নিয়ে যান। চরম নির্যাতন থেকে রক্ষা করুন।

স্বীয় পুত্রকে দেখে সুহাইল এগিয়ে এসে আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর গালে একটি চপেটাঘাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে দাবী করলেন, চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী আমার পুত্রকে অবশ্যই আমার হাতে ফিরিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সুহাইল! এখনও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয় নি। অন্তত আমার খাতিরে আবূ জান্দালকে আমাদের সাথে যেতে দাও। কিন্তু সুহাইল কিছুতেই তা মানলেন না। সুতরাং অগত্যা আবূ জান্দালকে সুহাইলের নিকট ফেরৎ দিতে হলো। এদিকে চরম নির্যাতনের শিকার হযরত আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা এ কী করছো? এই যালিমদের হাতে আমাকে ফেরৎ দিচ্ছো। দয়া করে আমাকে রক্ষা করো! তাঁর এই আবদার শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন আবূ জান্দালের এই অবস্থা দেখে ক্ষোভে ও দুঃখে জ্বলছিলেন- কিন্তু মুখে কিছুই উচ্চারণ করলেন না। অবশেষে যখন আবূ

জান্দালকে মুশরিকরা টেনেহেঁচড়ে মক্কাভিমুখে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো তখন উমর ইবনে খাত্তাবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন: "হে আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধরো। এরা মুশরিক, তাদের রক্ত আল্লাহর নিকট কুকুরের রক্ততুল্য!"

শেষ পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করলেন। মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আওফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাহল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী। মুশরিক পক্ষে সাক্ষী হিসাবে ছিলেন: মিরকায ইবনে হাফস, হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উযযা প্রমুখ।

সন্ধির শর্তে হযরত উমরের প্রতিক্রিয়া

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী প্রায় সবগুলোই ছিলো মুশরিকদের পক্ষে। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সবাই দুঃখে ফেটে পড়ছিলেন কিন্তু মুখে কিছু উচ্চারণ করছিলেন না। তবে ভবিষ্যৎ খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: আপনি যে আল্লাহর রাসূল তা কি সত্য নয়? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি আল্লাহর রাসূল। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবার প্রশ্ন করলেন, আমরা যে পথে আছি তা কি ন্যায় ও সত্যের পথ নয়? আর কাফিরগণ যে পথে আছে তা কি অন্যায় ও অসত্যের পথ নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, নিশ্চয়। উমর আবার বললেন, তবে দীনের কাজে আমরা এতো দুর্বলতা দেখাই কেন? এতো অপমান কেন সহ্য করবো? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর প্রেরিত নবী। আল্লাহই আমার সাহায্যকারী। আমি কিছুতেই তাঁর আদেশ অমান্য করবো না। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কি বলেন নাই আমরা বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করবো? তিনি জবাব দিলেন, তবে এই বছরই তাওয়াফ করবো তা বলি নি। উমর, ধৈর্য ধরো। অচিরেই আমরা সকলে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবো।

হুদাইবিয়া থেকেই মুসলমানরা কুরবানী সেরে মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম থেকে মুক্ত হলেন। এরপর আরো তিনদিন হুদাইবিয়ায় অবস্থান করে কাফিলা মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। কাফিলার প্রায় সবাই দুঃখে জর্জরিত। তাঁদের ধারণা মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কুরাউল গামীম নামক স্থানে কাফিলা এসে পৌঁছার পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে হঠাৎ ওহী নাযিলের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হলো। তিনি একটু পরই বললেন, হে আমার সাহাবীগণ! তোমাদের রব অবতীর্ণ করেছেন:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

"নিশ্চয় আমি তোমাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়" [সূরা ফাতাহ : ১]

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিজয়ের ঘোষণা শ্রবণ করে বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, এটা কী বিজয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশান্ত স্বরে প্রফুল্লচিত্তে বললেন, হ্যাঁ, এটাই বিজয়। হযরত উমরের মনে সান্ত্বনা আসলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এই ঐতিহাসিক সন্ধিই মুসলমানদের জন্য চুড়ান্ত বিজয়ের কারণ হবে। আর তা-ই ছিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আবূ বাসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে আসেন। মুশরিকরা সাথে সাথে সন্ধির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরৎ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দুই ব্যক্তি পাঠিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে আবূ বাসিরকেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাতে তুলে দিলেন। আবূ বাসির বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে এসেছি। আপনি আমাকে আবার মুশরিকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এটা সন্ধির শর্ত। তুমি ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য কোনো পন্থা বের করে দেবেন।"

মক্কার দু'জন দেহরক্ষী আবূ বাসিরকে নিয়ে রওয়ানা দিলো। রাস্তায় তিনি একজন দেহরক্ষীর তরবারির প্রশংসা শুরু করলেন। রক্ষী এতে নিজেকে বড়ো ও গৌরবান্বিত মনে করলো। সে এক পর্যায়ে তার ঐ তরবারি হযরত আবূ বাসিরের হাতে তুলে দিল। বললো, "আমি এটা অনেক লোকের উপর ব্যবহার করেছি!" তরবারি হাতে নিয়ে আবূ বাসির তাকে খতম করে দিলেন। ওপর রক্ষী এই দৃশ্য দেখে জীবন নিয়ে পালালো।

আবূ বাসির আবার মদীনা শরীফ ফিরে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন। তিনি আবদার করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। এখন আমাকে এখানে থাকতে দিন।" কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, এই ঘটনার ফলে যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা আছে। আবূ বাসির ব্যাপারটি বুঝতে পেরে মদীনা শরীফ থেকে চলে গিয়ে সাগর সৈকতে একটি স্থানে বসবাস শুরু করলেন।

এদিকে হুদাইবিয়া থেকে ফেরৎ যাওয়া সাহাবী আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছুদিনের মধ্যেই আবার পালিয়ে আসলেন। তিনি সমুদ্র সৈকতে লুকিয়ে থাকা আবূ বাসিরের সঙ্গে যোগ দিলেন। ধীরে ধীরে মক্কা শরীফ থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানরা এখানে এসে একটি বসতি গড়ে তুললেন। অতি শীঘ্রই বেশ বড়ো একটি উপনিবেশ গড়ে উঠলো। তবে মরুভূমির উপর তাঁদের জীবন ছিলো অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং জীবনরক্ষার্থে তারা কাফির-মুশরিকদের বাণিজ্য কাফিলার উপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন। মক্কা শরীফ থেকে যেসব কাফিলা এদিকে যাতায়াত করতো তারা এদের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে সবকিছু লুটপাট করে নিতেন। তাদের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচার কোনো উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা মদীনা শরীফ দূত পাঠিয়ে সন্ধির এই শর্ত বাতিল করার প্রস্তাব দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পত্রযোগে এই সংবাদ আবূ বাসিরের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তখন অন্তিম শয্যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রখানা হাতে রেখে তিনি ইন্তেকাল করেন। সমুদ্র সৈকতে গড়ে ওঠা মুসলিম উপনিবেশের সবাই মদীনা মুনুওয়ারায় চলে আসলেন- সে সাথে পরবর্তীতে মক্কা শরীফ থেকে হিজরতকারীরাও বিনা বাধায় আসতে শুরু করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির কিছুদিন পরই প্রখ্যাত মুসলিম সেনানায়ক হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা মদীনা মুনুওয়ারায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত খালিদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাইফুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর তরবারি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর হাতে সিরিয়া এবং হযরত আমর ইবনে আস এর হাতে মিশর বিজিত হয়েছিল।

সপ্তম হিজরি

এই হিজরিতেই প্রখ্যাত খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কৃত ইয়াহুদীরা এখানে বসবাস শুরু করে। এরপর তারা প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুতরাং এদের দমন-কল্পে হুদাইবিয়ার সন্ধি সমাপ্ত করে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তনের মাত্র এক মাসের ভেতর ১৫০০ মুজাহিদের এক বাহিনী গঠন করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর নির্দেশ মুতাবিক এই যুদ্ধে বাইআতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবারাই শুধু যেতে পেরেছিলেন।

মদীনা শরীফ থেকে খায়বারের দূরত্ব ১২৫ মাইল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মুহাররমের ২০/২১ তারিখ খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধ ছিলো দুর্গ কেন্দ্রিক। সর্বমোট ৬টি মতান্তরে ১০টি দুর্গে ইয়াহুদীরা বাস করতো। মুসলমানরা একটার পর আরেকটা দুর্গ দখল করে নেন। সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত দুর্গের নাম ছিলো কামূস। এটি বার বার আক্রমণ করেও মুসলমানরা দখল করতে ব্যর্থ হন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ এবং রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। এই দুর্গ বিজয়ের গৌরব তাকেই আল্লাহ তা'আলা দান করবেন।

সাহাবীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে উঠলো। সবার ভাবনা, কার ভাগ্যে দুর্গ বিজয়ের গৌরব নিহিত আছে। সবাই ভোরে ওঠে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নিকট গমন করলেন। কিন্তু আসলেন না শুধু আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায়? একজন বললেন, চোখ-ওঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করছেন তিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে আনতে বললেন। তিনি আসার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুখ-নিঃসৃত লালা আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দু'আ করলেন। সুবহানাল্লাহ! সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলীর চোখ ভালো হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শের-ই-খোদা হযরত আলীর হাতে ঝাণ্ডা প্রদান করে বললেন, "যাও! যুদ্ধ করো যতক্ষণ না বিজয় নিশ্চিত হয়। এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করো না।" অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রথমে শত্রুদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কথাও বলেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঢাল মাটিতে পড়ে যায় এবং এক ইয়াহুদী তা নিয়ে পলায়ন করে। এসময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মধ্যে এমন রূহানী শক্তির সঞ্চার হলো যে, দুর্গের ভারী লৌহ নির্মিত দরজা উপড়িয়ে তা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। যুদ্ধ শেষে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এই দরজা ছুড়ে মারলেন। এরপর দেখা গেলো আট জন শক্তিশালী ব্যক্তি একত্রে মিলেও এই দরজাটি ওঠাতে পারছেন না!

দুর্গ বিজিত হলো। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফিরে আসলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শের-ই-খোদা আলীকে চুম্বন করলেন। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "এ কিসের ক্রন্দন, দুঃখের না আনন্দের?" তিনি জবাব দিলেন, আনন্দের।

এ বছরের অন্যান্য ঘটনা হলো: খায়বারে ধৃতা হযরত সাফিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সাথে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ সম্পন্ন হওয়া; মু'তআ বা অস্থায়ী বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ; মুসলমানদের জন্য গৃহপালিত গাধা ও শিকারী জন্তুর মাংস হারাম হওয়া;

এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মাতা হযরত উম্মে রুমান রাদ্বিআল্লাহু আনহার মৃত্যুবরণ ছিলো এ হিজরির বিশেষ ক'টি ঘটনা।

উমরাতুল কাযা

এ বছরের যুল-কা'দা মাসে সন্ধির শর্তানুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলতবী উমরার কাযা আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত সকল সাহাবাসহ আরো অন্যান্য আনসার-মুহাজির এই উমরা পালনে শরীক হলেন। এতোদিন পরে মুহাজিররা তাঁদের জন্মভূমিতে ফিরে যাবেন- আনন্দের বন্যা সর্বত্র বইতে লাগলো। দুই হাজার সাহাবীর এক বিরাট কাফিলাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী শুধুমাত্র কোষবিদ্ধ তরবারি ছাড়া আর কোন অস্ত্র কেউই সাথে নিলেন না। তবে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০০ বীর সাহাবীকে যুদ্ধরক্ষী হিসাবে অস্ত্রশস্ত্রসহ আগেই পাঠিয়ে দিলেন। তবে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন যে, তারা যেনো মক্কা শরীফের হারাম সীমানার ভেতরে না ঢুকেন। এই বাহিনী নির্দেশ মুতাবিক 'মাররায যাহরান' নামক উপত্যকার ইয়াজাজ এলাকায় যেয়ে শিবির স্থাপন করে। কুরাইশরা এদের খবর পেয়ে ঘাবড়ে যায়। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে নিশ্চিত হলো যে, তিনি যুদ্ধের জন্য আসেন নি। সন্ধির শর্ত পুরোপুরিভাবে পালিত হবে।

মক্কা শরীফের দৃশ্য এক আশ্চর্য চিত্র ধারণ করলো। কুরাইশদের অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে পাহাড়-পর্বতের উপর আশ্রয় নিলো। তাদের শঙ্কা ছিলো, নগর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এসব মুসলমানরা হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। অপরদিকে অনেকেই আবার দারুন-নাদওয়ার সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের কর্মকা- অবলোকন করতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিক দিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করলেন। পবিত্র বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হতেই তিনি আবেগভরা কণ্ঠে তালবিয়ার আওয়াজ তুললেন:

لبيك اللّٰهم لبيك * لبيك لاشريك لك لبيك * ان الحمد والنعمة **لك والملك** * **لاشريك لك** *

"হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির। তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, প্রভু হে! আমি হাজির। সকল প্রশংসার যোগ্য তুমিই, সকল দান-অনুদান তোমারই আজ্ঞাধীন। রাজত্ব তোমারই কর্তৃত্বাধীন, তোমার কোন শরীক নাই।"

এই অপূর্ব তালবিয়ার ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হলো সাহাবাদের হাজারো কণ্ঠ, মুখরিত হয়ে ওঠলো মক্কা শরীফের আকাশ-বাতাস। কাফির-মুশরিকরা তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলো পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবের এই কাফিলার হৃদয় নিংড়ানো কর্মকা-। মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের কী অপূর্ব বহিঃপ্রকাশ। মালিকের দরবারে বান্দার আনুগত্যের কী সুন্দর নমুনা!

সন্ধির শর্তানুযায়ী মুসলমানগণ তিনদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থান করলেন। ইতোমধ্যে সাহাবায়ে কিরাম প্রিয় জন্মভূমি ঘুরে দেখতে লাগলেন। ফেলে যাওয়া বাড়িঘর ও ভিটা দেখে আবেগ-আপ্লুত হলেন- অনেকের চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। স্বাধীনভাবে চলতে কেউ কোনো বাধাও দেয় নি। তিনদিন পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে কাফিলাসহ যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হলো। মদীনা শরীফ যাওয়ার পথে 'সরিফ' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি হয়। এখানেই হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাত্রিযাপন করেন। আর এই স্থানেই উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হিজরি ৬৩ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর এখানেই বিদ্যমান।

আমীর-উমারা ও শাসকবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

ষষ্ঠ হিজরির শেষ ভাগ থেকে সপ্তম হিজরির প্রথম ভাগের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রযোগে আরব উপদ্বীপ ও চতুর্দিকের অঞ্চলসমূহের আমীর-উমারা

ও শাসকবর্গের নিকট দূত মারফত ইসলামের দাওয়াত দেন। যেসব সম্রাট ও বাদশাহদের নিকট পত্র দেওয়া হয়েছিলো তাদের মধ্যে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী এবং মিসরের বাদশাহ মুকাওকিয়াস প্রমুখের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এসব পত্রের মধ্যে দাওয়াতের নমুনা ছিলো এরূপ: " .... আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম কবুল করুন, শান্তি পাবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন ... "।

অষ্টম হিজরি

এই হিজরিতেই মূ'তার যুদ্ধ ও মক্কা-বিজয় সংঘটিত হয়। মূ'তার যুদ্ধে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যবাহিনী সর্বপ্রথম এক বিরাট রোমান ফৌজের মুখোমুখি হয়। আর মক্কা-বিজয় ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কুরাইশ মুশরিকদের বিরুদ্ধে স্থায়ী ও চূড়ান্ত বিজয়। আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উভয় ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরছি।

গাযওয়া মূ'তা

মূ'তা সিরিয়া অঞ্চলের একটি জনপদের নাম। মদীনা শরীফ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১১০০ কিলোমিটার। অঞ্চলটি ছিলো রোম সাম্রাজ্যের অধীনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিস ইবনে উমায়ার আল-আযাদী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পত্রসহ দূত হিসাবে বুসরা শহরের শাসনকর্তা শুরাহবীল ইবনে আমর আল-গাসসানীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু দুষ্ট শুরাহবীল তাঁকে বন্দী করে শহীদ করে দেয়। দূত হত্যা সে যুগেও ভীষণ অন্যায় কাজ হিসাবে বিবেচিত হতো। এই করুণ সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। শুরাহবীল দূত হত্যার মতো অমার্জনীয় অন্যায়ই শুধু করে নি- সে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করলো। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণ এবং হুমকি থেকে মদীনাকে রক্ষার্থে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মূ'তা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

এই অভিযান অষ্টম হিজরির জুমাদাল ঊলা মাসে হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানের

পূর্বে মোট তিনজন সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই তিনজনই যে যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাবেন সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, "যদি যায়িদ নিহত হন তাহলে সেনাপতি হবেন জাফর ইবনে আবি তালিব, তিনিও যদি নিহত হন তাহলে সেনাপতি হবেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। আর তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে তোমরা কাউকে সেনাপতি হিসাবে নির্বাচিত করবে।"

মূ'তা অভিযানে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা রোমানদের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ছিলো। মুসলমানদের তিন হাজার সৈন্যের বিপরীতে দুশমন বাহিনীর সংখ্যা ছিলো লক্ষাধিক। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেনাপতি যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে পতাকা ছিলো। তিনি প্রচণ্ড বেগে শত্রুদের উপর তরবারির আঘাত হানতে লাগলেন। এক পর্যায়ে শত্রুর বল্লমের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল- তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। পতাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত মুতাবিক জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু উত্তোলন করলেন। ব্যাপক যুদ্ধ শেষে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "হযরত জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শরীরের সম্মুখদিকে বর্শা ও তরবারির নব্বুই ঊর্ধ্ব আঘাতের দাগ ছিলো।" তিনি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর দ্বীনের পতাকা নির্দেশ মুতাবিক হাতে তুলে নিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি তুমুল যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন।

এরপর পতাকা হাতে নিয়ে সাবিত ইবনে আকরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু চিৎকার দিলেন: হে মুসলমানগণ! তোমরা পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে নতুন সেনাপতি নির্বাচন করো। সবাই সর্বসম্মতভাবে মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। নির্বাচিত হওয়ার পর যুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কৌশলে মুসলিম বাহিনীকে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন। অপরদিকে শত্রু বাহিনী উত্তর দিকে চলে গেল। ইতোমধ্যে রাতের আঁধারে সমগ্র অঞ্চল ঢেকে গেলো। অন্ধকারের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা সমীচিন মনে না করে উভয় পক্ষই আপাতত থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

পরদিন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক সুকৌশল অবলম্বন করে শত্রুদেরকে পরাজিত করে দিলেন। তিনি পুরো মুসলিম বাহিনীকে এমন এক উপায়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন যে, অপরদিক থেকে মনে হচ্ছিল এক বিরাট বাহিনী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সবাই মিলে এমন উচ্চস্বরে 'আল্লা-হু আকবার!' ধ্বনি তুললেন যে, রোমান বাহিনী মনে করলো মদীনা শরীফ থেকে বুঝি সাহায্যকারী বিরাট বাহিনী এসে যোগ দিয়েছে। শত্রুদলে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা আর যুদ্ধ পরিচালনা উচিত হবে না ভেবে ময়দান থেকে চলে গেল। সুতরাং মাত্র ৩০০০ সৈন্যের এই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে এভাবে আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রদান করলেন। সুবহানাল্লাহ!

এই যুদ্ধের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদূর মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে বসে অবস্থার বর্ণনা দিয়ে যান। বুখারী শরীফসহ সহীহ রিওয়ায়েতে তাঁর এই মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তিনজন সেনাপতির শাহাদাতবরণের সংবাদ তিনি সাহাবায়ে কিরামকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এখন যায়িদ পতাকা হাতে নিল, সে শহীদ হলো। জা'ফর পতাকা হাতে নিয়েছে, সেও শহীদ হলো। এবার ইবনে রাওয়াহার হাতে পতাকা আছে, সেও শাহাদাতবরণ করেছে (এসব বলার সময় পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো)।" তিনি আরো বললেন, "আল্লাহর তরবারির মধ্যে একটি তরবারির (অর্থাৎ সাইফুল্লাহর - খালিদ ইবনে ওয়ালিদ) হাতে এখন পতাকা আছে- আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন।"

মূ'তা যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে শহীদ হয়েছিলেন মাত্র ১২ জন। অপরদিকে শত্রুপক্ষের অনেক সৈন্য প্রাণ হারায়। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে মোট নয়টি তরবারি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এছাড়া যায়িদ, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমও যে অসংখ্য শত্রুসৈন্যদের কতল করে শাহাদাতবরণ করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিলো যে, আরবের যে কোনো গোত্র স্বাধীনভাবে মুসলমান অথবা কুরাইশদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে এবং এতে কোনো পক্ষ বাঁধা দেবে না। এই শর্তানুযায়ী দু'টি পরস্পর শত্রুতা বিদ্বেষকারী গোত্রের একটি মুসলমানদের সঙ্গে এবং অপরটি মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেছিল। মক্কার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল বনী বাকর আর মুসলমানদের সাথে চুক্তি করেছিল বনী খুযা'আ। মক্কার নিকটেই বসবাসকারী বনী খুযা'আ ও মুসলমানদের মধ্যে এই মিত্রতা কুরাইশদের সহ্য হলো না। সুতরাং তারা চিরদুশমন এই গোত্রকে বনী বাকর কর্তৃক আক্রমণে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহায্য-সহযোগিতা, অস্ত্রশস্ত্র প্রদান এমনকি ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, সুহাইল ইবনে আমর প্রমুখ কুরাইশ জওয়ানরা ছদ্মবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিয়ে বনী খুযা'আর বিরুদ্ধে তরবারি চালনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করলো না। বনী খুযা'আ অতর্কিত হামলায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তারা ভয়ে প্রাণ-রক্ষার্থে বাইতুল্লাহ শরীফে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পৌত্তলিকরাও হারাম শরীফের ভেতর হত্যাকাণ্ড ঘটাতে ভয় করতো- কিন্তু বনী বাকার গোত্রের সর্দার নাওফাল বললো, "এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাবো না- কা'বাগৃহের মর্যাদা ভুলে যাও! সবাইকে হত্যা করো"। কুরাইশগণ হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত প্রকাশ্যে ভঙ্গ করে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সদলবলে যোগ দিল।

এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই খুযাঈরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সকল ঘটনা বর্ণনা করে সাহায্যের প্রার্থনা করলো। তিনি বিবেচনা করে দেখলেন, সন্ধির শর্তানুসারে এখন খুযাঈদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মম এই অত্যাচারের ঘটনা শ্রবণে তিনি খুব মর্মাহত হলেন। কুরাইশরা যে সন্ধি ভঙ্গের নিমিত্তে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা বুঝতে বাকী রইলো না। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে না যেয়ে প্রথমে দূত মারফত নিম্নোক্ত প্রস্তাবাদি পেশ করলেন:

ক. বনী খুযা'আকে তোমরা উপযুক্ত রক্তপণ দিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিকার করো;

খ. কিংবা বনী বাকরের সাথে সকল সম্বন্ধ বাতিল করো;

গ. অথবা হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল হয়েছে বলে ঘোষণা দাও।

কুরাইশগণ আগে থেকেই হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাই তারা দূতকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে, শেষোক্ত শর্তই আমরা মেনে নিলাম। সুতরাং কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে বাতিল করে দিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল বিলম্ব না করে মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে বাতিল করে যে বিরাট ভুল করা হয়েছে কুরাইশরা তা অচিরেই উপলব্ধি করলো। মুসলমানদের আক্রমণের মুখে তাদের টিকে থাকা আর সম্ভব হবে না। সুতরাং তাদের নেতা আবু সুফিয়ান দূত হিসাবে মদীনা শরীফ এসে সন্ধি পুনর্বহালের চেষ্টা চালালেন। মদীনা শরীফ এসে আবু সুফিয়ান স্বীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করলেন। পিতাকে দেখে তিনি তড়িঘড়ি করে বিছানা তুলে ফেললেন। আবু সুফিয়ান এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি বিছানা গুটিয়ে রাখলে কেন?"। উম্মে হাবীবা জবাব দিলেন, "আপনি অপবিত্র! কাফির! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিছানায় বসার উপযুক্ত আপনি নন!" আবু সুফিয়ানের মনে এ কথাগুলো বিরাট প্রভাব ফেললো। তিনি স্বভাবতই মনোক্ষুণ্ন হয়ে বের হয়ে গেলেন। মসজিদে নববীতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ধি পুনর্বহালের প্রস্তাব দিলেন।

তার এই প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মঞ্জুর হলো না। অনেক চেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়ে মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে আবু সুফিয়ান নিজেই ঘোষণা করলেন, 'হে মদীনাবাসীগণ! শুনো, আমি হুদাইবিয়ার সন্ধিকে পুনঃবলবৎ ও সুদৃঢ় করে গেলাম।' এরপর তিনি মদীনা থেকে প্রস্থান করলেন।

আবু সুফিয়ানের ব্যর্থতা হেতু কুরাইশরা অন্তঃসারশূন্য অবস্থায় পতিত হলো। তারা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চরমভাবে পরাজিত হবে তা তারা জানতো। সুতরাং আসন্ন বিপদের কথা ভেবে তারা ভীষণ ভয় ও শঙ্কার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলো।

মক্কা যাত্রা

পবিত্র রমজান মাসের ১০ তারিখ, অষ্টম হিজরি মুতাবিক ১লা জানুয়ারী ৬৩০ ঈসায়ী সালে মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে দশ হাজার মুজাহিদের এক বিশাল বাহিনীসহ রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

তকদির খুললো ইসলামের চরম দুশমন আবু সুফিয়ানের

মারউ'জ যাহরান উপত্যকায় পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাউনি ফেললেন। দশ হাজার সৈন্যের এই বিরাট বাহিনী পুরো বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী তাঁবু টাঙ্গিয়ে রাতের বেলা সর্বত্র বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। মক্কা শহর থেকে অদূরে অবস্থানরত এই সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারা আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনে হিযাম ও বুদায়াল ইবনে ওয়ারাকাকে তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করলো। কিন্তু ছাউনির নিকটে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পাহারারত একদল মুসলিম বাহিনীর হাতে আবু সুফিয়ান বন্দী হলেন। তাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলো। সবাই অপেক্ষা করছিলেন ইসলামের এই চরম দুশমনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ উপায়ে হত্যার নির্দেশ দেবেন সেটা শ্রবণ করতে। কিন্তু দয়ার সাগর পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন: "হে আবু সুফিয়ান! তোমার মঙ্গল হোক। এখনও কি সময় আসে নি যে, তুমি এক আল্লাহর উপর ঈমান আনবে যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই?"

হযরত উমরসহ উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। আবু সুফিয়ানের মনে নবীজীর এই করুণা-ভরা দাওয়াত রেখাপাত করলো। তিনি যে ধীরে ধীরে সত্যধর্ম ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছিলেন তা নিজেই বুঝতে পারেন নি। আল্লাহ পাক তাঁর উপর দয়ার দৃষ্টি দিয়েছিলেন- আর তা অবশ্যই স্বীয় প্রিয় হাবীবের ওয়াসিলায় হয়েছিল। আবু সুফিয়ান জবাব দিলেন: "আপনার জন্য আমার মাতাপিতা কুরবান হোক! আপনি মহান, দয়ালু ও ধৈর্যশীল আর আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আল্লাহর

কসম! আমি বুঝতে পারছি, যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ থাকতো তাহলে আজ আমার অবশ্যই কোনো উপকারে আসতো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে আবার বললেন: "হে আবু সুফিয়ান! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উপলব্ধির ক্ষমতা দান করুন। তুমি এখনও একথা স্বীকার করবে না যে, আমি আল্লাহর রাসূল?"

কিন্তু আবু সুফিয়ান নির্ভীকভাবে উত্তর করলেন: "আমি এখনও সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হতে পানি নি!" একথা শ্রবণ করে হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: "আর কেনো বিলম্ব করছো আবু সুফিয়ান! ইসলাম কবুল করো!" এবার আবু সুফিয়ানের মনে সত্যের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠলো। তার তকদির খুলে গেল। দৃঢ়কণ্ঠে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করলেন: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী অপরিসীম করুণা! যে ব্যক্তি ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই চরম দুশমন হিসাবে কুরাইশদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন আজ তিনিও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আত্মসমর্পণ করলেন- তিনিও এখন থেকে সাহাবা হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত হয়ে গেলেন। মাত্র ক'দিনের মধ্যেই আবু সুফিয়ান একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ইসলামের জন্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করে একটি চক্ষু বিসর্জন দিয়েছিলেন। তায়েফ অভিযানে এই চক্ষু আহত হয় এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই আবু সুফিয়ানের সন্তান প্রখ্যাত সাহাবী ও সমরনায়ক হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু উমাইয়্যা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দিলেন, কেউ যদি স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীকে বাধা না দেয় তাহলে কোন রক্তপাত হবে না। আবু সুফিয়ানের ঘর নিরাপদ থাকবে। আবু সুফিয়ান ফিরে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আর কারোর নেই। কেউ যেনো ভুলেও আক্রমণ না করে। এই সংবাদে সবাই ভীতসন্ত্রস্ত

হয়ে যে যেখানে পারে পালালো। অনেকে পাহাড়ের উপর, নিজের গৃহে এবং আবু সুফিয়ানের ঘরে আত্মগোপন করলো। মহান আল্লাহর অসীম করুণায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা বাধায় পবিত্র মক্কা নগরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। তবে তাঁর পবিত্র মস্তক মাটির দিকে অবনমিত ছিলো। উটের মধ্যে সাথে নিলেন প্রিয় পালকপুত্র মু'তা অভিযানে শাহাদাতবরণকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যায়িদ বিন হারিসার পুত্র হযরত উসামা বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে। চারদিক থেকে দশ হাজার মুসলিম সৈন্য মক্কা শরীফ প্রবেশ করলেন| হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে যে সেনাদল অগ্রসর হয়েছিল তাদেরকে কয়েকজন দুর্দান্ত কুরাইশ জওয়ান আক্রমণ করায় সামান্য যুদ্ধ বাঁধলো। এতে ১২ জন শত্রুসৈন্য নিহত ও ২ জন মুসলমান জিহাদী শাহাদতবরণ করেন। মক্কা বিজয় এভাবে প্রায় রক্তপাতহীনভাবে সুসম্পন্ন হলো। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরক্ষণে নাজিলকৃত আল্লাহ বাণী:
"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا" - সফল হলো। কুরাইশদের উপর মুসলমানদের চুড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত হলো।

পবিত্রভূমি মূর্তিমুক্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কা'বাগৃহের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে হাজারে আসওয়াদে চুমো খেলেন। তারপর কা'বাগৃহের চতুর্দিকে ও ভেতরে অবস্থিত ৩৬০টি মূর্তির সম্মুখে যেয়ে একে একে সবগুলো স্বীয় যষ্টি উত্তোলন করে পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত পাঠ করতে করতে ভেঙ্গে ফেললেন।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"এবং বলো, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, আর নিশ্চয়ই মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী" [সূরা ইসরা : ৮১]।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দু'টি প্রাচীন মূর্তি ছিল। এদের নাম ছিলো যথাক্রমে 'ইসাফ' ও 'নায়িলা'। কুরাইশরা বিশ্বাস করতো যে, ইসাফ ছিলো পুরুষ ও নায়িলা ছিলো নারী। একদা

এরা হারাম শরীফের ভেতর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা এদেরকে পাথরে পরিণত করেছেন। কিন্তু এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে কুরাইশরা দেবতা মনে করে উপাসনা করতো। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে সেদিন এ দু'টোকে ভেঙ্গে চুরমার করা হলো। কাবা শরীফসহ পুরো হারাম এলাকা মূর্তিমুক্ত হলো।

মক্কা শহরের আশপাশ এলাকায় লাত, উযজা, মানাত, সুওয়া ইত্যাদি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন।

বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কণ্ঠে আযান

যুহরের নামাযের সময় ঘনিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু উচ্চস্বরে আযান দিলেন। কুরাইশ নেতাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, আত্তাব ও হারিস এই আযান ধ্বনিতে পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করলেন। তারা একেকজন একেকটি মন্তব্য করলেন। আত্তাব বললেন, আমার পিতার ভাগ্য ভালো তাই এই আযান ধ্বনি শ্রবণের পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন! হারিস বললেন, ইসলামের সত্যতা এখনও উপলব্ধি করতে পরি নি- যদি পারতাম তবে এই ধ্বনি শিরোধার্য করে নিতাম। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান। তাই তার মন্তব্য ছিলো ভিন্ন। তিনি বললেন, "আমি কিছু বলবো না। আমাদের নিকটতম কঙ্করগুলো যেয়ে রাসূলুল্লাহর নিকট তা জানিয়ে দেবে!" তার এই উক্তি সঠিক ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কথা জানতে পেরেছিলেন, তবে কঙ্করের মাধ্যমে নয়- স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়েছিলেন। তিনি ওসব নেতাদেরকে বললেন, তোমাদের সকল কথা আমার জানা হয়ে গেছে। এরপর তিনি হুবহু সকল মন্তব্যগুলো বলে দিলেন। এতদশ্রবণে হারিস ও আত্তাব কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তারা বললেন, আমাদের কথাগুলো কেউই শোনতে পায় নি- একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এই সংবাদ আপনাকে জানিয়েছেন। আপনি যে আল্লাহর প্রেরিত নবী তাতে আমাদের আর একবিন্দুও সন্দেহ নাই।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের ইসলাম গ্রহণ

উহুদ যুদ্ধে এই হিন্দই বদর যুদ্ধে নিহত তার পিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যেয়ে হযরত আমীর হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে কতল করিয়েছিলন এবং তাঁর লাশ কেটে কলিজা বের করে চিবিয়েছিলেন। এই দুর্দান্ত নারীও পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করুণা থেকে বঞ্চিত হলন না। তিনিও ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে নবীজীর দরবারে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতে পেরেছিলেন। হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মক্কা বিজয়ের পর প্রায় সকলকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তবে গুরুতর অপরাধী চারজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে তিনি ক্ষমা দেন নি। ক্ষমার অযোগ্য এরা হলো: ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, মিকইয়াস ইবনে সাবাবা, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আবী সারাহ এবং মিকইয়াসের দু'জন গায়িকা। এদের মধ্যে ইকরিমা ইয়ামনে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইকরিমার পিতা আবু জাহল ইসলামের চরম দুশমন ছিলেন। লোকেরা স্বীয় পিতাকে প্রকাশ্যে গালি দিতে দেখে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, "আমার সামনে যখন মানুষ পিতাকে গালি দেয় তখন আমার ভীষণ লজ্জা হয়"। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বললেন, "মৃত ব্যক্তিগণ তাদের কর্মফল ভোগ করছে- তাদের গালি দেওয়া ঠিক নয়। মৃতদের জীবনের মন্দ দিক ভুলে শুধু তাদের উত্তম দিক নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ"।

হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ওয়াহশীও পেয়ারে নবীজীর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হলেন না। ওয়াহশী ইসলাম কবুল করলেন। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলে দিলেন, "তুমি আর কখনও আমার সম্মুখে এসো না"। ওয়াহশী সাহাবা ছিলেন- কারণ তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। সাহাবা হওয়ার শর্ত তিনি পালন করেছেন। ওয়াহশী হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হন্তা হিসাবে বেঁচে থেকে ভীষণ অনুতপ্ত বোধ করতেন। তিনি সে-ই

বর্শা দিয়েই আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধের সময় নুবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামা কাজ্জাবকে হত্যা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর সেখানে মোট পনের দিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সাহাবায়ে কিরামকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে ইসলাম প্রচারের জন্য মক্কা শরীফের আশপাশ অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন।

হুনায়নের যুদ্ধ

অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর যে ক'দিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন এর মধ্যেই এই যুদ্ধ বাধে। আরাফাতের ময়দান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে ঘন খেজুর বৃক্ষবিশিষ্ট একটি উপত্যকার নাম হুনায়ন। এখানে হাওয়াযিন ও ছাকীফ নামক দু'টি গোত্র বসবাস করতো। সংখ্যাবহুল, যুদ্ধবাজ, শক্তিশালী এই গোত্রদ্বয় ইসলামের চরম দুশমন ছিলো। ইসলামের ছায়াতলে দলে দলে লোকজন যোগদান করছে দেখে এদের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলো। সুতরাং তারা মক্কা শরীফে অবস্থানরত মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করে।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মোট ১২ হাজার মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেক নওমুসলিম ছিলেন। যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিলেন। মুশরিকদের অতর্কিত হামলায় তারা চতুর্দিকে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র ২০০ সাহাবীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ় থেকে তরবারি চালনা অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে তিনি চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন: "হে লোকসকল! তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আমার দিকে এসো! আমি আল্লাহর রাসূল, আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ!"

তুমুল যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে সাহায্য চেয়ে দু'আ করলেন। শীঘ্রই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সাহায্য আসলো। তিনি ফিরিশতা পাঠিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়ে মুসলিম বাহিনীকে নিশ্চিত বিজয় দান করলেন।

এছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে কাফিরদের উপর ছুড়ে মারলেন। এতে তারা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কাফিররা সাথে নিয়ে আসা তাদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, বিষয়-সম্পদ ও গবাদি পশু পেছনে রেখে পলায়ন করলো। হুনায়নের যুদ্ধে যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"আল্লাহ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে, এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিন, যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিলো সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসে নি। বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলো। অতঃপর আল্লাহ নিজ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাও নি এবং তিনি কাফিদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন। এটাই কাফিরদের কর্মফল" [তাওবাহ : ২৫-২৬]।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন হযরত হালীমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কন্যা শায়মা বিনতে হারিছও ছিলেন। প্রথমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতে পারেন নি। শায়মা বললেন, "আপনি আমার পিঠে একদা কামড় দিয়েছিলেন- এই দাগটি এখনও আছে।" একথা শ্রবণ করে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এই মহিলাটিই তাঁর দুধবোন। তিনি তাঁকে সম্মানের সাথে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। শিশুকালের কথা স্মরণ হতেই তাঁর পবিত্র চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো। শায়মা ইসলাম কবুল করলেন এবং স্বীয় ইচ্ছায় নিজের গোত্রের নিকট চলে গেলেন।

হওয়াযীন ও ছাকীফ গোত্রের একটি দল হুনায়নের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে তায়েফ এসে অবস্থান নেয়। এই দলে তাদের নেতা মালিক ইবনে আওফও ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং একটি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তায়েফ এসে হাজির হন। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। শত্রুরা এক বছরের রসদপত্রসহ দুর্গের ভেতর অবস্থান নেয়। মুসলিম বাহিনী দুর্গের নিকটবর্তী হতেই শত্রুরা অজস্র তীর

নিক্ষেপ করা শুরু করলো- এতে অনেকেই আহত হলেন এবং শাহাদাতবরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু দূরে সরে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবরোধ তুলে নিলেন। ছাকীফ গোত্রের জন্য তিনি হিদায়াত চেয়ে দু'আ করলেন। এই দু'আ আল্লাহর দরবারে দ্রুত কবুল হয়েছিল। তায়েফ অভিযানে মোট বারোজন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন।

যুদ্ধের পর কাফির বাহিনীর সর্দার মালিক ইবনে আওফসহ উভয় গোত্রের প্রায় সকলেই রাসূলুল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। হুনায়নের নিকট জি'রানায় তিনি অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে ইহরাম বেধে মক্কা শরীফ প্রবেশ করে উমরা পালন করলেন। এরপর জি'রানায় ফিরে এসে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

নবম হিজরি: তাবুক অভিযান

তাবুক মদীনা শরীফ থেকে সাত শত কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। মদীনার মুনাফিকরা মসজিদে দিরার নামে পরিচিত একটি নামেমাত্র মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে বসে কুপরামর্শ করতো। এটা ছিলো তাদের চক্রান্তের আস্তানা। তারা রোমান সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য পরামর্শ দিতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপন সূত্রে জানতে পারলেন রোমান সম্রাট যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে মদীনা শরীফে বসে সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার চিন্তা বাদ দিয়ে বরং তাবুকের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনীসহ যাত্রার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ দুশমনদেরকে সীমান্তে প্রতিরোধ করাই হলো উত্তম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে ত্রিশ হাজার মুজাহিদের এক বিরাট কাফিলা প্রস্তুত হয়ে গেল। এই যুদ্ধের জন্য সর্বস্তরের মুসলমান সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। যুদ্ধ তহবিলে উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু, উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু অনেক অর্থকড়ি প্রদান করেন। হযরত আবু বকর তো সবকিছু দান করে দিয়েছিলেন। তাঁকে নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রশ্ন করলেন, "পরিবার-পরিজনের জন্য কী পরিমাণ রেখে এসেছো?" তখন তিনি উত্তর দিলেন, "তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি"। মহিলা সাহাবীরা হাতের চুড়ি, ব্রেসলেট, পায়ের নুপুর, কানের দুল, গলার হার, আংটি এবং অন্যান্য মূল্যবান স্বর্ণালংকার দান করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের জান-মালের এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত বিসর্জনের ফলেই মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সত্যধর্ম পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের আত্মোৎসর্গ, পরহেজগারী, রাসূলের অনুসরণ ইত্যাদি আমল স্বয়ং আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল, তাই তিনি পবিত্র কুরআন শরীফে তাঁদের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন:

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যারা সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাজী হয়েছেন, আর তারাও সকলে আল্লাহর প্রতি রাজী হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, এতে তারা হবে চিরস্থায়ী; এটাই হলো বিরাট সফলতা" [তাওবাহ : ১০০]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরির রজব মাসে তাবুকের ময়দানে পৌঁছে ছাউনি স্থাপন করে মোট বিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। রোমানরা মুজাহিদদের দৃঢ় মনোবল ও যুদ্ধের প্রস্তুতি অবলোকন করে ভয় পেয়ে গেল। গাসসানী সৈন্যরা ময়দান ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল। তাবুকের ময়দানে ফজরের নামায পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত মুজাহিদদের সামনে এক আদর্শিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন। সীরাত বিশ্বকোষ থেকে এই অপূর্ব সুন্দর ভাষণের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদ পেশ করার পর বললেন, "হে জনগণ! সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব; সবচেয়ে মজবুত রজ্জু হলো তাকওয়ার বাক্য; সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মিল্লাত হলো হযরত ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাত; সবচেয়ে উত্তম সুন্নাত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত; সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বাক্য হলো আল্লাহর যিকির; সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা হলো আল-কুরআন; ... সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হলো মিথ্যা কথন; ... যে ব্যক্তি গুনাহ মাফ চায় আল্লাহ তাকে মার্জনা করেন; যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে অধিক প্রতিদান দেন; ... হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন।"

কাফির মুশরিক রোমান বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছে জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ এই শীতের সময় আর তাবুক থাকা সমীচিন মনে করলেন না। তাছাড়া অভিযানের সফলতা অর্জন হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ইতোমধ্যে খবর এলো তাবুকের অদূরে দুমাতুল জান্দালের খৃস্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদিল মালিক কিন্দী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এটা জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্যের একটি বাহিনী সেথায় প্রেরণ করেন। ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে খালিদ তাদেরকে পরাজিত করে স্বয়ং উকাইদিরকে বন্দী করে নবীজীর খিদমাতে নিয়ে আসেন। তিনি তাকে জিযিয়া প্রদানের শর্তে মুক্তি দেন।

তাবুকের যুদ্ধই ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ যুদ্ধ যাতে তিনি স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট ২৭টি মতান্তরে ২৮টি যুদ্ধে স্বয়ং নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব যুদ্ধকে বলে গাযওয়া। এছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন সাহাবার নেতৃত্বে মোট ৬০টি যুদ্ধ কিংবা অভিযান সংঘটিত হয়েছিল- এগুলোকে বলে সারিয়্যা।

মসজিদে দিরারে অগ্নিসংযোগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক অভিযান শেষে মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে যু-আওয়ান নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হলো। এতে মুনাফিকদের দিরার মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও চক্রান্ত তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত মালিক ইবনে দুখশুম ও মা'ন ইবনে আদী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে নির্দেশ দিলেন, ঐ মসজিদ জ্বালিয়ে ফেলো। তাঁরা তাঁর নির্দেশ মুতাবিক ঐ মসজিদে যেয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। মসজিদের অভ্যন্তরে যারা ছিলো তারা জীবন বাঁচিয়ে পালালো।

ইসলামের প্রথম হজ্জ

এই বছরই (নবম হিজরি) মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরজ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করেন। তিনি তিনশত লোকের এক কাফিলা নিয়ে হজ্জে গমন করেন।

এ বছর মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা নামাযে ইমামতি করেন। তাকে কুর্তা প্রদান করেন যা কাফন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জানাযা নামাযের পূর্বমুহূর্তে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন, 'তাদের জন্য আপনি মাগফিরাত কামনা করেন বা না এবং আপনি যদি ৭০ বারও মাগফিরাত কামনা করেন তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না'"। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীন জবাব দিলেন: "আমি যদি জানতাম তাদেরকে ক্ষমা করা হবে তাহলে অবশ্যই আমি ৭০ বারেরও বেশী তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম"। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু একথা শুনে নীরব হয়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে মুনাফিক/কাফিরদের জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করে দিলেন। তিনি ইরশাদ করেন:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না; তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও- বস্তুতঃ তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে" [তাওবাহ : ৮৪]।

আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসীর মৃত্যুসংবাদ জানার পর সাহাবাদের নিয়ে তিনি 'গায়িবানা জানাযা' নামায আদায় করেন। হানাফী মাযহাব মুতাবিক এরূপ গায়িবানা নামায পড়া একমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস ছিলো। মুসলমানদের জন্য এরূপ নামায পড়া জায়িয নয়। এ বছর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিআল্লাহু আনহার মৃত্যু হয়।

দশম হিজরি

নবম হিজরির শেষ ও দশম হিজরির প্রথম দিকে সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে অসংখ্য মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে হাজির হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ১০ হাজার সৈন্যসহ মক্কা বিজয় এবং কুরাইশ সরদারদের ইসলাম গ্রহণ সমগ্র আরবে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে মদীনা মুনুওয়ারায়। সুতরাং বিদায় হজ্জ বাদে এ বছরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এসব প্রতিনিধিদলের ব্যাপক আগমন ও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ।

বিদায় হজ্জ

দশম হিজরির জিলহাজ্জ মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্জ পালন করেন। এই ঐতিহাসিক হজ্জে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন লক্ষাধিক সাহাবী। মদীনা শরীফ থেকে এই বিরাট কাফিলা ২৫ যিলকদ বাদ যুহর যাত্রা শুরু করে। যুল

হুলাইফায় পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধেন ও উচ্চস্বরে তালবিয়া (লাব্বায়িক) পাঠ করা শুরু করেন। লক্ষাধিক হজ্জযাত্রী তাঁর সঙ্গে তালবিয়া পড়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেন। যি-তুওয়া নামক স্থানে এসে কাফিলা রাত্রি যাপন করে।

জিলহাজ্জ মাসের ৪ তারিখ দিনের বেলা উচ্চভূমি হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শহরে প্রবেশ করেন। বাইতুল্লাহ শরীফের উপর চোখ পড়তেই তিনি পাঠ করলেন:

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وتَكْرِيْمًا وَبِرًّا وَمَهَابَةً

"হে আল্লাহ! তোমার এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদা, তাজিম ও তাকরীম এবং ভীতিকর প্রভাব বৃদ্ধি করে দাও।" (তাবারানী)

আরো পাঠ করলেন:

اَللّٰهم اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

"হে আল্লাহ! আপনি শন্তিময় শান্তিদাতা আর আপনার পক্ষ হতেই শান্তি আসে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শন্তিসহ বাঁচিয়ে রাখুন।" (বাইহাকী, সুনানে কুবরা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করে ৮ জিলহাজ্জ পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থান করেন। অধিকাংশ মতে তিনি ক্বিরান হজ্জ আদায় করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ৮ জিলহাজ্জ যুহরের পূর্বে সমগ্র মুসলিম কাফিলাকে নিয়ে তিনি মীনায় গমন করেন। সেখানে তিনি যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর এই পাঁচ রাকাআত নামায আদায় শেষে, ৯ জিলহাজ্জ ভোরে আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তিনি আরাফাতের ময়দানে পৌঁছার পর তাঁর উটনী 'আল-কাসওয়ার' উপর আরোহণ করে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ দান করেন। জুমু'আর দিন হওয়াতেও রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামায আদায় করলেন, জুমু'আর নামায পড়লেন না। আরাফাতের প্রখ্যাত জাবালে রাহমাতের নিকট এসে তিনি উকুফ করলেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি হাত উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'আয় কাটিয়ে দিলেন। দু'আ শেষে কুরআন শরীফের এই আয়াতাংশটি নাযিল হলো:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا * فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ * فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম; অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহের প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল" [সূরা মাইদা : ৩]।

সূর্যাস্তের পর হযরত উসামা ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পেছনে বসিয়ে উটনীর উপর আরোহণ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে মুজদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করলেন। ফজরের নামাযের পর পূর্বাকাশ ফর্সা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাশ'আরিল হারামের নিকট কিবলামুখী হয়ে বসে তিনি দু'আ, কান্নাকাটি ও যিকির-আযকারে কাটিয়ে দিলেন। এই সময়টিকে বলে 'উকুফে মুজদালিফা'। এরপর তিনি মুজদালিফা থেকে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বরাবরের মতো তালবিয়া পাঠ করতে করতে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। পুরো কাফিলা তাঁকে অনুসরণ করে যাচ্ছিলো। ওয়াদিয়ে মুহাসসার নামক জায়গাটির মাঝামাঝি আসতেই তিনি তাঁর উটনীর গতি বাড়িয়ে দিলেন। এই জায়গায়ই আবরাহার হস্তীবাহিনী আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। মুজদালিফা থেকে কুড়িয়ে আনা ৭টি কঙ্কর জামারাতুল আকাবায় স্থাপিত স্তম্ভে শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন। এরপর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করলেন।

মীনার কুরবানীর স্থলে এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৬৩টি উট স্বহস্তে কুরবানী করেন। হিসাব করে দেখা গেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৬৩

বছর এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। অবশ্য উটের সংখ্যা ছিলো ১০০। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বাকী উটগুলো কুরবানী করেন। কুরবানী শেষে ক্ষৌরকারকে মাথা মুণ্ডানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। মুণ্ডিত কেশ মুবারক নিকটস্থ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বন্টন করলেন। এরপর তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তাওয়াফে জিয়ারত (যাকে তাওয়াফে ইফাদাও বলে) শেষে তিন যমযম কুপের নিকট গমন করে পানি তুলে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। এরপর ঐদিনই মীনায় ফিরে আসেন ও পরের তিন রাত্রি অর্থাৎ ১৩ জিলহাজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করেন। উভয় দিন তিনি জামারাতে যেয়ে যথাক্রমে ছোট, মধ্যম ও বড়ো স্তম্ভে ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর মক্কা শরীফ যাত্রা করেন, শেষ রাতে বিদায়ী তাওয়াফ করে লোকজনকে তৈরী হতে নির্দেশ দেন। এরপর মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এই ছিলো অতি সংক্ষেপে বিদায় হজ্জের কার্যাবলীর বিবরণ।

পরম প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের প্রস্তুতি

বিদায় হজ্জের সময় যখন আরাফাতের ময়দানে সূরা মাইদার ৩ নং আয়াত নাযিল হলো তখনই বুঝা গিয়েছিল যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াতী দায়িত্ব প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তিনি মানুষকে হিদায়াতের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। ভাষণের সময় তিনি সবাইকে এ ব্যাপারে প্রশ্নও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসা করা হবে, সেদিন তোমরা তার কী জবাব দেবে?" সাহাবায়ে কিরাম সমস্বরে জবাব দিয়েছিলেন, "আমরা বলবো, আপনি আল্লাহর পয়গাম যথাযথ আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।" তিনি তখন আসমানের দিকে শাহাদাত অঙ্গুলি উঁচিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে তিনবার উচ্চারণ করেন: "হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকো।"

তিনি বিদায় হজ্জের বিভিন্ন খুতবায় এ কথাটিও বার বার উচ্চারণ করেছেন: "তোমরা আমার থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। সম্ভবত এ বছরের পর আমার আর হজ্জ করার সুযোগ হবে না"। এরপর সূরা নাসর অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এতে প্রদান করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসল এবং তুমি দেখলে লোকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। অতএব তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের প্রশংসাগীতিসহ তাসবীহ পাঠ করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অবশ্যই তাওবা কবুলকারী" [সূরা নাসর : ১-৩]।

শেষ রোগ

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কণ্ঠ থেকে এমন কিছু বাক্য উচ্চারিত হতে লাগলো যে, এতে প্রকাশ্য ইঙ্গিত মিললো, তিনি এই মায়াবী পৃথিবী ছেড়ে শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করবেন। এই শেষ সফরে যেতে তিনি যেনো দিন দিন ব্যকুল হয়ে উঠছিলেন। পরম প্রিয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষায় তিনি উন্মুখ। তিনি উহুদের শহীদদের কবর জিয়ারত করলেন। এরপর একদিন মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবাদেরকে বললেন, "আমি তোমাদের আগে যাচ্ছি এবং তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। এরপর তোমাদের সঙ্গে আমার হাওযে কাওছারে দেখা হবে।" এসব কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈনের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তারা জানতেন, তাঁদের মহান সাথী পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বেশিদিন তাঁদের মধ্যে থাকবেন না।

সফর মাসের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি রাতের বেলা জান্নাতুল বাকীতে যেয়ে কবর জিয়ারত করেন। ফিরে এসেই অসুস্থতা বোধ করতে লাগলেন। তিনি প্রথমে প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে অবস্থানের জন্য তিনি সকল স্ত্রীদের নিকট থেকে অনুমতি নিলেন।

জীবনের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সিরিয়ায় একটি অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এই বাহিনী যাত্রা করে জুরুফ নামক স্থানে পৌঁছলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীড়ার তীব্রতা বাড়তে লাগলো। এমতাবস্থায় অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হলো। অবশ্য আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু খিলাফত লাভ করেই এই অভিযান সম্পন্ন করেছিলেন।

সর্বশেষ ইমামতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ বেড়ে গেল। ইন্তিকালের চারদিন পূর্বে সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ ইমামতি করেন যুহরের নামাযে। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার ৮ রবিউল আওয়াল ১১ হিজরি। নামায শেষে তিনি জীবনের শেষ ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি হামদ ও ছানা পাঠ শেষে প্রথমেই উহুদ যুদ্ধে শহীদদের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে মাগফিরাত কামনা করলেন। এরপর নিজের কবরকে উপাসনার বস্তু বানাতে নিষেধ দিলেন; কারো কোনো প্রাপ্য থাকলে তা পরিশোধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন; মুহাজিরদেরকে বললেন, তোমরা আনসারদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে; এরপর বললেন, আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতের সবকিছু প্রদান করতে ইচ্ছা করলেন, সে আখিরাতকেই পছন্দ করলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষোক্ত কথাটির মর্মার্থ হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠলো। তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবু বকর! সবর করো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কিছু নসিহত করে ফিরে গেলেন।

অসুস্থতার সময় একদা ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজীর নিকট তাশরিফ আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁকে কানে কানে কি যেনো বললেন, এতে তিনি কেঁদে ফেললেন। এরপর আবার কানে কানে কিছু বলার পর তিনি খুশী হলেন। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, প্রথমবার আমার পিতা আমাকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন

এতে আমি কেঁদে ফেলি। কিন্তু দ্বিতীয়বার বললেন, আমার পরে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সঙ্গে মিলিত হবে, এতে আমার মনে আনন্দ অনুভব করলাম।

আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইমাম নিযুক্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ সময়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েত মুতাবিক হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার বর্ণনামতে ইশার নামাযের সময় লোকজন মসজিদে অপেক্ষারত ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার চেষ্টা করছিলেন নামাযে যোগ দিতে কিন্তু তিনি পারলেন না। শেষে বললেন, আবু বকরকে বলো নামাযে ইমামতি করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ১৭ বা ২১ ওয়াক্ত মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায পড়তে পারেন নি।

ওফাতের দিন এসে হাজির হলো

১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার। তেষট্টি বছর পূর্বে এই একই তারিখে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ পয়গম্বর, জগতসমূহের জন্য রাহমাত পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মায়াবী ধরার কোলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট গুরুদায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছিলেন। আজ তিনি সেই মহান দায়িত্ব পালন শেষে মা'বুদের ডাকে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিভোর করে তুললো। তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবাদের সঙ্গে আজ ক'দিন যাবৎ মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করতে পারছিলেন না রোগের প্রাবল্যতা হেতু। সুবহে সাদিকের সময় হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হুজরার পর্দা তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁরই ইঙ্গিতে। তিনি শেষবারের মতো তাঁর সাহাবাদেরকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চান। নবীজীর মুবারক দীপ্তিমান চেহারা ভোরের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে যেনো শতগুণ বেশী নূরানী রূপ ধারণ করলো। তিনি সাহাবাদেরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উম্মতরা নামায আদায় করে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন, তিনি বুঝি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এক্ষুণি নামাযের ইমামতির জন্য মসজিদে তাশরীফ আনবেন। সবাই

তাঁর আগমনের জন্য সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারায় আবু বকরকে নামায আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারায় তখন ফুটে ওঠেছে অপূর্ব স্নিগ্ধ হাসির রেখা। তিনি হুজরায় ফিরে গেলেন।

ইন্তিকালের পূর্বে হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কোলে তাঁর পবিত্র মাথা মুবারক ছিলো। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ঐ দীনারগুলো কি করেছো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো টাকাকড়ি ছিলো না, তিনি সবকিছু ইতোমধ্যে গুছিয়ে ফেলেছিলেন। তবে সাতটি দীনার তার নিকট অবশিষ্ট ছিলো। তিনি আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে নির্দেশ দিলেন এই টাকাগুলো সদকা করে দিতে।

সর্বশেষ আ'মল মিসওয়াক ব্যবহার

মিসওয়াক করা ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন দেখে অনেকেই যারতার কাজে চলে গেলেন। কিন্তু আসলে এ ছিলো বিদায় মুহূর্তের সংকেত মাত্র। অচিরেই তাঁর অন্তিম সময় এসে হাজির হয়ে গেল। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। এমন সময় আমার ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আসলেন। তাঁর হস্তে একটি কাঁচা মিসওয়াক ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটির দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। আমরা বুঝতে পারলাম তিনি এটা চাচ্ছেন, তাই জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটা আপনাকে দেবো? তিনি হ্যাঁ-সূচক ইশারা করলেন। আমি এটা হাতে নিয়ে চিবিয়ে নরম করলাম, এরপর তাঁকে দিলাম। তিনি খুব উত্তমভাবে মিসওয়াক করলেন। ইতোপূর্বে কখনো আমি তাঁকে এতো ভালোভাবে মিসওয়াক করতে দেখি নি। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা পরবর্তীতে অত্যন্ত গর্ব করে বলতেন, আল্লাহর অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালার সঙ্গে আমার লালা একত্র হয়েছে, তিনি আমার বুকে মাথা মুবারক রেখে, আমারই হুজরায় ইন্তিকাল করেছেন।

শেষ নসিহত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নসিহত ছিলো: নামায ও তোমাদের দাসদাসীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি বলেছিলেন, নামায এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।

ইন্তিকাল

বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসলো। তিনি এই মায়াবী ধরাধাম থেকে চলে যেতে একরকম ব্যকুল হয়ে ওঠলেন। আল্লাহর সান্নিধ্য সন্নিকটে ভেবে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। অপরদিকে মৃত্যুর পেরেশানী তো ছিলোই। পাশে রাখা পানির পাত্রে হাত মুবারক ডুবিয়ে সিক্ত করে চেহারা মুবারকে বার বার দিচ্ছিলেন আর পাঠ করছিলেন:

لَا إِلٰهَ إِلا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ

"আল্লাহ ব্যতীত কোনও মা'বুদ নাই। মৃত্যুতে রয়েছে পেরেশানী ও যন্ত্রণা"। (তাবারানী)

কোন কোন সময় বলছিলেন: "হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যুর কষ্টের সময় সাহায্য করুন"।

হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একবার বললেন, "হায় আল্লাহ! আমার পিতার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আজকের এই দিন পর তোমার পিতার আর কোনো কষ্ট হবে না"।

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারক প্রস্থানের সময় একেবারে নিকটবর্তী হয়ে আসলো। তিনি বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلٰى

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা ও রহম করুন এবং আমাকে সম্মানিত বন্ধুর সাথে মিলিত করুন" এবং

اَللّٰهُمَّ اَلرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

"হে আল্লাহ! সম্মানিত বন্ধুর নিকট আমি যেতে চাই"।

তাঁর পবিত্র রূহ মুবারক আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীঊন। তিনি ১১ হিজরির ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার দিন, দুপুরে গোটা মদীনা শরীফ তথা পুরো মহাবিশ্বকে কাঁদিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁর আগমনের দিনটি ছিলো পৃথিবীর জন্য মহানন্দের আর যাওয়ার দিনটি হলো মহাশোকের। আমরা তাঁর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি। তিনি চলে গেলেও মানুষের জন্য রেখে গেছেন হিদাআতের দু'টি মহাসত্যের উৎস: আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীম ও তাঁর পবিত্র জীবনের কর্ম, বাণী ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মের সমর্থনসম্মৃদ্ধ পবিত্র হাদীস শরীফ।

হে মহান আরশের অধিপতি! তোমার পেয়ারে হাবীবের শাফায়াত লাভে এই অধম বান্দাকে ধন্য করো। এই লেখাটুকুতে অবশ্যই অনেক ভুল-ত্রুটি করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পেয়ারে হাবীব রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনো রোজ কিয়ামতে আমাকে মায়ার দৃষ্টিতে দেখেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ওয়াসিলায়। আপনি আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজন এবং পাঠকদের ক্ষমা করুন এবং এ লেখা থেকে উপকৃত করুন। আমীন।

আমি যদি মুখগহ্বর হাজার বার মিশক ও গোলাপজলে ধৌত করি, তোমার পবিত্র নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করার যোগ্যতা লাভে ঐ মুখটি ব্যর্থ হবে।

দু' জাহানের সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারিক জিনিসপত্র

রাহমাতুল্লিল আলামীন, সয়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, উভয় জগতের সরদার, পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নশ্বর এ ধরার বুকে মাত্র ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। জীবনচলার জন্য একান্ত জরুরী রসদপত্র ছাড়া অতিরিক্ত কিছু তাঁর গৃহে থাকতো না। সকল যুগের সকল ওলিদের পথপ্রদর্শক, শরীয়ত ও মা'রিফাতের মধ্যমণি, পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ 'ইনসানে কামিল' মহামানব- যদি চাইতেন, তাহলে বাদশাহদের বাদশাহর মতো জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চান নি। অবিনশ্বর মহাজগতের অফুরন্ত নিয়ামত এবং খাস করে রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও দীদারের সামনে দুনিয়াবী যাবতীয় ভোগ-বিলাস মহাসাগরের মাঝে মাত্র একফোটা পানির চেয়েও তুচ্ছ। হযরতের ব্যবহারিক জিনিসপত্র ও গৃহের আসবাব নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তালিকাভুক্ত করেছি। পাঠক এ থেকেই আন্দাজ করে নিতে পারবেন দুনিয়ার প্রতি তাঁর চরম অনাকর্ষণের মাত্রা।

তাঁর পানপাত্র

তিনি মোট তিনটি পানপাত্র ব্যবহার করতেন: ১. রাইয়্যান। ২. মুদাব্বাব: ধাতুর তৈরী এই পাত্রে ছিলো রৌপ্যের নির্মিত একটি চেইন ও হাতল। এটা তিনি সফরকালে ব্যবহার করতেন। ৩. কাচের তৈরী কাপ।

পানি পানের জন্য ছিলো একটি ক্বাদ- এটা ছিলো কাঠের তৈরী। অযুর বদনা হিসাবেও এটা ব্যবহার করতেন। খেজুর বৃক্ষের তৈরী একটি পাত্র ছিলো যা তিনি রাতে প্রস্রাবের জন্য ব্যবহার করতেন।

চামড়ার তৈরী পানির পাত্র ছিলো মোট ৫টি: ১. ক্বিরবা: অযু ও পানের জন্য ব্যবহার করতেন। ২. আদওয়া: চামড়ার ছোট্ট পাত্র। ৩. মিযাদা: চামড়ার তৈরী পানির পাত্র। ৪. শান্না: পুরাতন চামড়ার পানির পাত্র। গরমের সময় এ পাত্রে পানি রাখলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তা ঠাণ্ডা থাকতো। ৫. সিক্বা: চামড়ার পানির পাত্র।

ছুরি

তিনি তিনখানা ছুরি ব্যবহার করতেন: ১. সিক্কিন, ২. মুদিয়া ও ৩. শাফরা: এটা ছিলো অনেকটা চওড়া ছুরি।

মুবারক যষ্টি

তাঁর মোট তিনটি যষ্টি (গল্লা) ছিলো: ১. মিহজান: এর অপর নাম ছিলো 'দাক্কন' (বা দাফন)। এটা ছিলো ১ গজ লম্বা (৩ ফুট)। চলতে ও আরোহী অবস্থায় এটা তাঁর হাত মুবারকে থাকতো। ২. ক্বাদিব: এই গল্লার নাম ছিলো, 'মামশুক'। কাঠের তৈরী এই যষ্টি পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদীন ব্যবহার করেছেন বরকতের জন্য। ৩. মিকশারা: এই গল্লার নাম ছিলো 'আরজুন'।

বিছানাপত্র

১. ফিরাশ (বিছানা): এ বিছানা ছিলো চামড়ার তৈরী। এর ভেতর খেজুর বৃক্ষের ছাল ছিলো।
২. উইসাদা (বালিশ): চামড়ার তৈরী এই বালিশের ভেতরও খেজুর গাছের ছাল ছিলো।
৩. মিরফাদা মিন আদাম: এটাও একটি চামড়ার তৈরী বালিশ।

কাঠের খাট

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একখানা কাঠের তৈরী খাট ছিলো। তিনি প্রায়ই এতে বিশ্রাম নিতেন। এরূপ কাঠের তৈরী খাটে করে মাইয়্যিতকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার ঐতিহ্য কুরাইশদের মধ্যে ছিলো। এই কৃষ্টিটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংরক্ষণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর এই খাট দিয়ে হুজরা শরীফে সমাহিত উভয় খলিফা- হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে শায়িত অনেক সাহাবায়ে কিরামের লাশও এই খাটে করে বহন করা হয়েছে।

পানীয়

তিনি পানি ছাড়াও বকরির দুধ খুব বেশী পছন্দ করতেন। মাঝে মধ্যে উটের দুগ্ধও পান করেছেন। দুধের তৈরী অন্যান্য জিনিষও তিনি আহার করতেন। যেমন: জুবনা (পনির), আক্বিত (এটাও একজাতীয় পনির), সাম্ন (ঘি) এবং জুবদা (তাজা ঘি)। দুধে পানি মিশিয়েও পান করেছেন। অপর আরেক ধরনের পানীয় যা খেজুরের রস থেকে তৈরী হয়, তিনি পান করতে ভালোবাসতেন। এটার নাম হলো 'নাবিদ্ব তামর'। আরেক ধরনের পানীয় ছিলো যার নাম 'নাবিদ্ব জাবিব'। এটা কিশমিশ পানিতে ভিজিয়ে তৈরী হতো। এছাড়া 'নাবিদ্ব শা'ইর' নামক আরেক ধরনের পানীয় ছিলো- যা তিনি পান করতে পছন্দ করতেন। এটা তৈরী হয় পানির মধ্যে যব ভিজিয়ে।

মধু

মধু মানুষের জন্য উপকারী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখ হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু খেতে ভালোবাসতেন। তিনি খাঁটি মধু খেতেন এবং পানি কিংবা দুধ মিশ্রিত মধুও পান করেছেন।

খেজুর

তিনি খেজুর খেতে ভালোবাসতেন। খেজুর পাকা হওয়ার বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন: বুসর (কাঁচা), রুতাব (তাজা), তামর (শুকনো) এবং তামর আতিক্ব (পুরাতন খেজুর)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরনের খেজুর খেয়েছেন। তবে রুতাব (তাজা) খেজুর অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে খেতে ভালোবাসতেন, যেমন: ১. রুতাবের সাথে শশা, ২. রুতাবের সাথে তাজা ঘি, ৩. রুতাবের সাথে পনির ও ৪. রুতাবের সাথে তরমুজ।

নূরোজ্জ্বল মুবারক চেহারা

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখনই পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতেন তখনই নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

امين بالمصطفٰى بالخير يدعو
كضوء البدر زايله الظلام

তিনি 'বিশ্বস্ত' ঐশীসূত্রে নির্বাচিত জন, তিনি আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেন
তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো- যা দৃশ্য হয় অমাবস্যা রাতের পর।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রায়ই কবি জুহায়ির ইবনে আবি সালমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

لو كنت من شيء سوى البشر
كنت المضيء ليلة البدر

আপনি যদি মানব না হয়ে অন্য কিছু হতেন, তাহলে আকাশের চাঁদের মতো হতেন,
আপনার নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো সমস্ত জগৎ।

হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা অত্যন্ত আবেগভরে বলেন:

لنا شمس وللافاق شمس
شمسي تطلع بعد العشاء

আমার নিজস্ব জগতের একটি সূর্য আছে
আমার সে সূর্য উদয় হয় ইশার পরে।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক ছিলো লালচে-উজ্জ্বল-সাদা। তাঁর মুবারক চোখ দু'টোর রং ছিলো গাঢ়

কালো। কালো চুল মুবারক অধিকাংশ সময় কানের লতি মুবারক পর্যন্ত দীর্ঘ ছিলো। বুক মুবারকে একটি পাতলা লোমের রেখা ছিলো।

তিনি খুব লম্বা কিংবা বেঁটেও ছিলেন না। যখন তিনি হাঁটতেন, মনে হতো কোন টিলা থেকে নীচের দিকে নামছেন। সৈন্যদের মতো উভয় পদ মুবারক দ্রুত ওঠাতেন এবং ধীরে ধীরে মাটিতে নামাতেন। [আমার শায়খ কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি এভাবে হাঁটতেন আর বলতেন, এরূপ হাঁটা হলো সুন্নাত।]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক ঘর্মে ছিলো মিশক-আম্বরের সুঘ্রাণ। যখন তা নির্গত হতো, মনে হতো মোতি ঝরে পড়ছে। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাঢ় কালো দীর্ঘ মুবারক দাড়ি ছিলো। বুক মুবারক পর্যন্ত দাড়িতে আবৃত হয়ে যেতো।

মু'জিযাতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবী-রাসূলদের কর্তৃক প্রকাশিত মু'জিযা সত্য। অপরদিকে আউলিয়াদের মাধ্যমেও মাঝে-মধ্যে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়। একে বলে 'কারামত'। এটাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর আক্বীদানুযায়ী সত্য। উভয়টি কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রেই মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ছিলেন, মু'জিযা তারই প্রমাণ হিসাবে তাঁদের জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমাদের পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন: ১. খন্দক খননের সময় পাথর চুরমার করে দেওয়া। ২. কাবা ঘরে সংরক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি মক্কা বিজয়ের দিন লাঠির ইশারায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া। ৩. পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-তরু-লতা ও পাথরখণ্ড থেকে নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান। ৪. হিজরতের দিন ভোরে একমুষ্ঠি বালু নিক্ষেপ করে কাফিরদের চোখ অন্ধ করে দেওয়া ও তাদের অজান্তে গৃহ থেকে বের হয়ে চলে যাওয়া। ৫. গারে সূরে অবস্থানকালে মাকড়শার জাল বোনা ও কবুতরের ডিম পাড়া। ৬. বৃক্ষরাজি চলন্ত হওয়া। ৭. কাষ্ঠখণ্ড উত্তম তলোয়ারে রূপান্তর।

৮. জীব-জন্তুর অভিযোগ ও তাদের পক্ষ থেকে সম্মানের সিজদা দেওয়া। ৯. পবিত্র হাতের আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির ফোয়ারা নির্গত হওয়া। ১০. ইয়াহুদী মহিলা কর্তৃক বিষমিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করা। ১১. বৃষ্টির জন্য দু'আ ও বৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

অধিকাংশ গবেষকের মতে তাঁর মু'জিযার সংখ্য হাজারেরও অধিক। নিম্নে আমরা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ১০টি গুরুত্বপূর্ণ মু'জিযা কিছুটা বিস্তারিতভাবে পাঠকদের অন্তরের খোরাক হিসাবে লিপিবদ্ধ করলাম। আল-মিরাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৃহৎ একটি মু'জিযা। ইতোমধ্যে আমরা এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে পুনরুল্লেখ করছি না।

১. সর্ববৃহৎ মু'জিযা কুরআনুল করীম

এটা এমন এক ঐশি কিতাব যার তুলনা জগতসৃষ্টির পর থেকে কখনো হয় নি- কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর হতে চললো। অবতীর্ণ হতে শুরু হয় এই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান কিতাব মক্কা মুকাররমার জাবালে নূরের চূড়ার সেই 'হিরা' গুহায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলেন মানুষের জন্য হিদায়াতের চিরসত্য বাণী স্বর্গীয় দূত হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম। এরপর দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়তী জিন্দেগীতে নাযিল হয় বিভিন্ন সময় পুরো কুরআনে করীম। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণের জন্য লিখিত কিতাব হিসাবে প্রকাশ করেন। তবে কুরআন শরীফ সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আমারই।" (হিজর : ৯)

কুরআন শরীফ যে মানুষের পক্ষে রচনা অসম্ভব তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করে বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস, তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও- এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (বাক্বারাহ : ২৩)

এই চ্যালেঞ্জ আরব-অনারব তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি। কিয়ামত পর্যন্ত এটা বহাল থাকবে। সে যুগের আরবের খ্যাতিমান বাগ্মি, বাকপটু, কবি-সাহিত্যিকরা পারেন নি এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে। সুতরাং এ যুগে কিংবা পরবর্তী যে কোনো যুগেও যে কেউ তা পারবে না তা নিশ্চিত। আরব ভাষা-পণ্ডিতগণ যেখানে ব্যর্থ সেখানে অনারবদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুকাবিলার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এরপরও এই চ্যালেঞ্জ সবার প্রতি জারী আছে।

কুরআন শরীফের মু'জিযাত ভাব যা তত্ত্ব জগতের সাথে সম্পর্কিত। অলৌকিক এই ভাবের দু'টি দিক আছে: ১. ভাষালঙ্কার ও ২. ভবিষ্যদ্বাণী। ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য এতোই উন্নতমানের যে, এরূপ কোনো কিতাব পৃথিবীতে কখনো রচিত হয় নি। বার বার পাঠ করলে এর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যান্য কিতাব একবার পাঠ করে নিলে আর দ্বিতীয়বার পাঠ করার ইচ্ছেই হয় না। এছাড়া কুরআন শরীফ সহজ করে দেওয়া হয়েছে হিফজ করার জন্য। একজন হাফিজ হতে বড়জোর তিন বছর সময় লাগে। তবে কেউ কেউ মাত্র এক মাসের মধ্যেও কুরআন শরীফ হিফজ করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। সুবহানাল্লাহ! এ সবই কুরআন শরীফের মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। অনেকে বলেছেন, পবিত্র কিতাবুল্লায় অন্তত ৭ হাজার মু'জিযা আছে। তবে এই ভাষালঙ্কার, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুরূপ বাক্য-রচনার চ্যালেঞ্জ এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ হলো অধিকাংশের মতে কুরআন শরীফের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মু'জিযা।

দ্বিতীয়ত, কুরআন শরীফে যেমন অতীতের অনেক ঘটনাবলী, জনপদ ধ্বংসের ইতিহাস ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে ঠিক তেমনি বহু ভবিষ্যদ্বাণী আছে যার অনেকগুলো ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। এ সবগুলোই একেকটি মু'জিযা। এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি।

(ক) নিকটবর্তী বিজয়ের সুসংবাদ: হুদাইবিয়ার সন্ধির পরই সূরা 'ফাতাহ' এর প্রথম আয়াতেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

(খ) পারস্য ও সিরিয়া বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী: ইরশাদ হয়েছে,

وَأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

"এছাড়া অন্য আরেকটি বিজয় রয়েছে, যা তোমাদের আয়ত্তে আসে নি। আল্লাহ একে (নিজ ক্ষমতাবলে) পরিবেষ্টন করে আছেন।"

জমহুর মুফাসসিরীনে কিরাম বলেছেন, উক্ত আয়াতে করীমে আল্লাহ তা'আলা পারস্য ও সিরিয়া (রোমানদের বিরুদ্ধে) বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে।

(গ) কিছু মুসলমান মুরতাদ হওয়ার পূর্বাভাস: আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أَذِلَّةٍ عَلٰى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلٰى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَائِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়- নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (মাইদাহ : ৩০)

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়-গ্রহণের পর আরবের কোনো কোনো গোত্রের বেশ কিছু লোক ধর্মত্যাগ করে। এরা মুরতাদ হয়ে যায়। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে। বিরাট একদল লোক মিথ্যা নবী-দাবীদার মুসাইলামা বিল কাজ্জাবের অনুসারী হলো। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে 'ইয়ামামার যুদ্ধে (৬৩৩ খ্রি.)' জঙ্গে উহুদের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা মহাবীর হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ওয়াহশী (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) ঐ একই বর্ম দ্বারা মুসাইলামাকে হত্যা করেন।

(ঘ) পারস্য ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী: পবিত্র কুরআনের সূরা রূমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ*

"আলিফ-লাম-মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায়। তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্তর বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে।" (রূম ১-৪)

এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধের ফলাফল রোমানদের পক্ষে যায়। উক্ত দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ পাক এই ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণার ৯ বছরের মধ্যেই পারস্য সৈন্যরা রোমান সৈন্যদের হাতে পরাজয়বরণ করে। উল্লেখ্য যেদিন

রোমানদের বিজয় হয় ঠিক সেদিন মুসলমানরা বদর প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে রোমানদের বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে দেন। এতে মুসলমানরা দু'টি বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করেন। ইতোপূর্বে পারস্য মুশরিকরা রোমানদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জয়লাভ করায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে। তারা বলাবলি করছিলো, 'একদল কিতাবধারীর বিরুদ্ধে মুশরিকরা বিজয়ী হয়েছে!'। এ খবরে মুসলমানরা মনঃক্ষুন্ন হয়ে পড়েন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, পারস্যের এই বিজয় সাময়িক। কিছুদিন পর তারা রোমানদের হাতে পরাজিত হবে এবং সর্বোপরি মুসলমানরা অবশেষে উভয় দলকে পরাজিত করবেন। আর তা-ই হয়েছিল।

২. মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী

(ক) সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি দ্বীন সুরাইয়া (সিরিয়াস) নক্ষত্রের গায়ে ঝুলন্ত থাকে, তথাপি পারস্যের কিছু লোক এই দ্বীনকে পেয়ে যাবে।"

মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে একদল এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এতে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [মাওলানা আহমদ সাঈদ দেহলভী প্রণীত, মো'জেযায়ে রাসূলে আকরাম (বঙ্গানুবাদ), অনুবাদ: মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা ১৯৯৫ ঈ।]

(খ) মুসতাদারায়ে হাকিমে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "নিকট ভবিষ্যতে এমন হবে যে, লোকজন জ্ঞানের সন্ধানে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করবে। কিন্তু মদীনার আলিম অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী আলিম তারা পাবে না।"

হযরত সুফিয়ান ইবনে উমাইয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মদীনার আলিম দ্বারা ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে ইশারা করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(গ) ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কুরাইশ বংশে একজন বড় আলিমের জন্ম হবে। তিনি পৃথিবীকে জ্ঞানের ভাণ্ডার দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন।" রিওয়ায়েতটি বাইহাকী শরীফে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সমগ্র পৃথিবীতে ইমাম শাফিঈ অপেক্ষা বড় কোনো কুরাইশ বংশীয় আলিম জন্মগ্রহণ করেন নি।

৩. মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে বিরাট অগ্নিকুণ্ড

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী ৬০০ বছর পর পূর্ণ হয়েছিল। এই বাণীটি সহীহাইন শরীফাইনে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের পূর্বে হিজায অঞ্চলে এমন তীব্র অগ্নি নির্গত হবে যে, এর আলোকে সিরিয়া থেকে বসরা নগরীর উটগুলোর গর্দান পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে।"

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। ৬৪৫ হিজরি সনের ৩ জুমাদাল উখরা রোজ শুক্রবার ইশার পর মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে হঠাৎ মাটির গর্ভ থেকে এক প্রকাণ্ড অগ্নি নির্গত হতে থাকে। বিরাট এলাকা জুড়ে অগ্নিশিখা

দেখাচ্ছিল। অনেকে বলেছেন, দূর থেকে মনে হতো, "এক বিরাট জ্বলন্ত শহর"। অগ্নির দৈর্ঘ্য ছিলো ১২ মাইল এবং প্রস্থ ৪ মাইল। অগ্নির শিখা ৯-১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু ছিলো।

ঘটনার সময় বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা কাসতালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবিত ছিলেন। তিনি এই অগ্নি সম্পর্কে আলাদা একখানা কিতাব রচনা করেন। তিনি বলেছেন, এই অগ্নি মোট ৫৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো।

৪. হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যুকালীন অবস্থা

তিনি ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন আ'রিফ জলিলুল কদর সাহাবী। তিনি জাগতিক সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন। আমির-উমারাদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনকে ঘৃণা করতেন। শেষ জীবন লোকালয়হীন 'যুবদাহ' নামক এক স্থানে কাটান। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো। স্ত্রী চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কাঁদতে লাগলেন। স্বামীর নিকট যেয়ে মন্তব্য করলেন, "হায়! আমরা এমন এক স্থানে অবস্থান করছি যেখানে ঝোপঝাড় ছাড়া কিছুই নাই! সাহায্যকারী একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না!" হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "হে আমার স্ত্রী! তুমি কেঁদো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আছে যে এমন এক জায়গায় মারা যাবে, যেখানে লোকজন থাকবে না। তার জানাযায় মুসলমানদের একটি দল হঠাৎ পৌঁছে যাবে।" উম্মে যর! শ্রোতাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কেই বলেছিলেন। যাও বাইরে গিয়ে সেই আগন্তুক দলের অপেক্ষা করো।"

উম্মে যর রাদ্বিআল্লাহু আনহা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সত্যিই দেখা গেল একদল মুসাফির তাঁর বাড়ির দিকে আসছেন। তিনি তাঁদেরকে হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে সব অবগত করলেন। তাঁরা ছুটে গেলেন ভেতরবাড়ি। তখনও তিনি জীবিত। বললেন, ওহে আগন্তুক ভাইগণ! আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো সরকারী চাকুরী করেন না কিংবা আমির-উমারা নন তিনিই আমার কাফন পরাবেন, জানাযায় ইমামতি করবেন ও দাফন দেবেন। একথা শোনে একজন যুবক এগিয়ে এসে

বললেন, 'আমি আপনার কাফনের জন্য নিজের ইযারবন্দ এবং দু'টি কাপড় দান করবো। এগুলো আমার মায়ের হাতের কাটা সূতায় তৈরী।' হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তা কবুল করলেন। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অসিয়ত মতো তাঁকে গোসল, কাফন-দাফন করা হলো। (বাইহাকী শরীফ)

৫. পারস্য সম্রাট পারভেজের মৃত্যুসংবাদ প্রদান

ইমাম বাইহাকী এই ঘটনাটি পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘটনার সারসংক্ষেপ এই। হিজরি ৬ষ্ঠ সনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগের বিভিন্ন সম্রাট ও শাসকবর্গের নিকট পত্রযোগে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন। পারস্য সম্রাট পারভেজের নিকটও একখানা পত্র প্রেরিত হয় দূত মারফত। অহঙ্কারী বে-আদব পারস্য সম্রাট পত্রখানা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিল। বললো, 'মুহাম্মদ' নাম কেন আমার নামের পূর্বে লিখা হলো? রাগান্বিত হয়ে পারস্য সম্রাজ্যাধীন ইয়ামনের শাসনকর্তা 'বাযান'কে নির্দেশ দিল, তুমি দু'জন চৌকস ও বিচক্ষণ লোক মদীনায় প্রেরণ করো। মুহাম্মদকে বন্দী করে আমার নিকট নিয়ে এসো!

নির্দেশ পেয়ে বাযান দু'জন দক্ষ ও বিচক্ষণ লোক মদীনা শরীফ প্রেরণ করে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। বে-আদবীপূর্ণ কিছু কথা উচ্চারণ করে বললো, আপনি পারস্য সম্রাটের নিকট চলুন! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তচিত্তে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, "তোমাদের সম্রাট পারভেজ তো গতরাতে স্বীয় পুত্র কর্তৃক নিহত হয়েছেন! আল্লাহ তা'আলা ওহির মাধ্যমে এ সংবাদ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা চলে যাও!" তারা বাযানের নিকট ফিরে যেয়ে সব কথা খুলে বললো। বাযান পারভেজের মৃত্যু সংবাদ তখনও জানতেন না। তিনি মন্তব্য করলেন, এই সংবাদ যদি সঠিক হয়- তাহলে তিনি সত্যিই আল্লাহর নবী। খুব শীঘ্র পারভেজের হন্তা শিরভিয়া একখানা চিঠির মাধ্যমে তাকে জানালো, "পারভেজ অত্যাচারী বিধায় আমি তাকে রাতে হত্যা করে ফেলেছি। আরব দেশে যে লোকটি নবুওয়াতের দাবী করছেন, আপনি তার সাথে কোনো সংঘাতে যাবেন না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এই সংবাদের সত্যতা যখন বাযানের নিকট প্রমাণিত হয়ে গেল তখন তিনি দু'জন পুত্রসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যান।

৬. ফিরিশতাদের কর্তৃক নিরাপত্তা দান

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুদ্ধে ফিরিশতাদের কর্তৃক সাহায্য করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত আছে। এ সবই তাঁর মু'জিযা হিসাবে স্বীকৃত। তাঁকে ফিরিশতাদের দ্বারা নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন। এ সম্পর্কেও একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এরূপ একটি ঘটনা তুলে ধরছি।

একবার পাপিষ্ঠ মুশরিক আবু জাহল বললো, 'আমি লাত ও উয্যার নামে শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদকে মাটির উপর (নামায অবস্থায়) নাক ঘষতে দেখি তাহলে (নাউযুবিল্লাহ্) আমার পা দ্বারা তাঁর গর্দান পিষ্ট করে ফেলব!" ঘটনাক্রমে একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করাকালে পাপিষ্ঠ আবু জাহল উপস্থিত হয়ে তার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলে অগ্রসর হলো। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর উভয় হাতে সে অদৃশ্য কিছু প্রতিহত করতে করতে পেছনের দিকে সরতে লাগলো। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বললো, 'আমি ও মুহাম্মদের মাঝখানে ভীতিপ্রদ জ্বলন্ত অগ্নির এক বিরাট গর্ত দেখতে পেলাম। কতিপয় ডানাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আবু জাহল যদি আমার নিকটে আগমন করতো তাহলে ফিরিশতারা তাকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে যেতেন!"

৭. খাবারে অতিমাত্রায় বরকত

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তী জিন্দেগীতে 'খাবারে বরকতের' ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। এরূপ মু'জিযার সবগুলো এখানে বর্ণনা আদৌ সম্ভব নয়। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি মাত্র বিশুদ্ধ বর্ণনা তুলে ধরছি।

(ক) পেয়ালার খাবারে বরকত: তিরমিযী ও দারিমী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস আছে। হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, কোনো একদিন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটি পেয়ালায় রাখা খাদ্য ভক্ষণ করছিলাম। কিছুক্ষণ পর পর ১০ জন করে লোকসংখ্যা বাড়ছিলো। সকলেই ঐ একই পেয়ালা থেকে খাচ্ছিলেন। প্রথম ১০ জনের খাওয়া শেষ হওয়ার পর আরো ১০ জন এসে বসছিলেন। এভাবে পালাক্রমে আহার গ্রহণ চলছিলো। মানুষ হযরত জুন্দুব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, পেয়ালার মধ্যে খাদ্য কিভাবে আসছিলো? তিনি আসমানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওখান থেকে আসছিলো।

(খ) দু'জনের খাবার একশত ত্রিশ জনে খেলেন: বাইহাকী ও তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সহীহ সদনে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশজন আনসার নিয়ে উপস্থিত হলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সবাই ঐ দু'জনের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার দ্বারা পেট পুরে খেলেন। আরো অবাক হওয়ার ব্যাপার, খাবার তখনও সম্পূর্ণ শেষ হলো না- কিছুটা রয়ে গেল। এরপর আরো কিছু লোক এসে খাবার খেতে লাগলেন। মোট ১৩০ জন লোক দু'জনের জন্য পাক করা খাবার খেলেন। অনেকে মুসলমান হলেন ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন।"

(গ) আসহাবে সুফফার সকলকে নিয়ে আহার: মুসলিম ইবনে আবু শাইবা ও তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি রিওয়ায়েত তাঁদের স্ব-স্ব হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে আসহাবে সুফফার সকল লোককে ডেকে আনতে আদেশ দিলেন। সবাইকে নিয়ে আসার পর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মুখে একটি খাদ্যভর্তি পেয়ালা রাখলেন। সকলে এ থেকে তৃপ্তিসহ আহার করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পেয়ালার খাদ্য যেই-

সেই রয়ে গেল। শুধু এটুকু লক্ষ্য করলাম, পেয়ালার খাদ্যে আঙ্গুলের অনেক দাগ আছে।" উল্লেখ্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম উল্লেখ করেছেন, আসহাবে সুফফায় একান্ত গরীব অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন শতাধিক সাহাবায়ে কিরাম বাস করতেন। কারো কারো মতে তাঁদের সংখ্যা ৪ শতাধিক ছিলো।

(ঘ) আধা সের আটার রুটি খেলেন চল্লিশ ব্যক্তি: ইমাম আহমদ ও ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনা স্ব-স্ব হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তালিব গোত্রের চল্লিশ জনকে দাওয়াত করলেন। এদের কেউ কেউ খুব বেশী পেটুক ছিলেন। একাই একটা আস্ত বকরি খেয়ে নিতেন। এছাড়া একজনে আট সের পর্যন্ত দুগ্ধ পান করে ফেলতেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পেটুকদের জন্য মাত্র আধা সের আটার রুটি তৈরী করালেন। অতিথিরা এটুকু রুটি খেয়ে শেষ করতে পারলেন না- বেশ কিছু রয়ে গেল! এরপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পেয়ালায় বড়জোর ৪ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট, দুধ আনলেন। এবারও তারা সকলে তৃপ্তিসহ দুধ পান করলেন- কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। মনে হচ্ছিল, কেউই দুধ পান করেন নি!" সুবহানাল্লাহ!

৮. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ এই মু'জিযার বর্ণনা সর্বাধিক সহীহ হাদীসগ্রন্থ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। মূল বর্ণনাকারীদের মধ্যে আছেন হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামন রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। ঘটনাটির বর্ণনা নিম্নরূপ।

হিজরতের পূর্বে মক্কা মুয়াজ্জমায় একদা আবু জাহল, ওলিদ ইবনে মুগিরা, আস ইবনে ওয়ায়িল প্রমুখ মুশরিক একত্রিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে চ্যালেঞ্জ করলো, 'আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে আকাশের চন্দ্রকে

দ্বিখণ্ডিত করে দেখান!' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যদি এরূপ করে দেখাতে পারি, তবে কি তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে?" তারা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে যাবো'।

হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি চন্দ্রটির দিকে অঙ্গুলি মুবারক দ্বারা ইশারা করলেন। আল্লাহর কী কুদরত! সত্যিই চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল! উপস্থিত সকলেই তা দেখলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজের চোখে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে দেখেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের নাম ধরে ধরে বললেন, "হে অমুক, হে তমুক! সাক্ষী থাকো, সাক্ষী থাকো ..."।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য সকলের চোখে পড়লো। উভয় খণ্ড এতো দূর পর্যন্ত চলে গেলো যে মাঝখানে হিরা পর্বত দেখাচ্ছিল। স্বচক্ষে এই অত্যাশ্চর্য মু'জিযা অবলোকন করার পরও পাপিষ্ঠ কাফিররা বলে ওঠলো, 'এ-তো প্রকাশ্য যাদু!' আবু জাহল বললো, 'আমরা এ ব্যাপারে আরো খোঁজ-খবর নেবো। যদি এটা যাদু হয়ে থাকে, তাহলে শুধু আমাদের উপরই হতে পারে। অনুপস্থিত যারা এবং অন্যান্য শহরে বসবাসকারীদের উপর তো যাদুর ক্রিয়া বিস্তৃত হতে পারে না। তাই বাইর থেকে আগত লোকজনদের নিকট থেকে ব্যাপারটি জেনে নেওয়া উচিৎ।' আবু জাহলের এই চ্যালেঞ্জও বাতিল হলো। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে বলতে লাগলেন, তারাও চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য দেখেছেন।

এই অত্যাশ্চর্য মু'জিযা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে ইরশাদ করেছেন:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

-"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।" (সূরা ক্বামার ১-২)

তারিখে ফিরিশতা, সাওয়ানিহুল হারামাইন ইত্যাদি ইতিহাসগ্রন্থে কিছুক্ষণের জন্য চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ অবলোকন করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তারিখে ফিরিশতায় আছে, মালাবারের এক রাজা মুসলমানদের নিকট থেকে এই ঘটনা শ্রবণ করে যুগের পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বললেন, 'আমাদের ধর্মগ্রন্থ খোঁজে দেখেছি, আরবের এক নবীর ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবে। আপনি যে ঘটনার কথা বলছেন, সেটা সে-ই ঘটনা।' একথা শোনে রাজা মুসলমান হয়ে যান।

সাওয়ানিহুল হারামাইন কিতাবে আছে, মালোহ রাজ্যের চম্বল নদীর তীরে 'দিহার' নামক একটি শহর আছে। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ক্ষণে সেখানকার রাজা তাঁর প্রাসাদের ছাদে বসা ছিলেন। তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন আকাশের চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এরপর আবার একত্রিত হলো। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটি সম্পর্কে দেশের পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করলেন। তারা বললেন, 'আমাদের ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আরব দেশে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা প্রকাশ পাবে।' এটা জানার পর রাজা একজন দূত মক্কা মুয়াজ্জমায় হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করলেন। সাথে সাথে নিজে মুসলমানও হয়ে গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাজার নাম রেখেছিলেন, আবদুল্লাহ। রাজা আবদুল্লাহর কবর এখন দিহার শহরের বাইরে অবস্থিত। (মো'জেযায়ে রাসূলে আকরাম (বঙ্গানুবাদ), পৃ: ১২০-১২২)

৯. পাহাড়ের কম্পন ও স্থির হওয়া

ইমাম বুখারী রিওয়ায়েত করেন, একদা এক পাহাড়ের উপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। হঠাৎ পাহাড়ে কম্পন শুরু হয়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পা মুবারক দ্বারা সজোরে পাহাড়ের উপর আঘাত হেনে বললেন, "হে পাহাড়! কম্পন করো না, তুমি কি জানো না তোমার উপর অবস্থান করছেন একজন নবী, একজন সত্যবাদী ও দু'জন শহীদ?" আল্লাহর কুদরতে

পাহাড়ের কম্পন সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল। এখানে দু'টি মু'জিযা একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথমত পাহাড়ের কম্পন ও স্থির হওয়া এবং দ্বিতীয়ত হযরত উমর ও হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার শাহাদাতবরণের ভবিষ্যদ্বাণী।

১০. খর্জুর শাখার ক্রন্দন

এই মু'জিযাটির বর্ণনা সহীহ বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ আছে। ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মসজিদে নববীর মধ্যে তখনও কোনো মিহরাব নির্মিত হয় নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খর্জুর বৃক্ষের একটি শাখার মধ্যে হেলান দিয়ে জুমু'আর খুতবা প্রদান করতেন। এরপর তিনি একটি মিহরাব তৈরী করলেন। প্রথমদিন নবনির্মিত মিহরাবে আরোহণ করে খুতবা প্রদানের সময় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামসহ সকলে শুনতে পেলেন ঐ খর্জুর শাখাটি শিশুদের মতো করুণ সুরে ক্রন্দন করছে! পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাখাটির কাছে যেয়ে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে একে সান্ত্বনা দান করলেন। শাখার ক্রন্দন তখন থেমে গেল।

সুফিদের আদর্শপুরুষ

এই গ্রন্থে আমরা তাসাওউফ-শাস্ত্রপন্থী তথা সুফি-দরবেশ-অলিদের জীবনালোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও কর্মের উপর উপরে বর্ণিত আলোচনায় স্বভাবতই তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা জরুরী ছিলো। তিনি ছিলেন সমগ্র মানব ও জিন জাতির জন্য পথপ্রদর্শন এবং সর্দার। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যার উপর তিনি আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত নন। তবে আমাদের গ্রন্থের মূল বিষয় তথা তাসাওউফ শাস্ত্রেরও উৎপত্তিস্থল তাঁরই পবিত্র জীবন থেকে উৎসারিত। এই শাস্ত্র যা কিছু শিক্ষা দেয়, তা সবই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আ'মল থেকে উদ্ভুত।

সুফিরা যেসব গুণাবলী অর্জনের জন্য জীবনভর সাধনা করে থাকেন তার সবই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর অন্যতম দিক ছিলো। তিনিই প্রথম পুরুষ যার মধ্যে একই সাথে ইখলাস, তাওবাহ, মুহাব্বাত, শাওক (আগ্রহ), খাওফ

(খোদাভীতি), রাজা (আল্লাহর রাহমাতের আশা), যুহদ (দুনিয়ার জাঁকজমক থেকে উদাসীন), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা), কিনাআত (অল্পেতুষ্টি), হিলম্ (সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্যতা), সবর (ধৈর্য), শুকুর (কৃতজ্ঞতা), সিদক্ব (দৃঢ়তা), রেজা (সন্তুষ্টি), ফানা (আল্লাহতে বিলীন), ফানাউল ফানা (আল্লাহতে বিলীনের মধ্যে বিলীন) ইত্যাদি যাবতীয় গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল। এক কথায় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন 'ইনসানে কামীল' - পুর্ণাঙ্গ আদর্শ পুরুষ। সুতরাং একমাত্র তাঁর অনুসরণের মধ্যেই মানুষের ইহ-পরকালের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত।

সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পবিত্র নৈকট্যে বেশী উপকৃত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হযরত উসমান ইবনে আফফান, হযরত যায়িদ বিন হারিসা, হযরত আনাস ইবনে মালিক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত আবু যর গিফারী, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আমর ইবনে আস, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন প্রমুখ মহাত্মনের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মহিলা সাহাবীরা তো ছিলেনই। বিশেষ করে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রাত্মা স্ত্রীরা যে কতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না নারী ছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। ভাগ্যবান এসব পুরুষ ও নারীরা সকলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুদৃষ্টি, দু'আ, আধ্যাত্মিক উষ্ণতা, তাওয়াজ্জুহ ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা-বান্দী ও ওলি-ওলিয়্যাতে রূপান্তর হয়েছিলেন। আর এদের নৈকট্যে ও সুদৃষ্টিতে যারা উপকৃত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন তাবিঈগণ।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নকশবন্দিয়া সুফি তরীকার মূলে ছিলেন খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবুব বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনার দিকে মনোনিবেশ করছি।

খলিফাতুর রাসূলুল্লাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

ওফাৎ ১৩ হিজরি, সমাধি- মাজার শরীফ- মদীনা মুনাওয়ারাহ।

সকল যুগের সকল মানুষের সর্দার, সকল তরীকার মূল মানবকুল শ্রেষ্ঠ মহামানব খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আধ্যাত্মিক গুপ্তধন প্রতিস্থাপিত হয় ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সীনায়। ঠিক যেমনটি প্রতিস্থাপিত হয়য়েছিল চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবি তলিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সীনায়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কথা স্বয়ং রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى

-"অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে। এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।"[আল-লাইল: ৫-৭; ১৭-২১]

ইবনে যাওজি বলেন, সকল মুসলিম গবেষক ও সাহাবায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, উপরোক্ত আয়াতমালায় আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁকে লোকজন 'আতিক্ব' তথা সর্বাধিক পরহেজগার বলে সম্বোধন করতো। তিনি ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম। সূরা আযহাবের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

-"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রাহমাতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।" [৩৩:৫৬]

আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ আয়াত শ্রবণ করে জানতে চাইলেন তিনিও কী এই আশীর্বাদের মধ্যে সামিল আছেন? সাথে সাথে আয়াত নং ৪৩ নাযিল হলো:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ * وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

-"তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রাহমাতের দোয়া করেন- অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোতে বের করার জন্য। তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।"[৩৩: ৪৩]

ইবনে আবি হাতিম বলেন, সূরা আর-রাহমানের আয়াত নং ৪৬ আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে। যথা:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

-"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি উদ্যান।" [৫৫:৪৬]

আল্লাহ তা'আলা হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কথা অন্য একটি স্থানে সরাসরি বলেছেন:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا * فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى * وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا * وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

-"যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন। যখন তাকে কাফিররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন তখন তিনি আপন সঙ্গীকে [আবু বকরকে] বললেন, বিষণ্ন হয়ো

না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত: আল্লাহ কাফিরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [তাওবাহ: ৪০]

শুধু কুরাআন শরীফে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কথা উল্লেখিত হয় নি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আসহাবে কিরামও তাঁর প্রশংসা করেছেন।

জন্ম

আসহাবে ফীলের ঘটনার আড়াই বছর পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের ডাক আসার পূর্বেই মক্কা শহরের ১০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু। পরিণত বয়স থেকেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত ছিলেন। বেশ ধন-সম্পদের মালিক হোন। বিদ্যা-বুদ্ধি, সততা, আচার-আচরণে, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য তাঁকে সবাই শ্রদ্ধ করতো। কবিতা আবৃত্তিতেও তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তবে ইসলামগ্রহণের পর তিনি আবৃত্তি ছেড়ে দেন। জীবনেও তিনি মদ পান করেন নি।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের বছরখানেক আগে থেকেই হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করেন। তিনি ছিলেন হযরতের বন্ধুজন।

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই হযরত আবু বকরকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য দাওয়াত দেন। সাথে সাথেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে পাল্টা কোনো প্রশ্নই করেন নি। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, সে-ই প্রথমে কিছুটা সিদ্ধান্তহীনতা,

সন্দেহ বা ভাবনা-চিন্তা করেছে। কিন্তু যখন এই দাওয়াত আবু বকরকে দিয়েছি, তিনি বিনাপ্রশ্নে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন"।[2]

তাসাওউফের ইমাম

হযরত দাতা গঞ্জেবখশ রাহিমাহুল্লাহ 'কাশফুল মাহজুব' গ্রন্থে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে তাসাওউফের ইমাম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। একটি হাদীসে আছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে এমন কিছু ঢেলে দেন নি যা আমি আবু বকরের অন্তরে ঢেলে দিই নি।"[3]

কাশফুল মাহযুবে আরো আছে: হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে সর্বাধিক সুন্দর কথা বলেছেন হযরত আবু সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু: পবিত্র তিনি যিনি তাঁর সৃষ্টিকে তাঁকে সত্যিকার অর্থে জানার কোনো উপায় শিক্ষা দেন নি- শুধুমাত্র [শিক্ষা দিয়েছেন] তাঁকে জানার ক্ষেত্রে হতাশা।"

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'ইযালাতুল খাফা' গ্রন্থে লিখেছেন: হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হৃদয় শুদ্ধিকরণকে আজকের যুগে আমরা 'তরীক্বাহ' বলি।

নামকরণ

তাঁর আসল নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে আবি কুহাফা। তাঁর পিতার নাম ছিলো উসমান আবু কুহাফা ও মাতার নাম সালমা- তিনি উম্মুল খাইর নামেও পরিচিত ছিলেন।

---

[2] সিরাতুস সিদ্দীক, মাওলানা হাবিবুর রহমান শিরওয়ানী।

[3] সিরাতুস সিদ্দীক।

তিনি সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের সন্তান ছিলেন। কুরাইশরা ব্যবস্যা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরিণত বয়সে হযরত আবু বকর ব্যবসা-বাণিজ্যে শহরের বাইরে যেতেন। কুরাইশ গোত্রপতিরা তাঁকে সম্মান করেতো।

প্রাথমিক জীবন

মক্কা শহরের একজন দয়াবান, ধনী ও সম্মানী ব্যক্তি হিসেবে আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সুপরিচিতি ছিলো। তিনি গরীব-দুঃখি ও অনাথদের পাশে দাঁড়াতেন। মানুষকে সর্বদা সুপরামর্শ দিতেন। যে মুহূর্তে ইসলামের আলো জ্বলে ওঠলো, তিনি আয়েশি জীবন পরিত্যাগ করেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত পেয়ে সাথে সাথে কবুল করে নিলেন।

প্রাথমিক দিনগুলোতে কুখ্যাত কুরাইশ মুশরিকরা নও-মুসলিমদের ওপর শারীরিক, মানসিক, আর্থিক চরম নির্যাতন করে। বিশেষকরে গরীব, ক্রীতদাত-দাসীদের ওপর চরম শারীরিক নির্যাতন করে তাদের জীবননাশ করার এক ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়। এসময় আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু অনেক ক্রীতদাসদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহ আনহুকেও নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে এভাবে বাঁচিয়েছিলেন। আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বিরাট সম্পদের প্রায় সবটুকুই ইসলামের খেদমেত উৎসর্গ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: “আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন সেদিন তাঁর গৃহে চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিলো। এরপর মদীনায় হিজরত করার সময় তাঁর কাছে মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিলো। তিনি বাকি সব দিরহাম মুসলিম ক্রীতদাস ক্রয় করে মুক্তি দান ও ইসলামের জন্য খরচ করেন।” আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কন্যা ও উম্মুল মু’মিনীন হযত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন: “আমার পিতা সাতজন গোলামকে মুক্ত করেন। এদের প্রত্যেককে কুরাইশ মুশরিকরা চরমভাবে নির্যাতন করেছে।”

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাদকা প্রদানের চিত্র হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়। তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদকা করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন। আমি ভাবলাম এবার আবু বকরকে পরাজিত করে ছাড়বো। সুতরাং আমার সম্পদের অর্ধেক সদকা হিসেবে নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "হে উমর! পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে আসলে?" জবাবে বললাম, 'যা এনেছি তার অর্ধেক রেখে এসেছি।' এরপর আবু বকর আসলেন। তিনি সবকিছু নিয়ে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু বকর! পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে আসলে?" তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।" আমি বললাম, 'আমি কখনো তাঁকে ছাড়িয়ে অগ্রসর হতে পারবো না।'"[4]

সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানবান ব্যক্তি

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের জীবদ্দশায় কে ফাতওয়াহ দিতেন? তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর ও উমর। অন্য কেউ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।"[5]

হাফিজ ইবনে কাছির বলেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন সর্বাধিক স্পষ্টভাষী ও বাগ্মী পুরুষ। তাঁর তীক্ষ্ম জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার পরিচয় পাওয়া যায় একটি হাদিস থেকে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আলাইহি বর্ণনা করেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বললেন, 'আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার সম্পদ কিংবা তাঁর নিকট সংরক্ষিত আখিরাতের নিয়ামত গ্রহণ করার মধ্যে একটি বেছে নিতে বললেন। বান্দা পছন্দ করলো আল্লাহর নিকট যা আছে তা-ই'। একথা শুনে হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাঁদতে লাগলেন। একমাত্র তিনিই

---

[4] সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযি।

[5] তাহজিব, ইমাম নববী।

বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, যে বান্দার কথা এখানে উদ্দেশ্যে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।" [বুখারি, মুসলিম]

হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বংশ পরিচিতির ক্ষেত্রেও সবার অগ্রগামী ছিলেন। বিশেষকরে কুরাইশ বংশের সকলের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি ছিলেন সর্বাধিক নামকরা স্বপ্নের তাবিরদাতা। বিখ্যাত তাবিরদাতা ইবনে সিরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "এই উম্মার সর্বাপেক্ষা দক্ষ স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআনের হাফিজ ছিলেন।[6] তিনি খুব সুন্দরভাবে সহীহশুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ থাকাবস্থায় তাঁকেই নামাযে ইমামতির অনুমতি দিয়েছিলেন। হাদিস শাস্ত্রের উপরও তিনি দক্ষ ছিলেন। হুজুরে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের মাত্র ২ বছর পর হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা কম হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী ব্যক্তি

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলামগ্রহণের পর থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ছাড়েন নি। তিনি সুখে-দুঃখে, শান্তি ও যুদ্ধে সর্বদা আল্লাহর রাসূলের সাথী ছিলেন। তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। একমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ছাড়া কোথাও যেতেন না। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতোটি যুদ্ধে নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন- ততোটিতে হযরত আবু বকরও অংশগ্রহণ করেন।

আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাহস কী পরিমাণ ছিলো তার বর্ণনা দিয়েছেন শের-ই খোদা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি লোকদেরকে প্রশ্ন

---

[6] তাহজিব।

করলেন, "বলো তো, মানুষের মধ্যে সবেচেয়ে সাহসী কে?" লোকজন জবাব দিলো, "আপনি"। তিনি বললেন: "আমি- না, বলো, মানুষের মধ্যে কে সর্বাধিক সাহসী?" এবার সবাই বললো, "আমরা জানি না- আপনি বলুন।" তিনি বললেন, "তিনি হচ্ছেন আবু বকর। জঙ্গে বদর দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়া দানের জন্য একটি ছাউনি তৈরি করি। এরপর আমরা ঘোষণা করলাম, আল্লাহর রাসূলকে কোন্ ব্যক্তি পাহারা দেবেন যাতেকরে মুশরিকদের কেউ তাঁকে আক্রমণ করতে না পারে? আল্লাহর কসম! কেউ কিছু বলার পূর্বেই আবু বকর তরবারি উন্মুক্ত করে রাসূলের মাথা মুবারকের ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। সুতরাং তিনিই হচ্ছেন সবেচেয়ে সাহসী ব্যক্তি।"

তিনি আরো বলেন, "আমি দেখেছি কুরাইশরা যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে [মক্কা শরীফে] জড়িয়ে ধরে বললো, 'আপনিই কী সেই ব্যক্তি যিনি অনেক প্রভুকে এক প্রভু দ্বারা স্থলাভিষিক্ত করেছেন?' আমরা কেউই এগিয়ে যেতে পারি নি- কিন্তু আবু বকর ছুটে গিয়ে প্রথম জনকে ফেলে দিলেন, দ্বিতীয় জনকে আটকে রাখলেন ও আরেক জনকে ছুড়ে মারলেন। তারপর বললেন, "তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা কী এক জনকে হত্যা করবে এই কারণে যে, তিনি বলেন, 'আমার প্রভু আল্লাহ'?" এটুকু বলে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। এরপর বললেন: "আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি, আল্লাহর কসম! ফিরওয়ানের সমস্ত মানুষের ঈমান বেশি না হযরত আবু বকরের ঈমান বেশি?" লোকজন নীরব রইলো। তিনি বললেন: "তোমরা কেনো জবাব দিচ্ছ না? আল্লাহর কসম! আবু বকরের এক ঘন্টাকাল ফিরওয়ানের সকল লোকের হাজার ঘন্টার চেয়েও উত্তম। তিনি তাঁর ঈমানকে লুকিয়ে রাখতেন, আর এ লোকটি ছিলো [নিজের কথাই বলছিলেন] যে তার ঈমানকে উন্মুক্ত করে।"[7]

বিনয় ও ধৈর্যশীলতা

হযরত আবু সালিহ গিফারী বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদীনা শরীফের শহরতলীতে বসবাসকারী একজন অন্ধ বৃদ্ধা মহিলাকে দেখাশোনা করতেন। তিনি

[7] মুসনাদে আহমদ, বাযজার।

রাতের বেলা তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি মহিলাকে পানি পান করতে দিতেন ও তাকে কাজকর্মে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু সময় সময় তিনি লক্ষ্য করতেন যে, তাঁর উপস্থিতির পূর্বেই অন্য কেউ এসে এ কাজগুলো করে যাচ্ছে। এক রাত তিনি একটু দূরে থেকে অপেক্ষা করতে থাকেন ঐ দ্বিতীয় লোকটি কে তা জানার জন্য। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, সে ব্যক্তিটি আর কেউ নয়- হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি তখন খলিফাতুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে দেখে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু মন্তব্য করলেন: "আপনি, আবার! হে আমার তুচ্ছ জীবন!"

ইমাম আসাকির লিখেছেন, হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু খিলাফত লাভের পর দাসী মেয়েরা দলে দলে তাঁর নিকট বকরিসহ যেতো। তিনি বকরিগুলো থেকে দুগ্ধ দহন করে দিতেন।

ইমাম আসাকির আরো লিখেছেন: যখনই কেউ হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর প্রশংসা করতো তিনি সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নিজের চেয়েও বেশি চিনেন। আর আমি নিজেকে তাদের থেকেও বেশি চিনি। হে প্রভু! তারা যা ভাবে তার থেকেও আমাকে উত্তম করুন। আর তারা যা জানে না, তা থেকে আমাকে ক্ষমা করুন। তারা যা ভাবে সেটা করার জন্য আমার ওপর দায়িত্ব দেবেন না।"

ইসলামের প্রথম খলিফা

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আনসার ও মুহাজিরীনের মতৈক্যে হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। তাঁকে সম্বোধন করা হতো 'খলিফাতুর রাসূল' বলে। তিনিই যে নবীজীর ইন্তিকালের পর প্রথম খলিফা হবেন সে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। একটি হাদিসে আছে: "মসজিদে কোনো গলি যেনো না থাকে শুধুমাত্র আবু বকরের গলি ছাড়া।"[৪]

---

[৪] বুখারি, মুসলিম।

হযরত হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত অন্য এক হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আমার পর দুজনের নেতৃত্ব মেনে নেবে, আবু বকর ও উমরের।"[9]

হযরত মুহাম্মদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত'ইম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা এক মহিলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি প্রশ্ন করতে চাইলো। তিনি বললেন, পরে এসো। মহিলা বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে [অর্থাৎ ওফাতের পর] কার নিকট আসবো? তিনি জবাব দিলেন, "তুমি যদি আমাকে না পাও তাহলে আবু বকরের নিকট এসো।"[10]

ইমাম আসাকির লিখেছেন, হযরত হাসান বসরিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর রাসূল আবু বকরকে খলিফা নির্বাচিত করে গিয়েছিলেন কী? তিনি জবাব দিলেন, "তোমার পিতা কতল হোক! কোনো সন্দেহ আছে কী? কসম আল্লাহর, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই! তিনি অবশ্যই আবু বকরকে খলিফা নির্বাচিত করে গিয়েছিলেন। আর তিনিই ছিলেন আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানবান এবং তাঁর সর্বাধিক অনুগত বান্দা।"

ইসলামের জন্য তাঁর অবদান

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই দ্বীন ইসলামের জন্য নিজের জান-মাল কুরবান করেছিলেন। তাঁর খিলাফত মাত্র দুবছর স্থায়ী ছিলো। এসময় তিনি মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরই জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে গোত্রপতিরা একরূপ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অনেকে যাকাত আদায়ে

[9] তিরমিযি, হাকিম।

[10] বুখারি, মুসলিম।

অস্বীকৃতি জানায়। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় একাধিক মিথ্যা নবী দাবিদারদের আবির্ভাব ঘটে। আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসব বিদ্রোহ ও নবী দাবীদারদের কঠোর হাতে দমন করেন। তিনি প্রথমে উসামা বিন জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ইসলামবিরোধীদের সঙ্গে মুহাজিদ বাহিনী প্রেরণ করেন। এরপর মুসাইলমা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিক ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী মুসাইলমাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এসব যুদ্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর শক্তিশালী নেতৃত্ব ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত উমর, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, উসমান ইবনে আফফান ও আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহুর মতো নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের কেউ কেউে এতো তাড়াতাড়ি যুদ্ধে না যাওয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকেন। যদি এ সময় তাঁর পক্ষ থেকে কোনো ধরনের নমনীতা দেখা যেতো তাহলে মুসলিম ঐক্যে অঙ্কুরেই বিরাট ফাটল ধরতো। হযরত আবু বকরের দৃঢ়তার ফলে পরবর্তীতে উমরা ইবনে খাত্তাবের খিলাফতকালে মুসলমানরা পারস্য, বিজান্টিন ও মিশর বিজয় করেন।

কুরআন শরীফ সংরক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণ

হযরত জায়িদ বিন তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: ‘‘ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক [যাদের মধ্যে কুরআনের হাফিজও ছিলেন] শহীদ হন। হযরত আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখি সেখানে উমরও বসে আছেন। আবু বকর আমাকে বললেন, ‘‘উমর আমার নিকট এসে বলছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের হাফিজদের মধ্যে অনেকেই শহীদ হয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রেও আরো হাফিজ মারা যেতে পারেন। এতেকরে কুরআনের বেশ বড়ো অংশ হারিয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, আপনি কুরআন সংগ্রহ করার নির্দেশ দিন।’’ আমি [আবু বকর] উমরকে বললাম, ‘‘আল্লাহর রাসূল যা করেন নি তা আমি কিভাবে করবো?’’ উমর জবাব দিলেন, ‘‘কসম আল্লাহর! এটা ভালো কাজ।’’ উমর এ ব্যাপারে আমাকে বার বার আবদার করার পর আল্লাহ তা’আলা আমার হৃদয়কে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং উমরের উপদেশকে আমি গ্রহণ করে নিয়েছি।’’

এরপর আবু বকর আমাকে বললেন, "তুমি একজন জ্ঞানবান যুবক। আর আমরা তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত মনে করি। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন ওহিলেখকও ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআনের লিখিত বিভিন্ন অংশ খোঁজ করে সংগ্রহ করো।" বর্ণনাকারী হযরত জায়িদ বিন তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, কসম আল্লাহর! তাঁরা যদি আমাকে কোনো পাহাড় উত্তোলনের নির্দেশ দিতেন তবুও তা কুরআন সংগ্রহের তুলনায় পাতলা হতো। আমি তারপর আবু বকরকে বললান, "রাসূলুল্লাহ যে কাজ করেন নি, তা আপনি কীভাবে করবেন?" আবু বকর বললেন, "কসম আল্লাহর! এ কাজটি উত্তম।" তিনি এ কাজটি আঞ্জাম দিতে আমাকে বার বার বলার পর আল্লাহ তা'আলা আমার হৃদয়কে প্রশস্ত করে দিলেন- ঠিক যেরূপ তিনি আবু বকর ও উমরের হৃদয়কে প্রশস্ত করেছেন। সুতরাং আমি কুরআন সংগ্রহে অনুসন্ধান চালালাম। গাছের পাতা, পাতলা শ্বেত পাথর ইত্যাদিতে লিখিত আয়াতমালা সংগ্রহ করলাম। এছাড়া লোকের অন্তরে সংরক্ষিত আয়াতগুলোও একত্রিত করলাম। সর্বশেষ যে আয়াতগুলো পাই তা ছিলো খুজাইমা আসনারীর নিকট সংরক্ষিত, সূরা তাওবার কয়েকটি আয়াত। আমি আর কারোর নিকট থেকে কিছু সংগ্রহ করি নি। এই আয়াতগুলো হলো:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

-"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।"। [৯:১২৮] ... এবং সূরার শেষ পর্যন্ত।

এই পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিলো। এরপর হযরত উমরের নিকট তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এবং সবশেষে তাঁর মেয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট কুরআনের এই পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিলো।"[11]

---

[11] বুখারি।

কিছু ঘটনা ও মূল্যবান উপদেশবাণী

১. একদিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবাকে প্রশ্ন করলেন: "তোমাদের মধ্যে আজ কে কে রোযা রেখেছো?"

হযরত আবু বকর বললেন: "আমি রেখেছি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন: "কে যানাজায় শরীক হয়েছে?"

হযরত আবু বকর বললেন: "আমি শরীক হয়েছি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন: "কে ভূখাদের খাবার দিয়েছ?"

হযরত আবু বকর বললেন: "আমি দিয়েছি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন: "কে রোগিকে দেখে এসেছো?"

হযরত আবু বকর বললেন: "আমি দেখে এসেছি"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন: "যে কেউ এসব গুণের অধিকারী, সে হচ্ছে জান্নাতবাসী।"[12]

২. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কালিমা তায়্যিবাহ বেশি বেশি জপতে থাকো ও আল্লাহর কাছে তাওবাহ করো। শয়তান বলে, 'আমি মানুষকে গুনাহের মাধ্যমে ধ্বংস করেছি। কিন্তু তারা আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও তাওবা দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি যখন দেখলাম এগুলো দ্বারা তারা আমাকে শেষ করে দিচ্ছে তখন আমি তাদেরকে অতি আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ধ্বংস করতে থাকি- যদিও তারা জানতো সামনে কী আছে।"[13]

৩. হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: "আমরা তাক্বওয়ার মধ্যে ধর্মানুরাগ, প্রত্যয়ে সম্পদ ও বিনয়ের মধ্যে সম্মান আবিষ্কার করেছি।"

---

[12] সিরাতুস সিদ্দীক।

[13] শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর ইযারাতুল খাফা থেকে, খ.২, পৃ. ৬৫।

৪. তিনি বলেন: "হে লোকসকল! আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করো। যদি কাঁদতে অপারগ হও তবে কাঁদার ভান করো।"

৫. তিনি বলেছেন: "অন্য কোনো মুসলমানকে নীচ ভেবো না। করণ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নীচ মুসলমানও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে।"

৬. হযরত বলেন: "আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। এতে তুমি উভয় জগতে আয়েশ পাবে।"

৭. একদিন শিকার করা একটি পশু তাঁর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি মন্তব্য করলেন, "যখনই কোনো শিকার মারা হয় কিংবা বৃক্ষ কাটা হয়, তখনই এগুলো আল্লাহর জিকির পাঠ করা বন্ধ করে দেয়।"

৮. একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, একটি পাখি গাছের ছায়ায় বসে আছে। তিনি একটি দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বললেন, "শুভেচ্ছা হে পাখি! তুমি গাছের ফল খাও, এর ছায়ায় বসো আর রোজ কিয়ামতে বিনাপ্রশ্নে তুমি মুক্তি পাবে। হায়! যদি আবু বকরও তোমার মতো হতো!"

৯. খলিফা থাকাকালে একদা তিনি একদল সৈন্য শামে [সিরিয়ায়] প্রেরণ করেন। বিদায়ক্ষণে তিনি বেশ কিছুদূর সৈন্যদের সাথে গেলেন। সৈন্যরা মন্তব্য করলো, "হে খলিফাতুর রাসূলুল্লাহ! আপনি পায়দল হাঁটছেন আর আমরা অশ্ব ও উটে আরোহণ করে অগ্রসর হচ্ছি!" তিনি বললেন: "আমি পায়ে হেঁটে নিজের গুণাহকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমার পা-যুগল আল্লাহর রাস্তায় হাঁটছে।"

১০. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: "যে কেউ আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ নিয়েছে সে কখনো দুনিয়া লাভের ইচ্ছা করবে না এবং মানুষের প্রতি ঝুঁকে থাকা থেকেও মুক্ত থাকবে।"

তাঁর জীবনাবসান

শারীরিকভাবে খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু খুব বেশি শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁর বয়স যখন ৬৩ বছর তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ ১৫ দিন যাবৎ প্রচণ্ড জ্বরে তিনি দুর্বল হয়ে গেলেন। এরপর তিনি অতি নিকটে থাকাসত্ত্বেও মসজিদে যেয়ে নামাযও আদায় করতে পারলেন না। সবাই তাঁকে অনুরোধ করলো ডাক্তারকে ডেকে পাঠানোর জন্য। তিনি উত্তর দিলেন: "ডাক্তার আমাকে দেখেছেন ও পরীক্ষা করেছেন। তিনি আমাকে দেখে যা বললেন তাহলো, তিনি যিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন।"

মৃর্তুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ৭ জুমাদিউল আখিরাহ ১৩ হিজরি এ মায়াবী পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের কবর মুবারকের পাশেই কিছুটা পেছনে তিনি সমাহিত হন।

"প্রিয় বন্ধুর পাশেই শায়িত হলেন প্রিয় বন্ধু।"

নকশবন্দিয়া তরীকার শাজারাহ মুতাবিক পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অন্যতম হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু। আমরা তাই এখন তাঁরই জীবনালোচনার দিকে মনোনিবেশ করছি। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা-বিল্লাহ।

হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ওফাৎ ১৩ হিজরি, সমাধি-মাদাইন, ইরাক।

তাঁর নাম ছিলো সালমান। তিনি আবু আবদুল্লাহ নামেও পরিচিত। তাঁর জন্মস্থান তখনকার পারস্য অঞ্চলে হওয়ায় তিনি সালমান ফারসি নামে সুপরিচিত। শরীফ বংশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যের মারপ্যাঁচে তিনি ক্রীতদাসে পরিণত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের এক ইয়াহুদির নিকট থেকে তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করেছিলেন। হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি ও প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

জন্ম, বাল্য, শৈশব ও যৌবনকাল

পরস্য সম্রাজ্যাধীন বর্তমান ইরানের ইসফাহানের নিকটস্থ জাইয়্যান নামক স্থানে হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্ম হয়। পিতা-মাতা তাঁর নাম রাখেন রুজবেহ। তিনিই ছিলেন প্রথম পারস্যবাসী যিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর পিতামাতা তখনকার পারস্যের ধর্ম 'জরাথ্রুস্ট' অনুসরণ করতেন। এ ধর্মাবলম্বীরা অগ্নিপুজক ছিলো।

পিতার একমাত্র ছেলে সালমানকে নিজের মতো একজন জরাথ্রুস্ট ধর্মজাজক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত সালমানকে এই প্রাচীন ধর্মমতের ওপর লেখাপড়া করতে হয়েছিল। কিন্তু সালমান এই ধর্মমতের প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করতেন না। সত্যিকার ধর্ম কোনটি সে সন্ধানে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন।

একদিন তাঁর পিতা তাঁকে নিজেদের জমিজমা দেখভালের জন্য দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করলেন। ফেরার সময় সালমান একটি চার্চের নিকট দিয়ে আসছিলেন যখন তিনি শুনতে পেলেন উপাসনার সুর। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে দেখা করলেন। তাদের ধর্মমত সম্পর্কে জানলেন। সবকিছু শুনে ও দেখে তিনি অভিভূত হলেন।

বাড়িতে ফিরে পিতার নিকট সবকিছু বললেন। পিতা অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তিনি ছিলেন কট্টর অগ্নিপূজক। কালবিলম্ব না করে সালমানকে লোহার চেইন দ্বারা বেধে রাখলেন।

অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা

খ্রিস্টান পাদ্রী তাঁকে বলেছিলেন, তাঁদের প্রধান পাদ্রী সিরিয়ায় বাস করেন। সালমান লোক মারফতে জানতে পারলেন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে একটি কাফেলা শীঘ্রই রওয়ানা হবে। তিনি অনেক চেষ্টা করে বাধনমুক্ত হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন। সিরিয়ার কাফেলার সঙ্গী হয়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

সিরিয়া পৌঁছুয়ে বড়ো চার্চটি খোঁজে বের করলেন। প্রধান পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। সালমান দীর্ঘদিন এখানে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, যে সত্যের সন্ধানে আছেন তা তিনি পান নি। খৃস্টধর্মেরও অনেক ব্যাপার তাঁর মনঃপুত হলো না। তিনি ভাবলেন আসল সত্য কোথায় পাবো? প্রধান পাদ্রী যখন মৃত্যুশয্যায় সালমান তাঁর নিকট যেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এখন কার খাদিম হবো? পাদ্রী বললেন, তুমি মসুলে যাও। সেখানে একজন বড়ো মাপের ধর্মগুরু আছেন। তুমি তাঁর খেদমত করবে।

সালমান মসুলে এসে ঐ পাদ্রীকে পেলেন বটে কিন্তু তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। কিছুদিন পর তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে সালমান তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমি কোথায় যাবো- কার খিদমাত করবো? এই পাদ্রীও আরেক পাদ্রীর কথা বললেন। তিনি সেখানে যেয়ে কিছুদিন থাকার পর পুনরায় আরেক বড়ো পাদ্রীর সন্ধানে রুমের নিকটস্থ আমুরিয়াহ শহরে যেয়ে উপস্থিত হলেন।

আমুরিয়াহর বিশপ মারা যাওয়ার পূর্বে একদিন সালমানকে বললেন, আরব উপদ্বীপে একজন নবীর আগমন নিকবর্তী। তিনি এমন এক শহরে আসবেন যেখানে থাকবে সবুজে ঘেরা খেজুর গাছ। তিনি সাদকা গ্রহণ করবেন না। তাঁর কাঁধে থাকবে নবুওয়াতের সীল।

এসব কথা শুনে আরবের এই নবীকে খোঁজে বের করতে সালমান ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন। কিন্তু কিভাবে এত দূরে পাড়ি জমাবেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ

সত্যের সন্ধানীকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন। আমানিয়াহ শহরে কালব নামক একটি আরব গোত্র ছিলো। এরা প্রায়ই আরবদেশে বাণিজ্যে যেতো। সালমান তাদেরকে উপযুক্ত টাকা প্রদান করে ভ্রমণ সঙ্গী হতে রাজী করালেন। আরব উপদ্বীপে পৌঁছুয়ে কিন্তু কালব কাফিলা সালমানের সঙ্গে বে-ঈমানী করলো। তাঁকে অল্প মূল্যে এক ইয়াহুদির নিকট বিক্রি করে দিলো। এভাবে পারস্যের উচ্চবংশে জন্মগ্রহণকারী সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ক্রীতদাসে পরিণত হলেন।

তবে আল্লাহর কলা-কৌশল তো আর কেউ বুঝতে পারে না। ক্রীতদাস হওয়ার কারণেই শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুলেন। মালিক ইয়াহুদি সালমানকে তার এক ভাতিজার নিকট বিক্রি করলো। বণি কুরাইজা গোত্রের ভাতিজার একটি খেজুর বাগান ছিলো পরবর্তীতে মদীনা নামে খ্যাত ইয়াসরিবের নিকটে। সালমান সেখানে পৌঁছুয়ে 'সবুজে ঘেরা খেজুর বৃক্ষের শহর' দেখতে পেলেন।

কিছুদিন পরই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে ইয়াসরিবে আসলেন। সালমান বুঝতে পারলেন এই নবীর কথাই তাকে ঐ পাদ্রী অবগত করেছিলেন। হযরতের সাথে দেখা করতে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন। কিন্তু ইয়াহুদি মালিক যাত্রা করতে তাঁকে ছুটি দিলো না। অনেক চেষ্টার পর একদা সালমান নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যেয়ে উপস্থিত হলেন।

সাবাহা হিসেবে মর্যাদা লাভ

বেশ কিছু খেজুর সঙ্গে নিয়ে হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। খেজুরগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো আমি সাদকা হিসেবে দিচ্ছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদকা গ্রহণ করেন না,

বিধায় একটি খেজুরও খেলেন না। এরপর সালমান আরেকদিন আসলেন। এবারও কিছু খেজুর নিয়ে আসলেন। রাসূলের নিকট পেশ করার পূর্বে বললেন, এগুলো হাদিয়া হিসেবে এনেছি। এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরগুলো গ্রহণ করলেন। নিজে খেলেন ও সাহাবায়ে কিরামকে খেতে দিলেন।

এরপর সালমান পেছন দিকে গেলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাঁধ মুবারক থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন। সালমান তখন নবুওয়াতের চিহ্নটি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন, তাঁর সম্মুখেই উপস্থিত আছেন আখিরী জামানার নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি হাটু মাটিতে রেখে নতজানু হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারক চুম্বন করলেন। চোখ বেয়ে পড়তে লাগলো অশ্রু। এরপর সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর দীর্ঘ অনুসন্ধানের কাহিনী বর্ণনা করলেন। অবশেষে সালমানকে মুক্ত করতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আসহাবে কিরামকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বললেন। সুতরাং এভাবেই হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাহাবা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের খিদমাতে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। লোকে তাঁকে প্রশ্ন করতো, "আপনার বংশ পরিচয় কী?" তিনি জবাব দিতেন, "আমি সালমান ইবনে ইসলাম ইবনে আদম!"

খন্দকের যুদ্ধে তাঁর পরামর্শ

মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট কাফির-মুশরিক বাহিনী মদীনা শরীফ আক্রমণের জন্য শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলো। কীভাবে শহরকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষ করা যায় এ ব্যাপারে এক পরামর্শসভা ডাকলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অনেকে অনেক পরামর্শ দিলেন কিন্তু কোনোটিই রাসূলের মনঃপুত হচ্ছিলো না। অবশেষে সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "আমি যখন পারস্যে ছিলাম তখন দেখেছি সৈন্যরা শত্রুদের প্রতিহত করতে গভীর খাল খনন করতো। শত্রুসৈন্য ঘোড়া বা হাতী দিয়ে খাল পার হতে বেগ পেতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। পদাতিক সৈন্যরা খাল পার হতে যেয়ে ভীষণ হতাহতের স্বীকার

হয়েছে। আমরা উপযুক্ত এলাকায় খন্দক বা খাল খনন করতে পারি।” তাঁর এ পরামর্শ সবার পছন্দ হলো। যেদিকে শত্রুসেনারা মদীনা আক্রমণ করবে বলে নিশ্চিত জানা গেলো সেদিকে দীর্ঘ একটি খাল খনন করা হলো। ফলে সত্যিই শত্রু সেনারা আটকে গেলো। তারা কিছুতেই খন্দক অতিক্রম করে আক্রমণ করতে পারলো না। আর খন্দকের ধারণা ছিলো আরব সৈন্যসামন্তের নিকট সম্পূর্ণ অভিনব এক কৌশল। হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পরামর্শে খন্দক খননের ফলে আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন।

হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু সকল প্রধান যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইরাক জয়ের সময় তিনি হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহুর সঙ্গে ছিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কুফা নগরীর গোড়াপত্তনের জন্য।

বিশিষ্ট গবেষক

হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উচ্চ পর্যায়ের গবেষক ছিলেন। তিনি পারস্যের ধর্ম জরাথুস্ট, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে গীভর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। নতুন মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম পারস্য ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: “সালমান হচ্ছেন হাকিম লুকমানের উত্তরসূরী।” হযরত কাব আহবার বলেন, “সালমান জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছুয়েছেন। তিনি যেনো একটি সমুদ্র যা কখনো শুকিয়ে যায় না।”

সুফিদের মতো জীবন

সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু দুনিয়াবিমুখ এক বড়ো মাফের সুফি-দরবেশ ছিলেন। সারাজীবন একটিমাত্র মোটা সুতার জুব্বা পরিধান করেছেন। তাঁকে যখন বাগদাদের নিকটস্থ মাদাইন কিসরার শাসক নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি ৫,০০০ দিরহাম বেতন পেতেন। এর প্রায় সবকুটুই গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। বলতেন, “আমি নিজের রুজি করা টাকা দ্বারা আহার করতে পছন্দ করি।”

বিভিন্ন ঘটনা

১. হযরত আছির ইবনে আবদুল্লাহ বিন আমর বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও খাল খনন করছিলেন। শুনা গেলো একদল আনসার ও মুহাজিরীন হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বিতর্ক করছেন। উভয় দলই দাবী করছিলেন, 'সালমান আমাদের লোক'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, ''সালমান আমাদের মধ্যে একজন, আহলুল বাইআতের অন্তর্ভুক্ত।''[14]

২. ইবনে বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''আল্লাহ তা'আলা আমার চারজন সাহাবাকে ভালোবাসেন। তিনি আমাকেও নির্দেশ দিয়েছেন, আমিও যেনো তাদেরকে ভালোবাসি। এরা হচ্ছেন, আলী, আবুযর, সালমান ও মিক্বদাদ।''[15]

৩. হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, ''হে বনি আবস এর ভাই! জ্ঞানের কোনো সীমা নেই, কিন্তু হায়াত নির্ধারিত। সুতরাং যেটুকু ধর্মজ্ঞান তোমার প্রয়োজন তা আয়ত্ব করে নাও। বাকি যতো জ্ঞান আছে ওগুলোকে উপেক্ষা করলেও সমস্যা নেই।''[16]

৪. হযরত সুলাইমান বিন মুগিরা হুমায়ুন বিন হিলাল থেকে রিওয়ায়েত করেন, হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে একে অন্যের ভাই হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো। পরবর্তীতে হযরত দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু সিরিয়ায় যেয়ে বসতি স্থাপন করেন। অপরদিকে সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বসবাস শুরু করলেন কুফায়। হযরত আবু দারদ্বা স্বীয় ভাই সালমানের নিকট একখানা পত্র লেখেন।

---

[14] অর্থাৎ রাসূলের গৃহের।

[15] সিয়ারুল আমিন নুবালা, খ. ১, পৃ. ৫৩৯-৫৪০।

[16] সিফাতুস সাফওয়াহ, ইবনে যাওজি রাহিমাহুল্লাহ, খ. ১, পৃ. ৫৪৯।

সালাম শেষে তিনি লিখলেন: "আমরা দুজন আলাদা হওয়ার পর আমি সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছেন।"

হযরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উত্তর লিখলেন: "আপনি ভালোই জানেন ভাই, উত্তমতা ও দয়াপরবশ অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির মধ্যে থাকে না। উত্তমতা আছে জ্ঞান ও আত্মসংযমে। বিশেষকরে উপকারী জ্ঞান দ্বারা তুমি উপকৃত হবে। স্থান কাউকে সুফল দান করে না। আমল করো এরূপ, যেনো তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। নিজেকে মৃতদের সঙ্গে তুলনা করো।"[17]

কুল্লু নাফসিন যা-ইকাতিল মাউত

সবাইকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মাদাইন শহরে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আবু উবাইদ বলেন, তিনি ৩৬ হিজরি সনে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। আব্বাস ইবনে ইয়াজিদ বাহরানীর মতে অধিকাংশ মানুষ জানতেন যে, হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৩৫০ বছর জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে ২৫০ বছর বীজিত থাকা সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহ নেই। তিনি হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের একজন শিষ্যকে দেখেছেন।[18] এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই বেশি অবগত।

সত্যের সন্ধানীকে মহান আল্লাহ সত্যের নূর দ্বারা আলোকিত করেছিলেন।

নকশবন্দিয়া তরীকানুযায়ী হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পরে হযরত ক্বাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাহিমাহুল্লাহ হলেন পরবর্তী শায়খ। আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনার দিকে মনোনিবেশ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায়তা করুন।

---

[17] নুবালা, খ. ১, পৃ. ৫৪৮।

[18] তাবাক্বাতে ইবনে সাদ, খ. ৫, পৃ. ১৩৯।

হযরত শায়খ ক্বাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ১০৬ বা ১০৮ হিজরি, সমাধি- আল-কুদাইদ [মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান]।

তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নাতি। তাঁর মাতা ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর। পবিত্র রমজান মাসের এক বৃহস্পতিবার তাঁর জন্ম হয়।

বর্ণিত আছে তিনি নিজেই বলেছেন: "আমার দাদা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হিজরতের সময় সুর গুহায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহির সাথী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পর্যায়ে বললেন: "হে আবু বকর! তুমিতো জীবনভর আমার সঙ্গী আছো এবং অনেক কষ্টও সহ্য করেছো। এখন আমি তোমার জন্য প্রভুর নিকট দুআ করতে চাই।" আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হচ্ছেন আমার রূহ ও অন্তরের গোপন ভেদ। আমার প্রয়োজন সম্পর্কে আমার থেকেও বেশি আপনি অবগত।"

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত মুবারক উত্তোলন করে দুআ করলেন: "হে আল্লাহ! যতোদিন পর্যন্ত আসমানী আইন স্থায়ী থাকবে ততোদিন পর্যন্ত আবু বকরের বংশধরদের মধ্যে আপনি উত্তম ব্যক্তিদের জন্ম দেবেন যারা এই জ্ঞান ও এর গোপন রহস্যের উত্তরাধিকার হবে। তাদেরকে চালিত করুন সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর এবং পথপ্রদর্শক বানাও।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার তত্তাবধানে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম দুআর প্রথম ফসল ছিলেন হযরত ক্বাসিম বিন মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর জন্মের সময় বিখ্যাত সাহাবী হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মিশর বিজয় হয়। হযরতের পিতা মুহাম্মদ বিন আবু বকর

রাদ্বিআল্লাহু আনহু যুদ্ধে শহীন হন। হযরত ক্বাসিম তখনো ছোট্ট শিশু মাত্র। উম্মুল মু’মিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তাঁর এই ইয়াতিম ভ্রাতুষ্পুত্রের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। তিনি তাঁকে অত্যন্ত আদর-যত্নে লালন-পালন করেন।[19]

উম্মুল মু’মিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন জ্ঞানের ফোয়ারা। স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ক্বাসিমকে তিনি মনের মতো শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তুলেন। ক্বাসিম ছিলেন তাঁর নিকট নিজের সন্তানের মতো। ইবনে সাদ লিখেছেন যে, ক্বাসিম রাহিমাহুল্লাহ উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হন। তিনি অচিরেই একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ ইমাম হিসাবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

তাফসিরবিদ ও ফকীহ

মদীনা শরীফের লোকজন তাঁকে আবু মুহাম্মদ বলে সম্বোধন করতেন। লোকজন দলে দলে আসতো তাঁর দরবারে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা শুনার জন্য। এছাড়া মদীনা শরীফের ৭ জন প্রসিদ্ধ ফকীহের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তিনি বেশ কয়েকজন তাবিঈর সাক্ষাৎ লাভ করেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর মতো ব্যক্তি খুব কম ছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু জান্নাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “রাসূলের সুন্নাহর ইত্তিবার ক্ষেত্রে আমি তাঁর থেকে উত্তম কাউকে দেখি নি।” তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আরো বলেন: “ক্বাসিমের মতো ওপর কাউকে আমি দেখি নি, যিনি সুন্নাত সম্পর্কে বেশি অবগত ছিলেন।”

হযরত আবু নুয়াঈম ইসফাহানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ‘হিলিইয়াতুল আউলিয়া’ গ্রন্থে লিখেন: “তিনি [ক্বাসিম রাহিমাহুল্লাহ] মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া আচার-আচরণ ও নীতি-নৈতিকতায় উঁচু স্তরের ব্যক্তি ছিলেন।”

---

[19] তাবাক্বাতে ইবনে সাদ, খ. ৫, পৃ. ১২৯।

ইমাম মালিক রাহামাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, দ্বিতীয় উমর খ্যাত খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ বলেন: "যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমার যুগের খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করতাম ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মদকে।"

উত্তম চরিত্র

হযরত সুফিয়ান সওরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "কিছু লোক হযরত ক্বাসিমের নিকট কিছু সাদকা নিয়ে এলো। তিনি এগুলো বিতরণ করলেন। এরপর তিনি নামায পড়তে গেলেন। এসময় লোকজন তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক কথাবার্ত শুরু করলো। তাঁর পুত্র তাদেরকে বললেন: 'তোমরা ব্যক্তির পেছনে গীবতে লিপ্ত হয়েছো। অথচ তিনি তোমাদের দেওয়া সাদকা বিতরণ করেছেন, নিজে এক কাতরাও নেন নি।' ক্বাসিম রাহিমাহুল্লাহ সাথে সাথে নিজের পুত্রকে থামিয়ে বললেন, 'কথা বলো না, নীবর থাকো!'" তিনি চেয়েছিলেন পুত্রকে শিক্ষা দিতে তাঁকে যেনো সমর্থন না করেন। কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহকে রাজি-খুশি করা। মানুষ তাঁর সম্পর্কে কী বললো বা না- এতে তিনি মোটেই চিন্তিত ছিলেন না।

ইয়াহইয়া ইবনে জায়িদ বলেন, "আমাদের সময়ে মদীনা শহরে হযরত ক্বাসিম থেকেও উত্তম কাউকে আমরা পাই নি।" হযরত আইউব সাক্বতিয়ানী বলেন, "ইমাম ক্বাসিম থেকেও উত্তম কাউকে আমি দেখি নি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি গরীবদের মধ্যে বন্টন করার উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ দীনার রেখে যান। আর এর পুরোটাই ছিলো হালাল উপায়ে উপার্জিত টাকা।"

একদিকে জ্ঞানের সাগর আর অন্যদিকে উত্তম আমল- এ উভয়টি পুরোদমে উপস্থিত ছিলো হযরত ক্বাসিম রাহিমাহুল্লাহর মধ্যে। তিনি তাঁর সুফিতুল্য দাদা প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মতোই ছিলেন। হযরত জুবাইর বলেন, "আবু বকরের বংশের মধ্যে আমি তাঁরই মতো আর কাউকে দেখি নি একামত্র ক্বাসিম ছাড়া।"[20]

---

[20] সিফাকুস সাফওয়াহ, খ. ২, পৃ. ৯০।

হাদিসের উস্তাদ

হযরত ইমাম ক্বাসিম রাহিমাহুল্লাহ হাদিসের উস্তাদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ক'জন হলেন: স্বীয় পুত্র আবদুর রহমান বিন ক্বাসিম, ইমাম শা'বি, সালিম বিন আবদুল্লাহ, ইমাম জুহরী, ইমাম মালিক বিন দীনার প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

নকশবন্দীয়া সিলসিলার ৩৮তম শায়খ হযরত শরফউদ্দীন রাহিমাহুল্লাহ ও ৩৯তম শায়খ হযরত আবদুল্লাহ দাগেস্তানী রাহিমাহুল্লাহ নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন:
যে বছর হযরত ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যু হয়, সে বছর রমজান শরীফের ৩ তারিখ তিনি পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্র করেন। কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছুয়ে যাত্রাবিরতি করেন। সাধারণত হজ্জযাত্রীরা এখানে এসেই থামতেন। হযরত ক্বাসিম রাহিমাহুল্লাহ স্বপ্নে দেখলেন আকাশ থেকে অসংখ্য ফিরিশতা আবতরণ ও আরোহণ করছেন। তাঁদের সবাই অবতরণ করে কুদাইদ অঞ্চল ঘুরে দেখছেন এরপর আবার উপরের দিকে উঠে যাচ্ছেন। ফিরিশতারা নিয়ে আসছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত নিয়ামত। এগুলো তাঁর অন্তরাত্মায় ঢেলে দিচ্ছিলেন। আল্লাহর ধ্যান-ধারণায় হযরতের মন-মানসিকতা পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিলো।

এরপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখলেন। তিনি তাঁকে বললেন, "হে আমার দাদা! এই আসমানী লোকগুলো কারা, যারা অবরোহণ ও আরোহণ করছেন এবং আমার অন্তরকে আল্লাহর ধ্যনে মগ্ন করে দিচ্ছেন?" হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, "যেসব ফিরিশতা দেখতে পাচ্ছো আরোহণ ও অবরোহণ করছেন তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমার কবরের জন্য নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁরা অবিরামভাবে কবরটি পরিদর্শন করছেন। যে মাটির ভেতর তোমার দেহ প্রোথিত হবে সে জায়গাটিকে তারা অবিরতভাবে বরকতপূর্ণ করে দিচ্ছেন। তোমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা এসব ফিরিশতাকে পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন তোমার জন্য প্রার্থনা করতে। হে আমার নাতি! তোমার মৃত্যুর ব্যাপারে তুমি অমনোযোগী

হবে না। এটি অচিরেই উপস্থিত হবে। তোমাকে অবশ্যই প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করবে।”

আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু চলে গেলেন। তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো। তিনি আল্লাহর জিকিরে মত্ত হলেন। মক্কা শরীফ পৌঁছুয়ে পবিত্র হজ্জ পালনে মনোযোগ দিলেন। জিলহাজ্জের ৯ তারিখ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হলেন। এ বছর অনেক সুফি, দরবেশ, আবদাল, ওলিআল্লাহ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ক্বাসিম রাহিমাহুল্লাহ অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করলেন।

দাঁড়িয়ে দুআ করার সময় সবাই শুনতে পেলেন সমগ্র আরাফাতের ময়দান ও এর পাহাড়সমূহ ক্রন্দন করছে। আধ্যাত্মিকভাবে আরাফাতের পাহাড়কে তাঁরা প্রশ্ন করলেন: “তোমরা কেনো এভাবে আহাজারি করছো?” পাহাড় জবাব দিলো: “আমি ও সকল ফিরিশতারা কাঁদছে এজন্য যে, শীঘ্রই পৃথিবী তার একটি স্তম্ভকে হারাতে যাচ্ছে।” তারা আবার জিজ্ঞেস করেন: “এ স্তম্ভটি কোনটি, যেটি পৃথিবী হারাবে?” আরাফাত পাহাড় জবাব দেয়: “ক্বাসিম বিন মুহাম্মদ! পৃথিবীর জমিন আর তাঁর পদচিহ্ন দ্বারা ধন্য হবে না।”

পবিত্র হজ্জ থেকে ফেরার পথে সে-ই কুদাইদ এলাকায় এসে যাত্রাবিরতি করেন। আর এখানেই হযরত অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং পৃথিবীর মায়া ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। কুদাইদেই তার সমাধি অবস্থিত। আয়ানুল হুজ্জাজ গ্রন্থের লেখক বলেন, তিনি ১০৪ কিংবা ১০৯ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ফিরিশতা দ্বারা পবিত্র মাটির গর্তে পবিত্র হওয়া মাটির দেহ স্থান পেলো।

নকশবন্দিয়া সাজারাহ মুবারকে পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত জাফর সাদিক্ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইনশাআল্লাহ! আমরা এখন এই মহাত্মন ওলির জীবনালোচনায় মনোযোগ দেবো। আমরা মহাপ্রভুর দরবারে তাওফিক কামনা করছি।

হযরত শায়খ জাফর সাদিক্ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ১৪৮ হিজরি, সমাধি- জান্নাতুল বাকী, মদীনা মুনাওয়ারাহ।

হযরত জাফর সাদিক্ব রাহিমাহুল্লাহ তাসাওউফ শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতার ওপর জ্ঞানার্জন করেন স্বীয় নানা হযরত ক্বাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর রাহিমাহুল্লাহ থেকে। তিনি ছিলেন তাঁর পীরসাহেব। এছাড়া তাঁর পিতা জয়নাল আবেদীন রাহিমাহুল্লাহও আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ পর্যায়ের শায়খ থাকায়, তাঁর কাছ থেকেও দীক্ষা গ্রহণ করেন।

জন্ম

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে হযরত জাফর সাদিক্ব ৮০ হিজরি [৬৯৯] সনে মদীনা মুনুওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ তাঁর জন্মসন ৮৩ হিজরিও বলেছেন। পিতার দিক থেকে তাঁর উর্ধ্বতম পূর্বপুরাষ ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁর পিতা হচ্ছেন হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছেলে হযরত জয়নাল আবেদিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। অপরদিকে তাঁর মাতা হযরত ফারওয়াহ বিনতে ক্বাসিম বিন মুহাম্মদ হচ্ছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নাতির মেয়ে।

উত্তম চরিত্র ও নেতৃত্ব

হযরত সাদিক্ব রাহিমাহুল্লাহ উচ্চ মর্যাদাশীল পরিবার ও ইসলামী গবেষকদের পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তাঁর স্বনামধন্য দাদা হযরত মুহাম্মদ বাক্বির ছিলেন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ও ফকীহ। ইমাম আবু হানিফাসহ অসংখ্য যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণ ইমাম বাক্বির রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র ছিলেন। সুতরাং জ্ঞানচর্চা ছিলো হযরত জাফর সাদিক্ব রাহিমাহুল্লাহর উত্তরাধিকার। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই যুগের ইমাম হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন। হাফিজ জাহাবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা বলে আখ্যায়িত করেন। ইবনে হিব্বান বলেন, ফিকহ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। আহলে বাইআতের মধ্যে তাঁর চরিত্র-মাধুর্য ছিলো উচ্চ মানের। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ লিখেন, তাঁর নেতৃত্ব ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে সবাই একমত।[21]

---

[21] তাবিঈন, পৃ. ৬৮-৯, তাযকিরাতুল হুফফাজ, খ. ১, পৃ. ১৫০ ও তাহজিবুল আসমা' পৃ. ১৫০ থেকে।

একদা হযরত জাফর সাদিক্ব রাহিমাহুল্লাহ হযরত আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, "বুদ্ধির সংজ্ঞা কী?"
ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, "যা ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয় করে।"
হযরত সাদিক্ব রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "এরূপ পার্থক্যনির্ণয় করার ক্ষমতা তো পশুদের মধ্যেও বিদ্যমান। তারা বুঝতে পারে কে তাদেরকে মারে ও কে তাদেরকে খাবার দেয়।"
ইমাম সাহেব তখন আত্মসমর্পণ করে বললেন, "তাহলে, আপনার মতে বুদ্ধি কী জিনিস?"
তিনি বললেন, "বুদ্ধি হচ্ছে সেটি যা দুটি উত্তম ও দুটি মন্দ জিনিসের মধ্যে ব্যবধান সনাক্ত করতে পারে। এটা দুটি ভালো বস্তুর মধ্যে উত্তমটি বেছে নিতে পারে এবং দুটি ক্ষতিকর বস্তুর মধ্যে বেশি ক্ষতিকর যেটি সেটি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।"[22]

অমূল্য বাণী

১. জ্ঞান হচ্ছে ঢলের মতো, সত্যবাদিতা হচ্ছে শক্তি, অজ্ঞতা হচ্ছে নীচতা, বুঝ হচ্ছে গৌরব, উদারতা হলো সফলতা, উত্তম ব্যবহার দান করে বন্ধুত্ব, নিজের সময় সম্পর্কে জ্ঞানবান ব্যক্তিকে অনিশ্চয়তার আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখে।

২. যে কেউ কোনো ব্যাপারকে জ্ঞান ছাড়া আক্রমণ করে, সে তার নিজের নাক কেটে দিলো।

৩. অবশ্যই জ্ঞান হচ্ছে একটি তালা, আর প্রশ্ন হচ্ছে এর চাবি।

৪. ইলম ছাড়া কোনো আমলই আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না। আর আমল ছাড়া কেনো ইলম নেই। সুতরাং যে জ্ঞানী, তাঁর জ্ঞানই তাকে আমলের দিকে টেনে নেবে।

৫. যে কেউ তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া-আখিরাতে মর্যাদাশীল করবেন।

৬. আমার উত্তম বন্ধু সে-ই, যে আমার ভুল ধরে দেয়।

৭. সব কাজে আল্লাহকে স্মরণ করো। তোমার কাজটি উত্তম হলে বরকত আসবে আর খারাপ হলে তা পরিহার করতে সহায়ক হবে।

৮. হারাম থেকে বেঁচে থাকার নাম পরহেজোগারী।

---

[22] মাশাইখে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া, পৃ. ৭১।

৯. দুনিয়ার ফুর্তি-আমোদ থেকে দূরে না থাকলে তুমি কখনো ঈমানের স্বাদ পাবে না।
১০. একদা তিনি হযরত সুফিয়ান সওরি রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, "যখনই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কোনো নিয়ামত দান করবেন এবং তুমি তা সংরক্ষণ করতে আগ্রহী হবে তখন সর্বদা আল্লাহর শুকুর আদায় করতে থাকবে। কারণ আল্লাহ তাঁর কালামে পাকে বলেছেন, "তুমি যদি কৃতজ্ঞ হও, অবশ্যই আমি তা [নিয়ামত] বাড়িয়ে দেবো।"
১১. যে কেউ অপরের ধন দেখে হিংসা করবে সে গরীব অবস্থায় মারা যাবে।
১২. যে কেউ অন্যায়ভাবে অপরকে অসি দ্বারা আঘাত করতে চাইবে, সেই অসিই তাকে ধ্বংস করবে। যে কেউ অপরের জন্য গর্ত খুড়ে, সে নিজেই ঐ গর্তে পড়ে মরবে।
১৩. অজ্ঞের সঙ্গে বসলে অজ্ঞ হবে, জ্ঞানবানের সঙ্গে বসলে মর্যাদা লাভ করবে।
১৪. ব্যক্তির বুদ্ধি হলো যা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে, তার ধর্ম হলো তার মূল্য এবং তার তাক্বওয়া হলো তার মহত্ত্ব।
১৫. যখন কোনো মুসলমান সম্পর্কে অপ্রীতিকর কিছু তুমি শ্রবণ করবে তখন খোঁজে দেখো এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা মিলে কি না। যদি তা না পাও, তাহলে ভাববে নিশ্চয় এর কোনো উপযুক্ত কারণ আছে। মুসলামনের সব কথা সবসময় ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবে। যদি ভালো কোনো ব্যাখ্যা না মিলে তবে নিজেকেই দোষবে। [অর্থাৎ মুসলমান ভাই সম্পর্কে এতো সহজে ধারণা পাল্টাবে না]

জীবনাবসান

হযরত জাফর সাদিক্ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় জন্মস্থান মদীনা মুনুওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে ১৪৮ হিজরি সনে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। জান্নাতুল বাকি করবস্থানে তাঁর সমাধি অবস্থিত।

রাসূলের বংশের এক উত্তম ব্যক্তি শায়িত হলেন রাসূলেরই শহরে।

নকশবন্দিয়া সাজারাহ মুতাবিক পরবর্তী শাখ হচ্ছেন হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন এই মহাত্মন ওলির জীনবালোচনার দিকে মনোনিবেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

হযরত শায়খ বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ২৩৪ (মতান্তরে ২৬১) হিজরি, সমাধি- বিস্তাম, ইরান।

তাঁর পূর্ণ নাম হলো আবু ইয়াজিদ তাইফুর বিন ঈসা বিন সুরুশান বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তবে তিনি বায়িজিদ বিস্তামী নামেই অধিক পরিচিত। ইরানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এই বিখ্যাত যুগশ্রেষ্ঠ সুফি-দরবেশকে সুলতানুল আরিফিন উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

জন্ম ও শৈশবকাল

হযরত বায়িজিদ বিস্তামীর জন্ম হয় ১৮৯ হিজরি সনে ইরানের বিস্তাম শহরে। তাঁর দাদার নাম ছিলো সুরুশান। তিনি ছিলেন জরাথ্রুস্ট ধর্মাবলম্বী অগ্নিপূজক। সমাজের একজন প্রবাভশালী ব্যক্তি হিসেবে তার সুপরিচিতি ছিলো।

হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহর সমসাময়িক সুফি মাশায়িখদের মধ্যে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম। এছাড়া হাযরত শাক্বিক বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তবে তাঁর নিসবত হয় হযরত জাফর সাদিক্ব রাহমাতুল্লাহি আলাহির সঙ্গে। তিনি ছিলেন হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তরিকতের মুর্শিদ।

বায়িজিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহর বাল্যজীবন সম্পর্কে বেশি জানা যায় নি। অল্প বয়সেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাতা বলেন, আমার পুত্র যখন উদরে ছিলো তখন কোনো সন্দেহযুক্ত খাবার ভক্ষণ করলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম। এই খাবারটুকু ভমি করে বের না করা পর্যন্ত উপায় ছিলো না।

উপরোক্ত কথাগুলোর সত্যতা মিলে হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিজের কথায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: "তরিকতের সালিকের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম কী জিনিস?

জবাব দিলেন: "গর্ভে থাকাকালীন নিরাপত্তা।"

প্রশ্ন: "যদি তা সম্ভব না হয়?"

উত্তর: "একটি সুঠাম দেহ।"

প্রশ্ন: "এটাও যদি না থাকে?"

উত্তর: "একজোড়া মনোযোগী কর্ণ।"

প্রশ্ন: "এটাও না থাকলে?"

উত্তর: "একটি জ্ঞানবান হৃদয়।"

প্রশ্ন: "যদি তা না থাকে?"

উত্তর: "একজোড়া দর্শনযোগ্য চোখ"।

প্রশ্ন: "তা-ও যদি থাকে না?"

উত্তর: "হঠাৎ মৃত্যু!"

শিশু বায়িজিদকে তাঁর মাতা মাদরাসায় পাঠান। তিনি কুরআন শিক্ষা করেন। একদিন তাঁর উস্তাদ সূরা লুকমানের আয়াত:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

-"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।" [৩১:১৪]

-এর ব্যাখ্যা করলেন। আয়াতের কথাগুলো তাঁর হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুললো। তিনি বললেন: উস্তাদ! অনুগ্রহ করে আমাকে এখনই বাড়িতে যেয়ে আমার মাতার সাথে সাক্ষাৎ

করতে দিন।” উস্তাদ তাঁকে ছুটি দিলেন। তিনি দ্রুত বাড়িতে যেয়ে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

মা তাঁকে প্রশ্ন করলেন: “তাইফুর! তুমি কেনো মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফিরলে? কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি?”
আবু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন: “না, না মা, কোনো সমস্যা হয়ি নি। আমি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করেছি যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তাঁর ও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে। আমি কিভাবে একই সাথে দু'টি কাজ করবো? হয় আপনি প্রভুকে বলুন আমি শুধুমাত্র তোমার খিদমাত কবরো, না হয় শুধু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।”
তাঁর মাতা বললেন: “হে আমার পুত্র! আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করলাম। এখন থেকে আমার প্রতি তোমার হক্ক আর থাকলো না। যাও! আল্লাহর হয়ে যাও!”

পরবর্তীতে তিনি বলেন: “ যে কাজ আমি ভাবতাম সবেচেয়ে পেছনের, আসলে তা পূর্বের বলেই প্রমাণিত হলো। এটা ছিলো মাকে খুশি করা। বাস্তবে এটির মধ্যে নিহিত ছিলো বাকি যাকিছুই আমি অর্জন করেছি। এক রাতে আমার মা আমাকে বললেন, আমাকে পানি পান করাও। আমি দ্রুত পানি আনতে চলে গেলাম। দেখলাম জগে কোনো পানি নেই, পানির কলসেও পানি ছিলো না। সুতরাং জগ নিয়ে আমি ছুটে গেলাম নদীতে। জগে পানি ভর্তি করে ছুটে আসলাম মায়ের নিকট। দেখলাম, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঠাণ্ডা রাত। কষ্ট হবে ভেবে আমি তাঁকে জাগাতে চাই নি। সুতরাং জগটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভোর হয়ে গেলো। আমার মা জেগে ওঠলেন। আমাকে দেখে বললেন, পানি এনেছো? আমি তাঁকে পানি পান করালাম। তিনি যখন বুঝতে পারলেন আমি তাঁর পাশে সারারাত পানির পাত্র নিয়ে দাঁড়ানো ছিলাম, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, হে তাইফুর! তুমি কেনো জগটি রেখে ঘুমালে না? জবাব দিলাম, মা গো! আমি ভয় করছিলাম তুমি জেগে ওঠে যদি আমাকে দেখতে না পাও, তখন কী হবে?

আমার আম্মা খুব খুশি হলেন। এরপর তিনি আমাকে আল্লাহর রাস্তায় পাড়ি জমাতে পূর্ণ অনুমতি দান করলেন।

ত্রিশ বছরব্যাপী যাযাবর অবস্থায় ভ্রমণ

বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে দীর্ঘ ত্রিশ বছরব্যাপী তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যাযাবর অবস্থায় ভ্রমণ করেন। এ সময় তিনি কঠোর সাধনা ও অতি অল্প খাবার খেতেন। একাধারে অনেক দিন যাবৎ উপবাসে কাটাতেন। সর্বদা রোজা রাখতেন। এ ভ্রমণে যুগের অনেক মাশাইখে আজমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ নসিব হয়। এক বর্ণনায় জানা যায় তেরো জন সুফি-দরবেশের সুহবত লাভ করে উপকৃত হন। এর মধ্যে একজন ছিলেন মনীদা শরীফের ইমাম হযরত জাফর সাদিক্ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

খেলাফত লাভ ও বিস্তানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ

একদিন হযরত বায়িজিদ তাঁর মুর্শিদ হযরত জাফর সাদিক্ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ শায়খ সাদিক্ব বললেন, “হে আবু ইয়াজিদ! জানালার পাশ থেকে ঐ গ্রন্থটি নিয়ে আসো।”

আবু ইয়াজিদ প্রশ্ন করলেন, “জানালা? কোন্ জানালা হযরত?”

শায়খ বললেন, “কেনো? তুমি এতোদিন যাবৎ আমার এখানে আসা-যাওয়া করছো, অথচ তুমি জানালাটি দেখো নি?

আবু ইয়াজিদ জবাব দিলেন, “না তো! জানালা দেখার সময় কোথায় হযরত? আমি আপনার নিকট আসলে চোখ বুজে বসে থাকি। আমি কোনো দিকেই নজর দেই না। আমি তো পারিপার্শ্বিকর্তা দেখতে আসি নি!”

মুর্শিদ বললেন, “তা-ই যদি হয়, হে আবু ইয়াজিদ! তোমার ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটেছে। তুমি তোমার জন্মস্থান বিস্তামে ফিরে যাও।”

সুতরাং স্বীয় পীরসাহেব কর্তৃক খিলাফত লাভের পর হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় জন্মভূমি বিস্তামে ফিরে আসেন ও তাসাওউফের খিদমাতে মনোনিবেশ করেন।

বিভিন্ন ঘটনাবলী ও বাণী[23]

১. বাইতুল্লাহর প্রতি মর্যাদাবোধ: তাঁকে কেউ বললো, অমুক স্থানে একজন বড়ো মাপের ওলি বাস করেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে দেখতে যাত্রা করলেন। সেথায় যেয়ে দেখলেন ঐ ওলি কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করছেন। এটা দেখে তিনি সাথে সাথে ফিরে আসলেন। বললেন, "এ ব্যক্তির মধ্যে যদি তরিকত সম্পর্কে ন্যুনতম জ্ঞান থাকতো তাহলে তিনি এরূপ অপমানজনক কাজ করতেন না।"

২. মসজিদের প্রতি সম্মানবোধ: তাঁর বাড়ি থেকে মসজিদের দূরত্ব ছিলো চল্লিশ কদম। এটা সবাই জানতো যে, এই চল্লিশ কদমের মধ্যে তিনি কখানো থুথু ফেলেন নি। মসজিদের প্রতি আদব রক্ষার্থে তিনি থুথু ফেলা থেকে বিরত থাকতেন।

৩. আল্লাহর শুকুর: দীর্ঘ ১২ বছর ভ্রমণ করে তিনি বাইতুল্লাহর শহর মক্কা মুকাররমায় যান। এই দীর্ঘ সময় ক্ষেপণের মূল কারণ ছিলো প্রত্যেক লোকালয়ে তিনি রাত্রিযাপন করে দু রাকাআত শুকুরানা নামায আদায় করেন।

৪. প্রভুর সম্মুখে বান্দার অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার মনোভাব: একদা ভ্রমণকালে একটি মাথার খুলি তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি দেখলেন এতে লিখিত আছে: "বোবা, বোকা, অন্ধ- তারা বুঝতে পারে না।" তিনি কাঁদতে লাগলেন। খুলিটি হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন। বললেন, "এই মাথাটি কোনো সুফি দরবেশের হবে যিনি প্রভুর মধ্যে ফানাফিল্লাহ হয়েছিলেন। তার কোনো কান ছিলো না চিরন্তনের বাণী শ্রবণ করার, কোনো চোখ ছিলো না চিরন্তনের সৌন্দর্য দর্শনের, কেনো জিহ্বা ছিলো না প্রভুর প্রশংসা করার, বুঝার কেনো ক্ষমতা ছিলো না। এই আয়াত তো তাঁরই জন্য!"

৫. কারামত প্রকাশ: একদা বোঝাসহ একটি উটকে নিয়ে হযরত বায়েজিদ রাহিমাহুল্লাহ রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। কিছু লোক বলতে লাগলো, "বেচারা উট! কী বিরাট বোঝা তাকে বহন করতে হচ্ছে।" একজন যুবক বললো, "এটা সত্যিই নিষ্ঠুরতা!:

বার বার এসব কথা শ্রবণ করার পর আবু ইয়াজিদ জবাব দিলেন: "হে যুবক! উট তো বোঝা বহন করছে না!"

---

[23] নিচের অধিকাংশ বর্ণনা এসেছে হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহর 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে।

যুবক অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো সত্যিই উটের উপর বোঝাটি ছিলো না। এটা উটের পিঠ থেকে ১ গজ উপরে শূন্যের উপর ভাসছে! সে বললো, সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব এক কারামত!

৬. আত্মগরিমার ভয়: একদা মদীনা মুনওয়ারায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক জিয়ারত শেষে তাঁর নিকট বার্তা আসলো স্বীয় মাতা তাঁকে তলব করেছেন। সুতরাং কাল-বিলম্ব না করে বিস্তামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বিস্তামের লোকজন সংবাদ পেলো হযরত বায়িজিদ দেশে প্রত্যাবর্তন করছেন। শহরের শত শত লোক বেরিয়ে আসলো। উদ্দেশ্য ছিলো হযরতকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগতম জানানো।

এদিকে হযরত বায়েজিদ রাহিমাহুল্লাহ এ খবর পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়লেন। এরূপ স্বাগতম হেতু না নাজি তাঁর মধ্যে কোনো ধরনের আত্মগরিমার উদ্রেক সৃষ্টি হয়ে যায় কী না? অনেক ভেবে তিনি এক ফন্দি আঁটলেন। শহরের উপকণ্ঠে এক স্থানে তাঁর কাফেলা যাত্রাবিরতি করলো। ইতোমধ্যে লোকজন এসে সেথায় হাজির হয়ে হযরতের সাথে মুসাফাহা ও মুআনাকা করতে লাগলো। তিনি নিজের থলে থেকে রুটি বের করে ভক্ষণ করতে লাগলেন। সময়টা ছিলো রমজান শরীফ! দিনের বেলা রুটি খাচ্ছেন দেখে লোকজন ছি ছি করতে লাগলো। সবাই বললো, এ কেমন ওলি! তিনি তো ফরয রোযাও রাখেন না। সবাই তাঁকে ফেলে চলে গেলো।

হযরত সাথীদেরকে বললেন, “তোমরা দেখলো তো? আমি পবিত্র শরঈ একটি নির্দেশনার অনুসরণ করেছি মাত্র। মুসাফিরের জন্য ফরয রোযা রাখাও বাধ্যতামূলক নয়। আমি সেটাই পালন করেছি। আর লোকজন কীভাবে চলে গেলো?” তিনি রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। মধ্যরাতে বাড়িতে এসে মায়ের দরজার সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি শুনলেন তাঁর আম্মা দুআ করছেন: “হে প্রভু! মাশাইখদের হৃদয় আমার সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন। আমার পুত্রের সকল কাজ তোমার সন্তুষ্টির মধ্যে হতে দিন।”

হযরত বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহ কথাগুলো শুনে কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করলেন। এরপর দরজার কড়ায় নাড়া দিলেন। ভেতর থেকে মা জিজ্ঞেস করলেন,

"কে?" তিনি জবাব দিলেন, "তোমার পুত্র।" মা উঠে এসে দরজা খুললেন। তিনি তখন প্রায় অন্ধ। বললেন, "তাইফুর, বাবা! এসেছো। তুমি কী জানো কেনো আমি অন্ধ হয়ে গেছি? আমি তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেছি বাবা! আমার কোমর বাঁকা হয়ে গেছে।" আবু ইয়াজিদ মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আর কখনো তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না মা, কোথাও যাবো না।"

৭. আবু ইয়াজিদ ও ইয়াহইয়া মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা: ইয়াহইয়া মু'আজ পত্র লিখলেন: "ঐ লোকটি সম্পর্কে আপনি কী বলবেন যে এক কাপ সূরা পান করে নিয়েছে এবং তাতে নেশাগ্রস্থ হয়েছে অনন্ত থেকে অনন্তে?"

হযরত বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহ জবাবে লিখলেন: "আমি এটার জবাব জানি না। তবে যা জানি তাহলো, এখানে একজন আছেন যিনি এক রাত ও দিনের মধ্যে সমস্ত মহাসাগরের সূরা পান করার পরও বলেন, আরো দাও! আরো দাও!"

ইয়াহইয়া মু'আজ রাহিমাহুল্লাহ পুনরায় লিখলেন: "একটি গোপন কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছি। কিন্তু বেহেশতে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটার পূর্বে নয়। সেখানে তুবার ছায়ায় বসে বলবো।" পত্রের সাথে এক টুকরো রুটি ছিলো। তিনি আরো লিখলেন: "শায়খ! এটুকু রুটি গ্রহণ করুন। আমি এটি যমযমের পানি দ্বারা বানিয়েছি।"

জবাবে হযরত বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহ লিখলেন: "তুমি যে বেহেশতে সাক্ষাতের কথা লিখেছো, সেখানে তো আমি এখনই ভ্রমণ করে থাকি ও তুবা বৃক্ষের নিচে বসে জিকরুল্লায় নিমগ্ন হই! আর রুটির ব্যাপার হলো, আমি তা গ্রহণ করতে পারি না। তুমি কোন্ পানি দ্বারা এটি বানিয়েছ তা বললেও, সেটা বলো নি কোন্ বীচির গম দ্বারা আটা বনেছে?"

ইয়াহইয়া মু'আজ এবার বায়িজিদ বিস্তামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন। তিনি ইশার নামাযের সময় তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি লিখেন: "আমি শায়খকে তখন অমনোযোগী করতে চাই নি। অথচ, ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করার মানসিকতাও আমার মধ্যে ছিলো না। এরপর জানলাম তিনি বাড়িতে নেই। সুতরাং আমি মরুভূমির মধ্যে চলে গেলাম- যেখানে তাঁকে পাওয়া যাবে বলে লোকজন আমাকে বলেছিলো। এরপর লক্ষ্য করলাম, নামায শেষে তিনি ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত পদাঙ্গুলির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ধ্যানস্থ অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে সেখানে দাঁড়িয়ে

থাকি। সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহূর্তে তিনি হঠাৎ সজোরো বলে ওঠলেন: "এই মাক্বামে উপনীত হতে তোমার নিকট আবদার করায় আমি তোমারই নিকট আশ্রয় কামনা করছি!"

হযরত ইয়াহইয়া এবার সালাম জানিয়ে হযরতকে জিজ্ঞেস করলেন: "এ রাতে আপনার অবস্থার বর্ণনা করুন।"
তিনি জবাব দিলেন: "আমাকে আল্লাহ তা'আলা ২০টিরও অধিক মাক্বাম দান করেছেন। কিন্তু আমি একটিও গ্রহণ করি নি! কারণ এগুলো সবই হচ্ছে পর্দার মাক্বামাত।"

মু'আজ জিজ্ঞেস করলেন: "ইয়া শাইখী! আপনি কেনো আল্লাহকে তাঁর মা'রিফাত লাভের জন্য আবদার করলেন না- যিনি হচ্ছেন বাদশাহদের বাদশাহ। যেহেতু তিনি বলেছেন, "তোমার যা প্রয়োজন আমার কাছে চাও!"
তিনি বললেন: "চুপ থাকো ইয়াহইয়া! তাঁর মারিফাত লাভে আমি নিজের প্রতি হিংসা বোধ করি। কারণ আমি চাই তিনি আমাকে জানবেন- আর কিছু নয়! তাঁকে জানার কী অধিকার আমার আছে? হে ইয়াহইয়া! এটাই তাঁর ইচ্ছে যে, শুধু তিনিই তিনিকে জানবেন অন্য কেউ নয়।"
হযরত মু'আজ বললেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে গত রাতে যেসব উপহার আপনি আহরণ করলেন তার কিছুটা দয়াকরে আমাকে দান করুন।"
হযরত বায়িজিদ বললেন, "তোমাকে যদি আদম আলাইহিসসালামের নির্বাচন ক্ষমতা দেওয়া হয়, জিব্রাঈল আলাইহিসসালামের পবিত্রতা দান করা হয়, মূসা আলাইহিসসালামের মতো বিরহ-ব্যাকুলতা দেওয়া হয়, ঈসা আলাইহিসসালামের মতো নিষ্কলুষতা দান করা হয় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো প্রেমাকাঙ্ক্ষা দেওয়া হয় তবুও তুমি পিপাসামুক্ত হবে না! তুমি আরো চাইবে। তোমার দৃষ্টিকে উচ্চে রেখো- নিচে নামিয়ো না; কারণ যেখানেই তুমি অবতরণ করবে তার দ্বারা তুমি পর্দাবৃত হবে।"
৮. হযরত আবু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর এক শাগরিদ: বিস্তাম শহরে এক বড়ো মাফের সুফি-দরবেশ বাস করতেন। তাঁর নিজস্ব অনেক মুরীদান ছিলেন। তবে তিনি কখনো হযরত বায়িজিদ বিস্তামীর সুহবত পরিত্যাগ করতেন না। তিনি সর্বদা হযরতের বয়ান শ্রবণ

করতেন ও তাঁর সাথীদের সাথে বসতেন। একদিন তিনি হযরত বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, "ইয়া শাইখী! আজ ত্রিশ বছর যাবৎ আমি রোযা রেখে আসছি। রাত্রের নামাযও ছাড়ি নি, আমি ঘুমাইও নি। কিন্তু আজো আপনি যে জ্ঞানের কথা বলেন তার কোনো সন্ধান পেলাম না!"

হযরত বায়িজিদ বললেন, "তুমি যদি ত্রিশ শত বছরও দিনের বেলা রোযা রাখো ও রাতে ইবাদত করো তবুও তুমি এ জ্ঞানের জাররা পরিমাণও সন্ধান পাবে না।"

শাগরিদ প্রশ্ন করলেন, "কেনো, হযরত?"

তিনি বললেন, "তুমি তোমার নিজের পর্দা দ্বারা আবৃত হয়ে আছো- তা-ই।"

শাগরিদ জানতে চাইলেন, "এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?"

তিনি বললেন, "তুমি তা কখনো গ্রহণ করবে না।"

শাগরিদ দৃঢ়ভাবে বললেন, "আমি অবশ্যই গ্রহণ করবো হুজুর! আপনি আমাকে বলুন, আমি তা পালন করবো।"

হযরত বিস্তামী বললেন, "ঠিক আছে তাহলে। এখনই তুমি তোমার মুখের দাড়ি ও চুল মুণ্ডন করো। পরনের কাপড় খুলে ফেল ও বকরির চামড়ার তৈরি বস্ত্র নাভির উপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত পরে নাও। এক থলে বাদাম গলায় লটকিয়ে রাখো। এরপর বাজারে যাও। সকল ছেলেমেয়েদের একত্রিত করে বলো, 'যে কেউ আমাকে চড় মারবে তাকে একটি করে বাদাম দেবো!' সমগ্র শহরব্যাপী এভাবে ঘুরতে থাকবে; বিশেষ করে ওসব জায়গায় যাবে যারা তোমাকে চিনে। এটাই তোমার ঔষধ।"

এ কথাগুলো শ্রবণ করে শাগরিদ বলে ওঠলন: "সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।"

আবু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করলেন, "যদি কোনো কাফির এই বাক্যটি উচ্চারণ করে তবে সে ঈমানদার হবে। অথচ একই বাক্য উচ্চারণ করে তুমি মুশরিক হয়ে গেলে!"

শাগরিদ বললেন, "কীভাবে?"

তিনি বললেন, "তুমি মনে করেছো, আমি যে ঔষধের কথা বলেছি তা তোমার জন্য গ্রহণ করা হবে বেশি কষ্টকর। সুতরাং তুমি একজন মুশরিকে রূপান্তর হয়ে গেলে। তুমি উক্ত বাক্য দ্বারা নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে চেয়েছো- আল্লাহর প্রশংসা এখানে উদ্দেশ্য নয়।"

শাগরিদ বললেন, “আপনি যে পদ্ধতি বলেছেন তা অনুসরণ আমার জন্য সম্ভব নয়। আমাকে অন্য কোনো দিকদির্শেনা দিন।”

হযরত বায়িজিদ বললেন, “আমি যা বলেছি তা-ই তোমার প্রতিকার। অন্য কোনো পথ নেই।”

শাগরিদ আবার বললেন, “আমি এ কাজগুলো করতে পারবো না।”

আবু ইয়াজিদ বললেন, “আমি কি তোমায় প্রথমেই বলি নি যে, তুমি এসব কাজ কখনো করতে পারবে না?”

৯. সাধনার নমুনা: তিনি বলেন: “আমি দীর্ঘ বারো বছর নিজের ক্বলবের কামার ছিলাম। আমি আমার ক্বলবকে আনুগত্যের অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করি। এটি লৌহবর্ণ ধারণ করার পর একে কামারের ভর্ৎসনার নেহাইয়ে রেখে দিলাম। এরপর আত্ন-নিন্দার হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়ে একটি আয়নায় পরিণত করি। দীর্ঘ পাঁচ বছর আমি আমার আয়না ছিলাম। আমি এই আয়নাকে সব ধরণের প্রভুভক্তি দ্বারা পালিশ করেছি। এরপর আরো এক বছর উক্ত আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখি। আমি দেখলাম তখনও আমার কোমরে বাঁধা আছে অবিশ্বাসীদের কোমরবন্ধ! [তাঁর যুগে অবিশ্বাসী মুশরিকদের পরিচিতির জন্য একটি কোমরবন্ধ বাঁধা থাকতো] আরো পাঁচ বছরব্যাপী আমি চেষ্টা-সাধনা করে এই কোমরবন্ধকে খুলে দিলাম। আমি এবার নতুনভাবে মুসলমান হলাম। আমি সকল প্রাণীদের প্রতি তাকালাম। দেখলাম সবাই মৃত। আমি তাদের ওপর জানাযা পড়লাম।”

১০. মসজিদের পবিত্রতার প্রতি সম্মানবোধ: হযরত বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহ যখনই কোনো মসজিদের দরজার সামনে হাজির হতেন তখনই কাঁদতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, “এর কারণ কী জনাব?”

তিনি জবাব দিলেন, “আমি নিজেকে কোনো হায়েজ অবস্থার মহিলার মতো মনে করি এবং মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করবো বলে লজ্জিত হই।”

১১. মহাপ্রভু সর্বত্র বিদ্যমান: একদা মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর ফিরে আসলেন। ইতোমধ্যে তিনি কখনও এরূপ করেন নি। মানুষ তাঁকে এর কারণ কী তা জানতে চাইলো। তিনি জবাব দিলেন, আমি ভ্রমণপথে অগ্রসরকালে দেখলাম এক মোটাদেহী হাবসী উন্মুক্ত তরবারী হাতে আমার সম্মুখে দাড়িয়ে আছে। আমাকে বললো, “হে আবু ইয়াজিদ! আর এক পা অগ্রসর হলে তোমার

মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবো! তুমি তো তোমার প্রভুকে বিস্তাম শহরে রেখে বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হয়েছো!"

১২. আল্লাহ ছাড়া কিছুই সুন্দর নয়: একদা তিনি একটি আপেল হাতে নিয়ে বললেন, "এটা একটি সুন্দর আপেল।" তিনি এক গায়েবি আওয়াজ শুনলেন: "হে আবু ইয়াজিদ! তুমি কোন্ সাহসে একটি আপেলকে আমার সাথে তুলনা করলে?"

তিনি চল্লিশ দিন যাবৎ অনুশোচনা করলেন। এরপর বললেন, "যতোদিন বেঁচে থাকবো ততোদিন বিস্তাম শহরের কোনো ফল-ফ্রুট স্পর্শ করবো না।"

১৩. হৃদয়কে পাহারায় রাখা সম্পর্কে: একদিন তাঁর অন্তরে এরূপ ধারণা জন্মালো: "আমি তো যুগের শায়খ! যুগের বড়ো ওলি!" সাথে সাথে তাঁর মনে এ ভাবনা জেগে ওঠেলো যে, আমি বিরাট ভুল করে বসেছি। তিনি বলেন, "এরপর আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং খুরাশানের রাস্তায় পাড়ি জমালাম। আমি একটি সরাইখানায় উপস্থিত হলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, যতোক্ষণ না মহাপ্রভু কাউকে পাঠাবেন ততোক্ষণ আমি এখানেই থাকবো।"

তিনি আরো বলেন, "তিনদিন ও তিনরাত চলে গেলো। চতুর্থদিন একজন একচোখা ব্যক্তি দেখলাম। তিনি একটি উটের পিঠে চড়ে আসছেন। আমি সতর্কসহ তাঁকে পরর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম তাঁর মধ্যে ঐশি চেতনা বিদ্যমান। আমি উটটিকে থেমে যেথে ইশারা করলাম। উট সাথে সাথে মাটিতে বসে গেলো। তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "আপনি আমাকে এখানে নিয়ে আসলেন আমার বন্ধ চোখটি খোলে দিতে; একটি বন্ধ দরজা খুলে দিতে। বিস্তাম শহরের লোকদেরকে আবু ইয়াজিদের সাথে ঢুবিয়ে দিতে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "আমি ভুলে গেছি। কখন আপনি আসলেন?" তিনি বললেন, "যে মুহূর্তে আপনি প্রতিজ্ঞা করলেন তখনই আমি নয় হাজার মাইল পাড়ি দিলাম। সাবধান আবু ইয়াজিদ! তোমার হৃদয়কে কড়া পাহারায় রেখো।" একথা বলেই তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

১৪. জায়নামায ও বালিশের প্রয়োজন নেই: বিখ্যাত সুফি হযরত যুননুন মিসরি রাহামাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট হাদিয়া হিসেবে নামাযের একখানা মুসাল্লা প্রেরণ করলেন। তিনি তা ফেরৎ পাঠিয়ে পত্র

লিখলেন, "হযরত! একখানা জায়নামাযের প্রয়োজন আমার কী হতে পারে? বরং আপনি আমাকে একটি বালিশ প্রেরণ করে যেটির মধ্যে একটু হেলান দিয়ে বসতে পারি।"
যুননুন মিসরি রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে একটি সুন্দর আরামদায়ক বালিশ প্রেরণ করলেন। তিনি এটাও ফেরৎ পাঠিয়ে লিখলেন, "হযরত! এটারও আর প্রয়োজন নেই। এখন কোথাও হেলান দেওয়ার মতো শরীরই আমার নেই! এখন তো প্রেমময় আল্লাহর রহমাতও আমার জন্য হেলানের উপায় হয়ে গেছে। প্রভুর কোনো প্রাণীর নিকট থেকে বালিশের প্রয়োজন আর অবশিষ্ট নেই।"

১৫. মদ্যপের বাঁশির আঘাত ও তাওবাহর ঘটনা: হযরত বায়িজিদ বিস্তামী প্রায়ই কবরস্থানে যেয়ে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হতেন। এক রাতে কবরস্থানে থাকাবস্থান থেকে ফেরার পথে তিনি শুনতে পেলেন বাঁশির সুর। লক্ষ করলেন, এক সম্ভ্রান্ত ঘরের নওজোয়ান বাঁশি বাজাচ্ছে। তিনি বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ! একথা শুনে নওজোয়ান তাঁর কাছে এসে বাঁশি দ্বারা হযরতের মাথায় জোরে আঘাত করলো। এতে বাঁশিটা ফেটে গেলো- একই সময় হযরতের মাথাও! ছেলেটি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ছিলো।

পরদিন হযরত বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এক সাথীকে জিজ্ঞেস করলেন একটি বাঁশির মূল্য কতো হবে? মূল্য জেনে তিনি সে পরিমাণ টাকা ও কিছু মিষ্টান্ন একটা কাপড়ের থলের ভেতর রেখে ঐ যুবকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, "যুবককে বলো, গতরাতে সে আমাকে তার বাঁশি দ্বারা আঘাত করেছিল। ফলে বাঁশিটা ভেঙ্গে যায়। এই টাকা দ্বারা আরেকটি বাঁশি কিনে নেবে। আর মিষ্টান্ন দ্বারা তোমার অন্তর থেকে বাঁশি হারানোর দুঃখটুকু কিছুটা হলও মুছে ফেলবে।"

নওজোয়ান যখন জানলো যে, সে বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহকে বাঁশি দ্বারা আঘাত করেছিলন, সে হযরতের দরবারে ছুটে এসে পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলো। সে তাওবাহ করলো আর কখনো মদ্যপান করবে না। এ ঘটনার কথা শুনে শহরের আরো অনেক মদ্যপায়ী ছেলেরা এসে হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করে তাওবাহ করলো।

১৬. কিয়ামত দিবস পরে প্রসংসা করবো: এক রাতে হযরত বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহ স্বপ্নে দেখেলেন প্রথম আসমানের ফিরিশতারা অবতরণ করেছেন। তাঁরা বললেন, "ঘুম

থেকে জেগে ওঠো হে আবু ইয়াজিদ! এসো আমরা আল্লাহর প্রশংসা করবো।” তিনি জবাব দিলেন, “তাঁর প্রশংসা করার মতো জিহ্বা আমার নেই।”

এরপর দেখলেন দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশতারা অবতরণ করলেন। তাঁরা অনুরূপ কথা বললেন। তিনি একই জবাব দিলেন। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ট আকাশের ফিরিশতারা অবতরণ করলেন, তিনি প্রত্যেকবার একই জবাব দিলেন। অবশেষে সপ্তম আকাশের ফিরিশতারা অবতরণ করার পর তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, “হে আবু ইয়াজিদ! আল্লাহর প্রশংসাবাণী উচ্চারণের জন্য তুমি কখন জিহ্বার অধিকারী হবে?

তিনি জবাব দিলেন, “যখন দোজখবাসী দোজখে যাবে, বেহেশতবাসী বেহেশতে যাবে এবং কিয়ামতের বিচারকার্য শেষ হবে, তখনই আমার মধ্যে প্রশংসার যোগ্য জিহ্বা হবে। তখন আবু ইয়াজিদ প্রভুর আরশের চতুর্দিকে চক্কর দেবে ও বলবে, ‘আল্লাহ!’ ‘আল্লাহ!’”

১৭. বাতি পেয়ে সাবই মুসলমান হলো: হযরত বায়িজিদ বিস্তামীর এক অগ্নিপূজক পড়শি ছিলো। ঘরে বাতি না থাকায় তার এক ছোট্ট বাচ্চা একদিন কাঁদতে লাগলো। তিনি একটি বাতি নিয়ে তাদের গৃহে গেলেন। সাথে সাথে বাচ্চাটি ক্রন্দন থামালো। তারা বললো, “যেহেতু আবু ইয়াজিদের বাতি আমাদের ঘরে প্রবেশ করেছে, তাই অন্ধকারে থাকা আর সমুচিত হবে না।” তারা সবাই একসাথে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলো।

১৮. আমার ঘর ফলের দোকান নয়: এক রাতে তিনি ইবাদতে কোনো স্বাদ পাচ্ছিলেন না। তাঁর এক মুরীদকে জিজ্ঞেস করলেন, “দেখো তো ঘরের ভেতর মূল্যবান কিছু আছে নাকি?” মুরীদ অনুসন্ধান চালিয়ে এক আঁটি খেজুর পেলো। হযরত বললেন, “এগুলো গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দাও! আমার ঘর তো আর ফলের দোকান নয়!” এরপর তিনি ইবাদতে মগ্ন হলেন ও আগের মতো স্বাদও পেলেন।

১৯. দূরবর্তী শহরে জানাযায় শরীক হওয়া প্রসঙ্গে: একদিন এক ব্যক্তি তাবারিস্তান থেকে হযরত বিস্তামীর দরবারে এসে হাজির হলো। বললো, “হুজুর! তাবারিস্তানের এক ব্যক্তির জানাযায় আমি আপনাকে দেখেছি। আপনি হযরত খিজির আলাইহিসসালামের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আপনার কাঁধে হাত রাখেন আর আপনি তাঁর পিঠে হাত রেখেছিলেন। জানাযা শেষে যখন লোকজন চলে যাচ্ছিলো তখন দেখলাম আপনি আকাশে উড়ে চলে গেলেন!”

এই বর্ণনা শুনে তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তুমি যা বললে তা অবশ্যই সত্যি।”

২০. এক ব্যক্তি মুরীদ হওয়া প্রসঙ্গে: হযরতের প্রতি আস্থা ছিলো না- এমন এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে এসে তাঁকে একটু পরীক্ষা করতে চাইলো। সে বললো, "এই-এই সমস্যার সমাধান কী আমাকে বলুন?" হযরত বুঝতে পারলেন, লোকটি তাঁকে সন্দেহ করছিলো। এরপর সে বললো, "ঐ পাহাড়ে একটি গুহা আছে। সেখানে আমার এক বন্ধু বাস করে। আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করে জবাব নিয়ে আসেন।" একথা বলেই সে পাহাড়ের দিকে ছুটে গেলো। গুহার ভেতর প্রবেশ করে দেখে সেখানে এক বিরাট দৈত্য বসে আছে! সে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। জ্ঞান ফেরার পর কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এলো। সে তার জুতোও সেখানে ফেলে আসলো। হযরতের দরবারে এসে পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলো। এরপর তাঁর নিকট তাওবাহ করে মুরীদ হয়ে গেলো।

২১. লজ্জায় পানিতে পরিণত হওয়া: এক ব্যক্তি একদিন হযরত আবু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহর দরবারে এসে লজ্জা সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে কিছু নসিহত করার পর সে পানিতে পরিণত হয়ে গেলো! তাঁর এক মুরীদ এসে পানি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! এখানে এতো পানি আসলো কোত্থেকে? তিনি বললেন, "একজন এসে লজ্জা সম্পর্কে জানতে চাইলো। আমার বয়ান শুনে সে অস্থির হয়ে পানিতে পরিণত হয়ে গেছে!"

২২. দোযখীদের প্রতি দরদ: হযরত হাতিমে আসম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মুরীদদের বললেন, "যে কেউ রোজ কিয়ামতে দোযখীদের জন্য সুপারিশ করবে না সে আমার মুরীদ নয়।" এ কথাটি যখন আবু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ শুনলেন, তিনি বললেন, "আমি বলি, আমার প্রত্যেক মুরীদ যেনো দোযখের কিনারায় দাঁড়িয়ে হাতে ধরে সকল দোযখীদের বেহেশতে নিয়ে যায় এবং তাদের বদলে তারা নিজেরা দোযখে চলে যায়!"

২৩. ফানার অবস্থা: হযরত বায়িজিদ বিস্তামী বলেন, "আমি যখন সর্বপ্রথম বাইতুল্লায় প্রবেশ করি তখন আমি পবিত্র ঘরখানা দেখেছি। দ্বিতীয়বার প্রবেশ করে ঘরের মালিককে দেখেছি। তৃতীয়বার প্রবেশ করে না ঘরকে দেখলাম, না ঘরের মালিককে দেখলাম।"

২৪. ফানাফিল্লাহর আরেক উপমা: এক ব্যক্তি হযরত বায়িজিদ বিস্তামীর সন্ধানে তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হলো। সে দরজার কড়া নাড়লো। ভেতর থেকে একজন প্রশ্ন করলেন, "আপনি কাকে চাচ্ছেন?"

লোকটি জবাব দিলো, "আবু ইয়াজিদকে।"

ভেতর থেকে জবাব আসলো, "বেচারা ইয়াজিদ! আমি দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ আবু ইয়াজিদের সন্ধানে আছি। এখনও তাকে খোঁজে পাই নি।" ভেতর থেকে যে কথা বলছিলেন তিনিই আসলে হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী ছিলেন!
কথাটি হযরত যুননুন মিসরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কর্ণগোচর হলে মন্তব্য করলেন, "আমার ভাই আবু ইয়াজিদের ওপর আল্লাহর রহমত নাজিল হোক। তিনি ওদের দলে হারিয়ে গেছেন যারা আল্লাহর মাঝে হারিয়ে গেছেন।"

হযরত বায়িজিদ বিস্তামী ফানাফিল্লাহর এমন উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করেছিলেন যে, অতি নিকবর্তী লোকজনকেও তিনি সময় সময় চিনতে পারতেন না। তাঁর এক মুরীদ দীর্ঘ বিশ বছর হযরতের সুহবতে ছিলেন। প্রায়ই তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন, "হে পুত্র! তুমি কে?" মুরীদ একদিন বললেন, "আপনি আমার সাথে টাট্টা করছেন হযরত! আমি তো গত বিশ বছর যাবৎ আপনার খেদমতে আছি! এরপরও আপনি হে পুত্র! তুমি কে? বলে প্রশ্ন করে থাকেন।" তিনি বললেন, "দুঃখিত হয়ো না বাপু! আমার হৃদয় তাঁর ধ্যানে-জিকিরে এতোই পরিপূর্ণ হয়েছে যে, সেখানে অন্য কোনো নামই প্রবেশ করার জায়গা অবশিষ্ট থাকে নি। যখনই কোনো নাম আমি শ্রবণ করি, কিছুক্ষণ পরেই তা ভুলে যাই।"
২৫. দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়েছি: হযরত বায়িজিদ বিস্তামী বলেন, "আমি দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়েছি এবং একাই একাকীর দরবারের দিকে অগ্রসর হয়েছি। আমি প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করে বলেছি, "হে প্রভু! আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু চাই না। আর তোমাকে পেলেই আমি সবকিছু পেয়ে গেলাম।"

মহামূল্যবান বাণী

১. তিনি বলেন, "সত্যিকার ইবাতদকারী ও পরহেজগার ঐ ব্যক্তি যে জুহদের অসি দ্বারা সকল আকাঙ্ক্ষার মস্তক কর্তন করেছে। সে নিশ্চিহ্ন করে দেয় সকল অনুরাগ ও আশা সত্যের প্রতি ভালোবাসা হেতু। যে কেউ আল্লাহকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে আল্লাহও তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন। যে কেউ আল্লাহর বিরহে ব্যাকুল হয় আল্লাহ তার চাওয়াকে পূরণ করেন।
২. আল্লাহর মা'রিফাত লাভের নিদর্শন হচ্ছে সৃষ্টি থেকে পালিয়ে যাওয়া।

৩. সাধুদের সঙ্গলাভ সাধুতা থেকেও উত্তম। অপরদিকে দুষ্টদের সঙ্গ হচ্ছে দুষ্টামি থেকেও মারাত্মক।

৪. যে কেউ তার আত্মচাওয়া পরিত্যাগ করেছে সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুয়ে গেছে।

৫. জিকিরের মাত্রা সংখ্যা দ্বারা মাপতে নেই। জিকির হচ্ছে সার্বক্ষণিক চেতনা কোনো অবহেলা ছাড়া।

৬. মানুষ কখন ইনসানে কামিল হওয়ার কাছাকাছি পৌছুয়? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "যখন সে তার নিজের নফসের দোষগুলো সনাক্ত করে, তখনই সে ইনসানে কামিল হওয়ার কাছাকাছি চলে যায়।"

৭. হযরত ইব্রাহিম ইবনে হিরাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, "মা'রিফাত [আল্লাহপরিচিতি] লাভ করার ইঙ্গিত কী?" তিন বললেন, "মা'রিফাতলাভকারী কখনো জিকরুল্লাহ থেকে বিরত থাকে না। সে কখনো আল্লাহর হক্ব আদায়ে অলস হয় না। গাইরুল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকে না।"

৮. হযরত হাসান ইবনে আলাওয়িয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হযরত বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "এক রাতে আমি আমার মিহরাবে বসে পা-যুগল লম্বা করলাম। আমি সাথে সাথে একটি গায়েবি আওয়াজ শুনলাম; "যে কেউ বাদশাহদের দরবারে থাকার ইচ্ছে রাখে, তার জন্য উচিত হলো শাহী দরবারের আদব রক্ষা করা!"

৯. তিনি বলেন, "চল্লিশ বছর হলো যখনই আমি আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন হতে চেয়েছি তখনই প্রথমে কুলি করেছি এরপর জিহ্বাকে ধোঁয়ে পরিষ্কার করেছি।"

১০. বর্ণিত আছে একদা হযরত বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহ মসজিদে জামাআতে নামায পড়াবস্থায় সালাম ফেরানোর পরই ইমাম সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে বায়িজিদ! আপনি কোথা থেকে খাবার গ্রহণ করেছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন। নামাযটি পুনরায় আমাকে পড়তে দিন! আপনি রিজিকদাতা মহান রব্বের প্রতি সন্দেহপোষণ করছেন। যে কেউ প্রভুর রব্বুবিয়ত সম্পর্কে অবগত নয় তার পেছনে নামায পড়া বৈধ হবে না।"

মৃত্যুকালীন অবস্থা

তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত যখন হাজির হলো তিনি তাঁর ইবাদতখানায় প্রবেশ করলেন। তিনি কোমরবন্ধ বাঁধলেন ও টুপি ও জুব্বা উল্টিয়ে পরলেন। এরপর বলতে লাগলেন, "হে আমার প্রভু! আমার সারাজীবনের আমলের ওপর মোটেই আস্থাশীল নই। সারা রাতের উপাসনাকে আমি কিছুই মনে করছি না। সারা জীবন রোযা রাখাকে আমি মূল্যহীন মনে করি। আমার কুরআন তিলাওয়াতের সময়টুকুর কথাও আমি গণনায় আনছি না। আমি আমার আধ্যাত্মিক ওসব ক্ষণটুকুর কথাও বলছি না যেখানে নৈকট্যের ছোঁয়া পেয়েছি। আমি এসব কথা এখন বলছি এ কারণে যে, যা কিছুই আমল আমার ছিলো সবগুলোর জন্য আমি ভীষণভাবে লজ্জা পাচ্ছি। আমি এখন এক অকেজো সত্তুরোর্ধ বৃদ্ধ, যার চুল-দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। আমি অসীম মরুভূমি থেকে এইমাত্র আসলাম এবং জিকির করতে লাগলাম আল্লাহ! আল্লাহ! এই মাত্র আমার কোমরবন্ধ মুক্ত হলো। এইমাত্র আমি মুসলাম হলাম। এই মাত্র আমার জিহ্বা কালিমা শাহাদাতের বাক্য উচ্চারণ করলো- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! আপনি যাকে গ্রহণ করেন তার পেছনে কারণ থাকে না, আপনি যাকে আপন করেন আনুগত্যের জন্য নয় এবং যাকে পরিত্যাগ করেন তা নাফরমানির জন্য নয়। গ্রহণ ও পরিত্যাগ শুধুমাত্র আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল প্রভু। আমার সকল আমল ধূলোবালি ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনার নিকট আমার জিন্দেগির আমলের যাকিছু পছন্দ হয়নি তা অনুগ্রহ করে ক্ষমা করুন। আমার থেকে নাফরমানির সকল অনুকণা মুছে দিন- আমি তো প্রভু নিজের থেকে সকল পূর্বধারণাকে মুছে ফেলেছি।" এ দু'আ শেষে তিনি দুনিয়ার মায়া ছেড়ে প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি ৭৩ বছর বয়সে হিজরি ২৬১ সালে ইন্তিকার করেন। তাঁকে বিস্তাম শহরেই সমাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত নাজিল করুন। বুলন্দ করে দিন তাঁর দ্বারাজাত।

চলে গেলেন দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর নিকট তাঁরই এ আপনজন, তাঁর বিরহে কাঁদতে থাকে বহুকাল এ বিশ্ব-ভূবন।

নকশবন্দিয়া শাজারাহ মুতাবিক পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন খারক্বানের বিখ্যাত যুগশ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ হযরত আবুল হাসান খারক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আল্লাহ তা'আলা যেটুকু তাওফিক দান করেন সেটুকু পরিমাণ আলোচনা তাঁর এই মায়ার বান্দার ওপর এখই উপস্থাপন করবো।

হযরত শায়খ আবুল হাসান খারক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৪২৫ হিজরি, সমাধি- তুস, খুরাশান, ইরান।

শায়খ আবুল হাসান খারক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হচ্ছেন নকশবন্দী শাজারাহ মুবারকের সপ্তম ওলি। তাঁর নিসবত ছিলো বিস্তামের বিখ্যাত শায়খুল মাশাইখ হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে। তিনি তাঁর যুগের এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাসাওউফের ইমামগণ পরবর্তীতে তাঁর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ও প্রশংসা করেছেন।

জন্ম

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো আবুল হাসান আলী ইবনে জাফর খারক্বানী রাহিমাহুল্লাহ। বর্তমান ইরানের সেমনান প্রদেশের বিস্তামের নিকটস্থ খারক্বান নামক একটি ছোট্ট গ্রামে ৩৫২ (৯৬৩) হিজরি সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক জীবনে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন হযরত আবুল আব্বাস কাসসাব আমলি রাহিমাহুল্লাহ। কিন্তু তাঁর নিসবত হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ছিলো যদিও তিনি শত বছর পূর্বে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার নিশাপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাযকিরাতুল আউলিয়ায়' খারক্বানী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও সাধনার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁকে 'সুলতানে সালাতিনে মাশাইখ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

শাগরিদ ও শোভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ

হযরত আবুল হাসান খারক্বানী রাহিমাহুল্লাহর শাগরিদ ছিলেন পারস্য সুফি-দরবেশ ও কবি আবদুল্লাহ আনসারী, দার্শনিক ইবনে সিনা, সুলতান মাহমুদ গজনী, আবু সাঈদ আবুল খায়ের এবং নাসির খসরু রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এরা সবাই খারক্বানে যেয়ে হযরতের সুহবত লাভে ধন্য হন। তাঁরা লেখার মাধ্যমে হযরত সম্পর্কে তাঁদের গভীর শ্রদ্ধাবোধের কথা ব্যাক্ত করেছেন।

হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ ছাড়াও যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁর সম্পর্কিত অনেক কাহিনী ও কবিতা রচনা করে গেছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, হযরত আবুল ক্বাসিম কুশাইরী (রিসালাতুল কুশাইরী), হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজভেরী (কাশফুল মাহযুব), খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (তাবাক্বাতাস সুফিয়্যা), হযরত হামাদনী (তামহিদাত), নাযমুদ্দিন কুবরা (ফাওয়াহিল জামাল ওয়া ফাওয়াতিল জালাল) মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (মসনবী মা'আনবী), নূরুদ্দিন আবদুর রহমান জামী (নাফাহাত) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ও মুরিদান মিলে 'নূরুল উলূম' [জ্ঞানের আলো] নামক তাঁর জীবন ও সাধনার ওপর একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বর্তমানে এর এক কপি পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

হযরত খারক্বানী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন বেশ কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ ওলির মুর্শিদ। হযরত আবু আলী ফারমাদী, আবু সাঈদ আবুল খায়ের, খাজা আবদুল্লাহ আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন ঘটনা ও বাণী

১. তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: "সিদ্বক [সত্যবাদিতা] অর্থ কী?"
তিনি জবাব দিলেন: "সিদ্বক হচ্ছে নিজের চেতনাকে ব্যক্ত করা।"

২. হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তিনি বলেন: "যখন বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি চাই, না চাওয়া' এর অর্থ হলো, এটাই সত্যিকার চাওয়া যাকে ইরাদা (ইচ্ছা) বলে।

৩. হযরত খারক্বানী রাহিমাহুল্লাহকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো: "হযরত! ফানা (বিলুপ্তি) ও বাকা (স্থায়িত্ব) সম্পর্কে বয়ান করার যোগ্য ব্যক্তি কে?"
তিনি জবাব দিলেন: "এ জ্ঞান হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে একটি সরু রেশমি সুতা দ্বারা আকাশ থেকে জমিনে লটকিয়ে রাখা হয়েছে। এরপর এক বিরাট শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আসলো এবং সকল বৃক্ষলতা, বাড়িঘর ইত্যাদি সবকিছু উড়িয়ে নিলো। পাহাড়-পর্বত মহাসমুদ্রে যেয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলো। আর এই ঘূর্ণিজড়ও যদি ঐ লটকেথাকা

ব্যক্তিকে চুল পরিমাণও সরাতে না পারে, তাহলে সে-ই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি যে ফানা ও বাকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারে।"

৪. একদা গজনির সুলতান মাহমুদ হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহকে দেখতে আসলেন। তিনি হযরতের কাছে বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

তিনি বললেন: "যে কেউ বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহকে অনুসরণ করবে সে সুপথপ্রাপ্ত হবে। আর যে কেউ তাঁকে দেখে তাঁর প্রতি হৃদয়ের মধ্যে প্রেমাকর্ষণ অনুভব করবে, তার শেষ পরিণতি হতে আনন্দময়।"

একথা শুনে সুলতান মাহমুদ বললেন: "এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যখন আবু জাহিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেও উত্তম শেষ পরিণতির সৌভাগ্য লাভ করে নি। বরং তার মৃত্যু হলো কুফরের মধ্যে?"

তিনি জবাব দিলেন: "বাস্তবে আবু জাহিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পায় নি। সে তো শুধুমাত্র মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহকে দেখেছিল। আর সে যদি 'আল্লাহর রাসূলকে' দেখতে পেতো তাহলে সে অবশ্যই সৌভাগ্যশীল হতো। আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন:

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

"আর তুমি তো তাদের দেখছ-ই, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।" [৭:১৯৮]"

৫. ইলম ও আমল সম্পর্কে তিনি বলেন: "নিম্ন জগতে গবেষক ও বান্দাহদের অভাব নেই। তাদের দ্বারা কিন্তু আপনি কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারবেন না- যদি না আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা না ছাড়েন ও ভোর থেকে রাত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা যেসব আমলকে পছন্দ করেছেন তা পালন করতে থাকেন।"

৬. সুফি হওয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে: "সুফি শুধু ঐ ব্যক্তি নন যিনি সর্বদা জায়নামায নিয়ে ঘুরাফেরা করেন কিংবা তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করেন, না ঐ ব্যক্তি যিনি কিছু বিশেষ ঐতিহ্য ও বহিরাভরণ অনুসরণ করেন। সুফি আসলে তিনি যিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখা সত্ত্বেও সকলের আকর্ষণের পাত্রে পরিণত হয়েছেন।" তিনি আরো বলেন: "সুফি হচ্ছেন তিনি যিনি দিনের আলো যার সূর্যের প্রয়োজন নেই, রাতের জ্যোৎস্না যার প্রয়োজন

নেই চাঁদের আলোর। তাসাওউফের নির্যাস হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বহীনতা- কারণ বাস্তবে অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন চিরন্তন অস্তিত্বশীল।"

৭. কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো: "ইয়া শায়খ! আল্লাহ বলেছেন, যারা তাঁর ভয়ে কাঁদে তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন। কিন্তু আমার চোখে তো অশ্রু আসে না। কী করবো বলুন?" তিনি বললেন, "আল্লাহর নিকট চোখের পানি ঝরাতে কাকুতি-মিনতি করতে থাকো। হয়তো কোনো উপায়ে তাঁর প্রতি ভয় কিংবা ইশক হেতু তোমার চোখে পানি আসবে। যদিও তা কোনো দুনিয়াবী বিপদ দ্বারাও হতে পারে। কুরআনের আয়াত পাঠ করতে করতে আল্লাহকে আবদার জানাতে থাকো।"

৮. হযরত আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহর খানক্বার দরজায় লিখা ছিলো: "যে কেউ এই গৃহে প্রবেশ করবে, তাকে খাবার ও পানীয় দেবে এবং তার ধর্ম সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করবে না। কারণ সে আল্লাহর দয়ায় জীবন লাভ করেছে, সুতরাং আমার দস্তারখানে খাবার পাওয়ার যোগ্য।"

৯. তিনি বলতেন: "আমি অনুভব করি শুনছি, দেখছি কিন্তু আমি অস্তিত্বশীল নই।"

১০. হযরত বলেন: "একদিনে আছে ২৪ ঘন্টা। এর একটি মাত্র ঘন্টায় আমি হাজার বার মৃত্যুবরণ করি এবং বাকি ২৩ ঘন্টার ব্যাপারে আমার নিকট কোনো ব্যাখ্যা নেই।"

১৩. তিনি বলেন: "মানুষ আমার সম্পর্কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেয়। তারা আসলে আমার পরিচিতি কখনও তুলে ধরতে পারবে না। কারণ আমি হচ্ছি তারা যা-ই বলুক না কোনো তার বিপরীত।"

১৪. নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন: "আমি কোনো সুফি নই- না আমি কোনো বিজ্ঞানী বা পরহেজগার ব্যক্তি। হে প্রভু! আপনিই এক ও একমাত্র একক। আমি তোমার এককত্বের একজন।"

১৫. তিনি বলেন: "কী হতো যদি বেহেশত কিংবা দোযখ না থকতো? আমরা তখন অবশ্যই সত্যিকার আনুগত্যশীলদের দেখতে পারতাম।"

১৬. তিনি বলেন: "একজন আলিম খুব ভোরে জেগে ওঠে কীভাবে তাঁর জ্ঞানকে বাড়াতে পারেন সে প্রচেষ্টায় লেগে যান। একজন সুফি-দরবেশ খুব ভোরে জেগে ওঠে চেষ্টা করেন কীভাবে তাঁর ঈমানকে শক্ত করতে পারেন। কিন্তু আবুল হাসান এর কোনোটিরই চেষ্টা

করে না। সে চেষ্টা করে কীভাবে কোনো মানুষকে [সেবার মাধ্যমে] আনন্দ দান করতে পারে।”

১৭. তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার অর্থ কী? তিনি জবাব দিলেন: “যে বলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুয়ে গেছে [আল্লাহতে, হাক্বিক্বাতে ও মা’রিফাতে] সে বাস্তবে সেথায় যায় নি। আর যে কেউ বলে, স্বয়ং আল্লাহ আমাকে তাঁর নিকট পৌঁছুয়েছেন, সে নৈকট্য লাভ করেছে [সে হক্বিক্বাতে পৌঁছুয়েছে]।”

১৮. তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: “আপনি কোথায় আল্লাহর দীদার লাভ করলেন?” তিনি জবাব দিলেন: “যেখানেই আমি আমার নিজকে দেখতে পাই নি।”

১৯. তিনি বলেন: “সমগ্র মহাবিশ্বে যাকিছুই আছে তা তোমার অন্তরেও আছে। তোমাকে শুধুমাত্র এগুলো দেখার যোগ্যতা লাভ করতে হবে।”

২০. “যে কেউ প্রেমে পড়েছে, সে আল্লাহকে পেয়েছে। আর যে কেউ আল্লাহকে পেয়েছে, সে নিজেকে হারিয়েছে।”

২১. তিনি বলতেন: “সমগ্র জগতের মধ্যে শুধু এক ব্যক্তি আমাকে বুঝতে পেরেছেন- তিনি হচ্ছেন হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।”

২২. একদা একব্যক্তি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলো: “মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে আমাকে অনুমতি দিন - হযরত।” তিনি মন্তব্য করলেন: “সতর্ক থেকে তুমি যেনো মানুষকে তোমার দিকে আসতে আহ্বান না করো!”

সে আবার জিজ্ঞেস করলো, “আমার দিকে ডাক দেওয়া বলতে আপনি কী বুঝাচ্ছেন, শায়খ?”

তিনি বললেন; “অপর কেউ যদি আল্লাহর দিকে ডাক দেয় যা তোমাকে অসন্তুষ্ট করে, তাহলে এটাই হচ্ছে একটি সংকেত যে তুমি তোমার দিকে ডাকবে।”

২৩. হযরত আবুল হাসান খারক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির স্ত্রী খুব কর্কষভাষী ছিলেন। একদিন কেউ একজন হযরতের বাড়িতে এসে ডাক দিলো, আবুল হাসান বাড়িতে আছেন? ঘরের ভেতর থেকে হযরতের স্ত্রী কর্কষ ভাষায় বললেন, “এই মিথ্যাবাদী ও মুনাফিকের সাথে তোমার কী দরকার আছে?” এরপর মহিলা আরোও জগন্য নেতিবাচক মন্তব্য করলেন নিজের স্বামীর ব্যাপারে। যাক, ঐ ব্যক্তি দ্রুত বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন এবং এক জঙ্গলে যেয়ে হযরত খারক্বানী রাহিমাহুল্লাহর সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি দেখলেন

হযরত একটি সিংহের ওপর লাকড়ির আঁটি তুলে জন্তুটিকে নিয়ে হাঁটছেন। লোকটি তাঁকে বললেন, "হযরত! এখানে আপনাকে যে অবস্থায় দেখছি তার বিপরীত অবস্থা আপনার ঘরে বিরাজ করছে। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? তিনি বললেন, ঘরের ঐ জন্তুর [অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর] বোঝা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি টেনে ধরতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিংস্র সিংহকে পোষ মানাতে পারবে না।"

কথিত আছে, এরূপ স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কেনো ঘর-সংসার অব্যাহত রেখেছেন- এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলতেন, "আমার অপর কোনো মুসলিম ভাই যাতে কষ্ট পায় না তাই আমি ওকে নিয়ে সংসার করে যাচ্ছি।"

২৪. একদিন তিনি সবাইকে ডেকে বললেন: "সবচেয়ে উত্তম কোন জিনিস তোমরা জানো?" লোকজন বললো, "শায়খ! আপনিই আমাদের বলুন।"

তিনি বললেন, "এমন একটি হৃদয় [ক্বলব] যা কখনো জিকরুল্লাহ থেকে গাফিল নয়।"

২৫. কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো, "হযরত! আধ্যাত্মিক রাস্তার ভ্রমণকারী কীভাবে জানবে সে সচেতন আছে?"

তিনি জবাব দিলেন: "সে যখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুধু আল্লাহ সম্পর্কেই অবহিত থাকে।"

২৬. ইখলাস [আন্তরিকতা] সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন, "যাকিছুই আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয় তা-ই হলো ইখলাস এবং যাকিছুই মানুষের উদ্দেশ্যে করা হয় তা-ই লোকদেখানো কর্ম।"

২৭. তিনি প্রায়ই বলতেন: "সবচেয়ে নূরান্বিত হৃদয় হচ্ছে সেটি, যার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি প্রবেশ করে বেরিয়ে যায় না। সর্বাধিক উত্তম আমল সেটি, যেটি করা সৃষ্টির ভীতি থেকে মুক্ত থেকে। সকল দান থেকে উত্তম দান হলো সেটি, যা তুমি হালাল উপায়ে উপার্জন করো। সর্বাধিক উত্তম সাথী তিনি যার জীবন আল্লাহর সঙ্গে।"

ইন্তিকাল

আমাদের সবার জিন্দেগী হচ্ছে কদিনের মুসাফিরী মাত্র। অনন্ত কালের একটুকু সময় মাত্র এ নশ্বর ধরায় আমাদের আগমন। হায়াতের দৌড় শেষ হয়ে গেলেই ফিরে যেতে হবে

আলমে বরযখের দিকে। এরপর হাশরের দীর্ঘ ৫০ হাজার বছর, তারপর স্থায়ী বাসস্থান চিরশান্তির বেহেশত না হয় (আমরা আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী) চরম শাস্তির জায়গা দোযখ।

মহান আল্লাহ তা'আলার আপনজনদের অন্যতম হযরত আবুল হাসান খারক্কানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনাবসান হয় ১০ই মুহাররম ৪২৫ হিজরি [১০৩৩]। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরতের সমাধি তাঁর জন্মস্থান খারক্কানেই অবস্থিত।

প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমিকের মিলন যখন হয়ে যায় তখন প্রেমিককে কেউ আর খোঁজে পায় না।

হযরত খারক্কানী রাহিমাহুল্লাহর তরীকতের প্রধান খলিফা ছিলেন হযরত শায়খ আবু আলী ফারমাদী তুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা তাই পরবর্তীতে তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার ওপর আমরা সব সময় নির্ভরশীল।

হযরত শায়খ আবু আলী ফারমাদী তুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৪৭৭ হিজরি, সমাধি- তুস, খুরাশান, ইরান।

হযরত শায়খ আবু আলী ফজল ইবনে মুহাম্মদ মুর্শিদ ফারমাদী তুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চতুর্থ হিজরি শতকের একজন সুফি শাইখুল মাশাইখ ছিলেন। ওয়াইসি সূত্রে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন হযরত শায়খ আবুল হাসান খারক্বানী রাহিমাহুল্লাহ থেকে। তাঁর প্রসিদ্ধ শাগরিদ ও আধ্যাত্মিক খলিফা ছিলেন হযরত ইমাম আবু হামিদ গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর সময়ে সেলজুক প্রিন্স তুগরিল, আরস্লান ও মালিক শাহ জীবিত ছিলেন। সেলজুক সভাসদ নিযামুল মুলক তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে হযরতের পরামর্শ নিতেন ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ করতেন।[24]

বিখ্যাত সুফি শায়খ আবুল হাসান গুরজানী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৪৫০ হি.] ছিলেন তাঁর শ্বশুর। হযরত তাঁর নিকট থেকেও তরিকতের খিলাফত লাভ করেন। শায়খ গুরজানির সিলসিলা হলো যথাক্রমে শায়খ উসমান মাগরিবী [তিনি আবু আবদুর রহমান সুলামী রাহিমাহুল্লাহর সমসাময়িক ছিলেন। মৃ. ৪১২ হি.], শায়খ আবু আলী কাতিব [মৃ. ৩৫৩ হি.], শায়খ আবু আলী রুজবারী [মৃ. ৩২০-৩২৩ হি.], শায়খ ইমাম জুনাইদ বাগদাদী [মৃ. ২৯৭ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

হযরত ফারমাদী রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয় ৪০২ হিজরি সনে। তাঁর আসল নাম ছিলো ফজল ইবনে মুহাম্মদ। তিনি বলেছেন, বাল্যকালে আমি নিশাপুরে লেখাপড়া করেছি। একদা শুনতে পেলাম শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ির [মৃ. ৪৪০ হি.] রাহিমাহুল্লাহ মাহনা শহর থেকে এসেছেন এবং একটি সভায় বয়ান করছেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। হযরতের মুবারক চেহারার দিকে তাকিয়েই আমি তাঁর মুহাব্বতের ছোঁয়া পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সকল সুফিদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় আমার অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো।

---

[24] Encyclopedia of Isman, V. 12, Supplement, pp 12.

একদিন মাদরাসার ভেতর আমি আমার কক্ষে বসে আছি। শায়খ তখনও মাদরাসায় ছিলেন। হঠাৎ আমার অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠলো তাঁকে এক নজর দেখার। কিন্তু শায়খ বাইরে আসার সময় তখন ছিলো না। আমি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। সুতরাং বাইরে চলে গিয়ে চত্তর পর্যন্ত গেলাম। লক্ষ করলাম, সেখানে একদল শাগরিদসহ শায়খ বসে আছেন। এরপর তিনি সামা' [মারিফতি কবিতা] শ্রবণের জন্য অন্যত্র যাত্রা করলেন। আমি চুপি চুপি তাঁর সঙ্গে গেলাম। শায়খ যাতে আমাকে দেখতে না পারেন সে ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম।

সামা' চলাকালে তিনি আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের চরম পর্যায়ে নিজের জামাটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিলেন। উপস্থিত সকলের মধ্যে টুকরো গুলো বন্টন করলেন। এরপর জামার হাতা বের করে ডাক দিলেন, "হে আবু আলী তুসী! তুমি কোথায়?" যেহেতু শায়খ আমাকে চিনেন না সুতরাং এখানে উপস্থিত আছি সে ব্যাপারে তাঁর ধারণা থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না- তাই ভাবলাম, একই নামে নিশ্চয় অন্য কেউ এখানে উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমি নীরব রইলাম। শায়খ আবার ডাক দিলেন, "কৈ আবু আলী, জবাব দিচ্ছো না কেনো?" আমি তখনও নীরব। তৃতীয়বার ডাক দেওয়ার পর আমার নিকটস্থ লোকজন বলেলো, 'শায়খ তোমাকে ডাকছেন, জবাব দিচ্ছে না কেনো?'

আমি ধীরে ধীরে হযরতের নিকট গেলাম। তিনি আমাকে জামার হাতা দিলেন এবং বললেন, "এটা সংরক্ষণ করে রেখো।" এরপর থেকে আমি তাঁর সুহবতে থেকে অফুরন্ত নূর ও আধ্যাত্মিক স্তর লাভ করেছি।

হযরত শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চল্লিশজন উচ্চ পর্যায়ের ওলির মুর্শিদ ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম দুজন হলেন শায়খুল ইসলাম হযরত আহমদ জাম ও শায়খ আবু আলী ফারমাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। নকশবন্দী তরিকার একজন শায়খ বলেছেন, হযরত ফারমাদী রাহিমাহুল্লাহকে আভ্যন্তরীণ মা'রিফাত দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে জ্ঞান উন্মোচন করার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয় নি। অপর দিকে শায়খ

আহমদ জান রাহিমাহুল্লাহকে একই জ্ঞান দান করা হয়েছিল এবং তিনি তা প্রকাশ করার অনুমতি পেয়েছিলেন।

ইমাম কুশাইরী রাহিমাহুল্লাহর খিদমাতে

শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিশাপুর ত্যাগ করার পর হযরত ফারমাদী রাহিমাহুল্লাহ সেখানকার বিখ্যাত ওলি ও গবেষক শায়খ আবুল ক্বাসিম কুশাইরী [মৃ. ৪৬৫ হি.] রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গ লাভ করলেন। তিনি হযরতকে নিজের সকল হালত সম্পর্কে অবগত করেন। ইমাম কুশাইরী বললেন, তুমি আপাতত [বাহ্যিক] লেখাপড়া চালিয়ে যাও। সুতরাং ফারমাদী সাহেব নিজেকে জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত করেন। এদিকে তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি স্তরে স্তরে উন্নততর হচ্ছিলো।

উচ্চতর আধ্যাত্মিক সাধনা

তিনি বলেছেন, ইমাম কুশাইরীর নিকট তিন বছর অধ্যয়ন করেন। একদিন আমি লক্ষ্য করলাম আমার কলমের কালি শেষ হয়ে গেছে। আমি ইমাম সাহেবের নিকট ব্যাপারটি অবগত করলাম। তিনি বললেন, হে আবু আলী! যেহেতু জ্ঞান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে, তুমিও একে পরিত্যাগ করো এবং আধ্যাত্মিক রাস্তায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করো। সুতরাং আমি নিজের কাঁথা-বালিশ নিয়ে হযরতের খানক্বায় প্রবেশ করলাম।

হযরত শায়খ আবুল ক্বাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ওলি ও আরবি সাহিত্যের পণ্ডিত। তাঁর রচিত তাসাওউফের বিখ্যাত কিতাব, "আর-রিসালাতুল কুশাইরী ফী ইলমিত-তাসাওউফ" এখনও বহুলপঠিত একটি কিতাব। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ সকল ভাষায় কিতাবখানা অনূদিত হয়েছে।[25] খানক্বায় অবস্থানকলে একদিন হযরত কুশাইরী রাহিমাহুল্লাহ গোসলখানায় গেলেন। আবু আলীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি

---

[25] খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে মূল আরবিসহ কিতাবখানা অনুবাদ করেছেন খানক্বার সহকারী পরিচালক মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। কিতাবখানা পাঠ করতে ভিজিট করুন:
https://archive.org/search.php?query=Engineer+Azizul+Bari&sort=-publicdate কিংবা
https://khanqaaminiaasgaria.000webhostapp.com/ - উল্লেখ্য আমাদের প্রকাশিত আরো বেশ কয়েকটি কিতাবও উভয় সাইট থেকে ডাউনলোড করে কিংবা অনলাইনে পাঠ করতে পারেন।

কয়েক বালতি পানি দ্বারা গোসলের পাত্রটি ভরে দিলেন। গোসল সেরে ইমাম সাহেব বাইরে এসেই প্রথমে দু রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর আবু আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, "গোসলের পাত্রটি কে পানি দ্বারা ভর্তি করলো?" তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। ভাবলেন, হযরতের অনুমতি ছাড়া পাত্র ভর্তি করায় হয়তো তিনি রাগ করবেন। ইমাম সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নীরব রইলেন। এরপর তৃতীয়বারের মতো জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "আপনার এই অধম খাদিম।" ইমাম সাহেব মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, "হে আবু আলী! আবুল ক্বাসিম যা পেতে সত্তুর বছর সময় লেগেছে, তুমি তা পেয়ে গেলে মাত্র কয় বালতি পানি দ্বারা!" এরপর তিনি আরো কিছুদিন হযরতের খিদমতে থাকার পর খিলাফত লাভে ধন্য হলেন।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

১. একদিন তিনি এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক হাল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি তা স্বীয় শায়খ কুশাইরী রাহিমাহুল্লাহর নিকট খুলে বললেন। ইমাম সাহেব বললেন: "আবু আলী! আমার ভ্রমণ এই মাক্বাম পর্যন্ত মাত্র। এর পরে কী আছে তা আমি জানি না।" একথা শুনে তিনি ভাবলেন, "আমি কী এখন অপর কোনো পীরের সুহবত লাভ করবো?" কিছুদিন পরই তিনি হযরত আবুল ক্বাসিম গুরজানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে চলে গেলেন। আর তিনি তাঁকে আল্লাহর হুকুমে আধ্যাত্মিক জগতের এক মহারত্নে পরিণত করে দেন।

২. শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ২৩ নং পত্রে লিখেন, একদা শায়খ আবু আলী ফারমাদী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর গুরু শায়খ গুরজানী রাহিমাহুল্লাহে একটি স্বপেনর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন, "ইয়া শায়খী! খোয়াবের মধ্যে আপনি এরূপ সেরূপ কথা আমাকে বললেন, কেন?" তিনি জবাব দিলেন, "তোমার অন্তরে যদি 'কেনো' এর জায়গা না থকতো, তাহলে এটা তোমার জিহ্বা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা খুজে পেতো না!" [অর্থাৎ তুমি যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করতে তাহলে যে কোনো বিষয় বুঝতে পারতে- কেনো এই সেই হয় সে ব্যাপারে তোমার হৃদয়ে কোনো প্রশ্নই জাগ্রত হতো না।]

৩. শায়খ আলী বিন উসমান হাজভেরী কুদ্দিসা সিররুহু ছিলেন হযরত গুরজানী রাহিমাহুল্লাহর একজন প্রধান খলিফা। তিনিও হযরত ফারমাদী রাহিমাহুল্লাহর প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁর 'কাশফুল মাহযুব' গ্রন্থে লিখেন: "[গুরজানী রাহিমাহুল্লাহর] তাঁর সকল খলিফা সমাজের একেকজন মণি-মুক্তা স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর একজন উচ্চ পর্যায়ের খলিফা দান করেছেন যার প্রধান্য সকল সুফিদের মধ্যে বিরাজমান থাকবে- সকল সুফি তাঁকে সম্মান দেবেন। তিনি হচ্ছেন হযরত আবু আলী ফজল বিন মুহাম্মদ ফারমাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি কখনও তাঁর মুর্শিদের হক্ককে আদায় করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি বা অলস ছিলেন না। তিনি যাবতীয় দুনিয়াবী বস্তু থেকে দূরে সরে গেছেন। আর এ দুনিয়াবিমুখতার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উচ্চ পর্যায়ের শায়খের [গুরজানী রাহিমাহুল্লাহর] আধ্যাত্মিক মূখপাত্র [জবান-ই-হাল] বানিয়েছেন।

নশ্বর এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ

যুগের এক শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত শায়খ আবু আলী ফারমাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৪৭৭ হিজরি সনে [মতান্তরে ৫১১ হি.] মায়াবী এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁকে ফারমাদের নিকটেই সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর সমাধি বর্তমান মাশাদ শহর থেকে ২০ কিলোমিটর দূরে অবস্থিত।

ধন্য হয়েছে যাঁর পদধূলিতে ইরান-তুরানের তুস ও ফারমাদ
অধিষ্ঠিত করো প্রভু তাঁকে উচ্চতর মাক্বামে এই তো ফরিয়াদ।

নকশবন্দিয়া তরিকা মুতাবিক হযরত ফারমাদী রাহিমাহুল্লাহর পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত শায়খ খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা এখন তাঁর জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনায় নিমগ্ন হবো। আল্লাহর নিকট তাওফিক কামনা করছি।

হযরত শায়খ খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৫৩৫ হিজরি, সমাধি- বাইরাম আলী, মার্ভ, তুর্কেমেনিস্তান।

তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের আ'রিফ বিল্লাহ। সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্তম্ভতূল্য। তিনি ছিলেন একাধারে ইমাম, বড়ো মাপের আ'লিম এবং ওলিআল্লাহ। তরিকতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যুগের শায়খ। তাঁর মুরিদরা দ্রুত উচ্চতর মাক্বামে পৌঁছুয়ে যেতেন। এটা ছিলো হযরতের এক ধরনের কারামত। বর্তমান তুর্কেমেনিস্তানের মার্ভ শহরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর খানক্বায় দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে ভীড় জমাতো।

জন্ম ও শিক্ষা

হামাদান শহরের বুজানজিদ নামক স্থানে ৪৪০ হিজরি সনে হযরত ইউসুফ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। নিজ এলাকায় তিনি প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর ১৮ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় তখনকার মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে চলে যান। তখনকার যুগের শাফিঈ মাজহাবের একজন শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ছিলেন হযরত শায়খ ইব্রাহিম ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ ফাইরুজাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত হামাদানী তাঁর নিকট হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রের ওপর অধ্যয়ন করেন। এছাড়া বাগদাদের বিখ্যাত আলিম আবু ইসহাক শিরাজীর সঙ্গ লাভে ধন্য হন।

একজন মেধাবী ছাত্র ও পরবর্তীতে [হানাফি] ফকীহ হিসেবে হযরত ইউসুফ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহর সুনাম অচিরেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ফিকাহ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই সূত্র হিসেবে অধিষ্ঠিত হোন। অধিকাংশ শাস্ত্রবিদ তাঁর বক্তব্য ও মতামত গ্রহণ করে নিতেন। বাগদাদে তিনি 'ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার' হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর সুনাম ইসফাহান, বুখারা, সমরকন্দ, খাওয়ারিজম ও মধ্য-এশিয়ায় দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

ইলমে তাসাওউফের সন্ধানে

জীবনের শেষের দিকে তিনি দুনিয়াকে পেছনে ফেলে খিলওয়াত [নির্জনতা] অবলম্বন করেন। সারাক্ষণ কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা ও সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শায়খ আবদুল্লাহ গুয়াইনী ও শায়খ হাসান সিমনানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সঙ্গ লাভ করেন। কিন্তু মুর্শিদ হিসেবে তিনি সে যুগের শাইখুল মাশাইখ হযরত আবু আলী ফারমাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গ্রহণ করে নেন। আর তাঁর কাছ থেকেই তরিকতের খিলাফত লাভ করেন।

হযরত হামাদানী রাহিমাহুল্লাহ নফসের বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদে লিপ্ত হন। শেষ পর্যন্ত তিনি যুগের 'গউস' এর মর্যাদা লাভ করেন। তিনি 'হক্বিক্বাতের বাস্তবতা ও বৃষ্টি', 'আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শহর' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হন। শেষ বয়সে তিনি মার্ভে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি একজন 'কারামতওয়ালা' ওলি ছিলেন।

বিভিন্ন ঘটনা

১. বাগদাদে থাকাকালে হযরত ইউসুফ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহ নিয়মিত বয়ান করতেন। ইলমে তাসাওউফের ওপর তাঁর এসব বয়ানে অনেক ওলিআল্লাহরা পর্যন্ত শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকতেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি তখনো অল্প বয়সের নওজোয়ান। একদিন হযরত হামাদানী তাঁকে বললেন, 'আপনিও বয়ান করুন।' হযরত জিলানী বললেন, 'হযরত! আমি তো আরব নই। বাগদাদের এসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে আমি কিভাবে বয়ান করবো?'

খাজা ইউসুফ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, ''আপনি ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে পার্থক্য, আরবি সাহিত্য এবং তাফসিরুল কুরআনের ওপর অভিজ্ঞ। মিম্বরে আরোহণ করে বয়ান করার যোগ্য ব্যক্তি আপনার মতো আর কজন আছে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি আপনাকে- যার মূল, কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা পৃথিবী ও আকাশব্যাপী বিস্তৃত।''

বলাই বাহুল্য, হযরত হামাদানীর এরূপ বক্তব্য শেষে গউসুল আজম হযরত আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি বয়ান পেশ করতে খুব উৎসিহত হন এবং ইলমে তাসাওউফের ওয়াজ-নসিহত দ্বারা সুলুকের রাস্তার নূরকে যুগ যুগ ধরে আগত সালিকদের জন্য বিচ্ছুরিত করে যান।

২. একদা এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দরবারে এসে হাজির হলেন। কাকুতি-মিনতি করে বললেন, ‘‘হুজুর! ফ্রনকরা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। আপনি দুআ করুন যাতে সে আমার শূন্য বুকে ফিরে আসে।’’ তিনি বললেন, ‘‘ধৈর্য ধরুন। বাড়িতে ফিরে যান। শিঘ্রই সে ফিরে আসবে।’’

মহিলা বাড়িতে ফিরে গেলেন। দেখলেন সত্যিই তাঁর ছেলে ফিরে এসেছে। মহিলা জানতে চাইলেন, কী হয়েছিল, কেথায় ছিলে, কিভাবে আসলে? সে বললো, ‘‘আমি কন্সটান্টিনিপোলে বন্দী হই। প্রহরীরা আমাকে ঘিরে রেখেছিল। হঠাৎ আমি এক ব্যক্তিকে সেখানে দেখলাম যাকে ইতোমধ্যে কোনোদিন দেখি নি। চোখের পলকে তিনি আমাকে এখানে - বাড়িতে নিয়ে আসলেন।’’ এ আশ্চর্য কারামত সম্পর্কে অবগত হয়ে মহিলা হযরত হামাদানী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে ফিরে আসলেন ও সব কথা বললেন। তিনি মন্তব্য করলেন, ‘‘আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে আপনি কেনো এতো আশ্চর্য হচ্ছেন?’’

৩. একদিন তিনি একদল সুফির সম্মুখে মা’রিফাতের জ্ঞানের ওপর হৃদয়োন্মুচনী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে দুজন আধ্যাত্মিকতার নূর দ্বারা অনালোকিত আলিম উপস্থিত ছিলেন। হযরতের কথাগুলোর মর্ম না বুঝে তারা প্রতিবাদ জানালেন: ‘‘আপনি চুপ থাকুন! আপনি বিদআত সৃষ্টি করছেন।’’

তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: ‘‘যেসব ব্যাপার তোমাদের বোধগম্য নয় ওসব নিয়ে মন্তব্য করো না। এখানে উপস্থিত থাকার চেয়ে তোমাদের মৃত্যু হওয়াই উত্তম।’’ কথা শেষ হতে না হতেই ঐ দুজন মৃত্যুর কোলো ঢলে পড়লো।

৪. হযরত ইবনে হাজর হাইসামী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর রচিত ‘‘ফাতওয়ায়ে হাদিসিয়্যা’’ কিতাবে উল্লেখ করেন, ‘‘আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে আবি আসরান- যিনি ছিলেন শাফিঈ মাজহাবের একজন ইমাম, তিনি বলেন, ‘আমি যখন ইলমে দ্বীনের সন্ধানে অগ্রসর হলাম

তখন নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইবনে সাক্কার সঙ্গ লাভ করি। আমরা প্রায়ই ওলিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। আমরা লোকমুখে শুনলাম বাগদাদে ইউসুফ হামাদানী নামক একব্যক্তি অবস্থান করছেন যাকে গউস বলা হয়। তিনি নাকি যেখানে ইচ্ছে সেখানে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন ও নিরুদ্দেশ হতেও সক্ষম। সুতরাং আমি, ইবনে সাক্কা ও (তখনও যুবক) আবদুল কাদির জিলানী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

পথিমধ্যে ইবনে সাক্কা বললেন, "আমি ইউসুফ হামাদানীকে এমক একটি প্রশ্ন করবো যার উত্তর তিনি দিতে পারবেন না।' আমি বললাম, 'আমিও তাঁকে একটি প্রশ্ন করবো এবং দেখবো দিনি কী উত্তর দেন।' কিন্তু আবদুল কাদির জিলানী বললেন, 'হে আল্লাহ! হযরত হামাদানীর মতো একজন ওলিকে প্রশ্ন করা থেকে আমাকে বিরত রাখুন! আমি বরং তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বরকত ও ঐশী জ্ঞান লাভের জন্য দুআ করতে বলবো।"

আমরা হযরতের হুজরায় প্রবেশ করার পর তিনি পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করলেন। ঘন্টা খানেক পরে আমাদের সম্মুখে আসলেন। তিনি প্রথমে ইবনে সাক্কার দিকে রাগান্বিত হয়ে তাকিয়ে বললেন, "হে ইবনে সাক্কা! তোমার কী স্পর্ধা যে, আমাকে আটকানোর জন্য প্রশ্ন করতে চাও?" উল্লেখ্য তিনি ইবনে সাক্কার নামই জানতেন না। এরপর তিনি প্রশ্ন ও এর উত্তর দিলেন। ইবনে সাক্কা তখনও একটি কথাই বলেন নি। এরপর তিনি ইবনে সাক্কাকে বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, কুফরের অগ্নি তোমার অন্তরে প্রজ্জলিত আছে!" তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আবদুল্লাহ! তুমিও কী আমাকে প্রশ্ন করবে ও উত্তরের অপেক্ষায় থাকবে?" এরপর তিনি আমাকে প্রশ্ন ও এর উত্তর বলে দিলেন। তিনি বললেন, "আমার প্রতি তোমার বেআদবির কারণে লোকজন তোমাকে হারিয়ে অনুতপ্ত হবে।"

অবশেষে তিনি আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে তাকালেন। বললেন, "হে আব্দুল কাদির! আমার প্রতি সঠিক মর্যাদাবোধের মাধ্যমে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করেছো। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি বাগদাদের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হবে। তুমি মানুষের পথপ্রদর্শক হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার যুগের প্রত্যেক ওলি তোমার প্রতি নতজানু অবস্থায় আনুগত্য প্রকাশ করবে।"

ইবনে হাজর হাইসামী বলেন, সত্যিই আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওলায়তের সর্বোচ্চ মাক্বামে আরোহণ করেছিলেন। ইবনে সাক্বা ইসলামী জ্ঞানে মেধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর যুগের সকল আলিম থেকে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে বাহাস করে তিনি জয়ী হতেন। খলিফা তাকে সভাসদবর্গের সদস্য করেন। একদিন খলিফা তাকে বিজান্তিয়ামের সম্রাটের নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। সেখানে যেয়ে তিনি খ্রিস্টান সকল পাদ্রীদের সঙ্গে বাহাসের আহ্বান জানান। বাহাসে তিনি সবাইকে পরাজিত করেন। তার সম্মুখে উত্তর দিতে তারা হিমশিম খাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো তারা সবাই ইবসে সাক্বার ছাত্র বৈ নয়।

এদিকে ইবনে সাক্বা বিজান্তিয়ামের সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাকে স্বীয় পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে ইবনে সাক্বার চোখ পড়লো সম্রাটের পরমাসুন্দরী মেয়ের ওপর। সাথে সাথেই তিনি মেয়েটির প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি সম্রাটকে প্রস্তাব দিলেন, আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী। সম্রাট রাজী হলেও তাঁর মেয়ে বললো, এক শর্তে আমি রাজী হবো, ইবনে সাক্বাকে স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে। ইবনে সাক্বা রাজী হয়ে গেলেন! তিনি খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। বিবাহের কিছুদিন পরই তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে রাজপ্রাসাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হলো। তিনি শহরের ভেতর ভিক্ষা করে জীবনরক্ষা করতে লাগলেন। অল্প ব্যক্তিই তাকে খাবার দিত। তার মুখমণ্ডল অন্ধকারে ছেয়ে গেলো।

একদিন তিনি এক পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন। ঐ ব্যক্তি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার এ অবস্থা কেনো?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি এক প্রলোভন দ্বারা প্রতারিত হয়েছি।" আমি বললাম, "আপনি কী পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত বলতে পারেন?" বললেন, "সব ভুলে গেছি শুধু এটুকু ছাড়া,

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

'বার বার কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হতো!' [১৫:২]

বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি তখন কাঁপছিলেন। যেনো শীঘ্রই শেষ নিঃশ্বাস ফেলবেন। আমি তাকে কাবার দিকে বার বার ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি বার বার বিপরীত দিকে ঘুরে যাচ্ছিলেন। তার মৃত্যু উপস্থিত হলো। বললেন, "হে আল্লাহ! তোমার প্রিয়জন ইউসুফ হামাদানীর সঙ্গে বেআদবির ফলাফল এটি।"

মূল্যবান বাণী

১. একদিন হযরত খাজা আন্তাকী রাহিমাহুল্লাহ প্রচণ্ড ভাবানুরাগে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। তিনি তাঁর ব্যবসা ও বাড়িসহ দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিলেন। চলে গেলেন একান্ত নির্জনে। খাজা ইউসুফ হামাদানী এই সংবাদ পেয়ে হযরত আন্তাকীকে নসিহত করলেন" "তুমি একজন গরীব ব্যক্তি। তোমাকে স্ত্রী-সন্তাদির দেখভাল করতে হয়। তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব তোমার নিজের ওপর বর্তায়। সুতরাং এগুলোর প্রতি উদাসীনতা যেমন অযৌক্তিক তেমনি শরীয়তেও তা গ্রহণযোগ্য নয়।"

২. একদা এক দরবেশ হযরতের দরবারে উপস্থি হলেন। দরবেশ বললেন, "আমি শায়খ আহমদ গাযালীর সুহবতে ছিলাম। তিনি তাঁর মুরিদানদের নিয়ে আহার করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে নিমগ্নতা ও মোহগ্রস্ততা আসলো। পরবর্তীতে বললেন, রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইমাত্র উপস্থিত হয়ে আমার মুখে এক লোকমা খাবার দিলেন।" ইউসুফ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহ একথা শুনে মন্তব্য করলেন: "এসব ব্যাপার হচ্ছে সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণকারী প্রাথমিক স্তরের ব্যক্তিদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা মাত্র।" তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এরূপ অন্তর্দৃষ্টি হলো সুলুকের প্রাথমিক অবস্থা- শেষেরটি নয়।

৩. তিনি একদা তাঁর মুরিদ আবু সাদকে বললেন: "আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, বাদশাহদের দরবারে যাবে না। সর্বদা নিশ্চিত করবে যাকিছু ভক্ষণ করছো তা হারাম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।"

৪. কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "যখন আল্লাহর ওলিগণ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান তখন আমরা কী করবো?" তিনি বললেন, "তাঁদের কথা ও উপদেশবাণীর পুনরাবৃত্তি করো।"

হযরতের ইন্তিকাল

পৃথিবীতে যারাই এসেছেন তারাই আবার চলে গেছেন। আজ যারা জীবিত কাল তারা মৃত। কাল যারা আসবেন পরশু তারাও চলে যাবেন। এটাই আল্লাহর চিরন্তন বিধান। যুগের এই শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত শায়খ ইউসুফ হামাদানীও একদিন পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আখিরাতের অনন্ত জীবনের দিকে পাড়ি জমান। হিরাত থেকে মার্ভে যাত্রাকালে খুরাশান প্রদেশের হিরাত ও বাখশুরের মধ্যবর্তী বামিইন নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর খলিফা হযরত আহমদ ইয়াসাভীকে বললেন, সূরা ইয়াসীন ও নাযিয়াত তিলাওয়াত করতে। হিজরি ৫৩৫ সনের ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। মৃত্যুকালে হযরত ইউসুফ হামাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স হয়েছিলো নব্বুই বছর থেকে বেশি। মার্ভ শহরে তিনি সমাহিত হয়েছেন। তাঁর সমাধির পাশেই একটি বড়ো মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরতের খুলাফাবৃন্দ

হযরত শায়খ আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ কয়েকজন খলিফা রেখে যান। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কজন হলেন:

১. হযরত শায়খ খাজা আবদুল্লাহ বারাক্বি খাওয়ারিজমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৫৫৫ হি., উজবেকিস্তান]

২. হযরত শায়খ খাজা হাসান আন্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৫৫২ হি., বুখারা, উজবেকিস্তান]

৩. হযরত শায়খ খাজা আহমদ ইয়াসাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৫৬২ হি., কাজাখস্তান]

৪. হযরত শায়খ খাজা আবদুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৫৭৫ হি., উজবেকিস্তান]

ধন্য হলো মার্ভের মাটি মহান এক ওলির পরশে।

নকশবন্দিয়া তরীকার স্বর্ণালী সিলসিলা মুতাবিক পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত শায়খ খাজা আবদুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইনশাআল্লাহ, এখন আমরা তাঁরই জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করবো। আল্লাহর পবিত্র দরবারে তাওফিক কামনা করছি।

হযরত শায়খ খাজা আবদুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৫৭৪ হিজরি, সমাধি- গুজদাওয়ান, বুখারা, উজবেকিস্তান।

“কারো কারো নূর তাদের জিকিরের অগ্রগামী, কারো কারো জিকির তাদের নূরের অগ্রগামী। কেউ আছে যে জিকরে জলি দ্বারা হৃদয়কে করে আলোকিত, আর কেউ আছে যার হৃদয় আগেই আলোকিত হয়েছে এবং সে জিকরে খফির মাঝে ডুবন্ত।”

-শায়খ ইবনে আতাউল্লাহ ইস্কান্দরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তাঁকে ‘কারামতের শায়খ’ বলে সম্বোধন করা হতো। যার ঐজ্জ্বল্যতা ছিলো যেনো দুপুরের সূর্যালোক। তাঁর যুগের উঁচু আধ্যাত্মিক স্তরের শায়খ। তিনি ছিলেন ‘আরিফে কামিল’ ও ইলমে তাসাওউফের মহাসমুদ্র। তিনি ছিলেন ‘খাজাগান’ [মধ্য এশিয়ার শায়খবৃন্দ] সুফিদের অগ্রদূত। তিনি হলেন যুগশ্রেষ্ঠ শায়খুল মাশাইশ খাজা আবদুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

জন্ম ও শিক্ষা

তাঁর পিতার নাম ছিলো শায়খ আবদুল জামিল রাহিমাহুল্লাহ। বিজান্টিন সময়ের একজন সুপরিচিত আলিম, সুফি-দরবেশ হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিলো। হযরত গুজাদাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহর মাতা ছিলেন উচ্চ বংশের শাহজাদী। তিনি ছিলেন এ্যানালোটিয়ার একজন সেলজুক বাদশাহর মেয়ে।

বর্তমান উজবেকিস্তানের বুখারার অদূরে গুজদাওয়ান নামক একটি ছোট্ট শহরে হযরত আবদুল খালিক রাহিমাহুল্লাহ ৪৩৫ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন মালিকী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

শৈশবকালে তিনি কুরআন শিক্ষা ও তাফসির অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে ইলমে হাদিস, আরবি ব্যাকরণ ও ফিকাহ শাস্ত্রের ওপর অধ্যয়ন করেন উস্তাদ শায়খ সদরুদ্দীন রাহিমাহুল্লাহর নিকট। ইলমে শরীয়তের ওপর উচ্চতর জ্ঞানলাভের পর তিনি 'জিহাদুন নাফস' তথা নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। তবে আত্মশুদ্ধির একমাত্র উপায় হচ্ছে কোনো কামিল মুর্শিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করে সুহবত লাভ করা। হযরত গুজদাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহ মুর্শিদের সন্ধানে সফরে বের হলেন ও দামেস্ক শহরে এসে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসা থেকে বহু ছাত্র ইলমে শরীয়তের ওপর উচ্চতর জ্ঞানলাভ করেন। অচিরেই মাদরাসাটি সুনাম অর্জন করে এবং পূর্ব পশ্চিম তথা মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য ছাত্র এসে লেখাপড়া করতে থাকেন।

শায়খ ইউসুফ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে

হযরতের তরীকতের শায়খ ছিলেন যুগের বিখ্যাত ওলি ও শায়খুল মাশাইখ হযরত ইউসুফ হামাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। দীর্ঘদিন স্বীয় পীর সাহেবের সুহবতে থেকে তিনি খিলাফত লাভ করেন। 'হাদাইকুল ওয়ারদিয়া' নামক কিতাবে আছে, তিনি একদা হযরত খিজির আলাইহিসসালামের সাক্ষাৎ পান। হযরত গুজদাওয়ানীকে নিয়ে হযরত খিজির এক দীর্ঘ ভ্রমণে যান ও তাঁকে আধ্যাত্মিক জগতের অনেক গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত করেন।

হযরত হামাদানী রাহিমাহুল্লাহ বুখারায় অবস্থানকালে গুজদাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সুহবত লাভে ধন্য হন। এরপর তাঁর পীর সাহেব বুখারা থেকে অন্যত্র চলে যান। এদিকে খাজা আবদুল খালিক নিজেকে কঠোর সাধনায় লিপ্ত করেন। দীর্ঘদিন রিয়াযত-মুজাহাদা করলেও তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থা গোপন রাখেন। দামেস্কে যাওয়ার পর হযরতের হাতে অসংখ্য মানুষ বাইআত গ্রহণ করে মুরিদ হয়।

একটি কারামত

সেদিন ছিলো মুহাররমের ১০ তারিখ। অনেক লোক উপস্থিত হয়েছে হযরতের খানক্বায়। তারা বয়ান শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায়। হযরত ইলমে মা'রিফাত ও হাক্বিক্বাকের ওপর

বয়ান শুরু করলেন। হঠাৎ এক নওজোয়ান দরবেশ মজলিসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরনে ছিলো মোটাসুতার তালিযুক্ত একটি জুব্বা। কাঁধে ঝুলছে একখানা জায়নামায। তিনি সামনে এগিয়ে এক কোণে বসে গেলেন। খাজা সাহেব নওজোয়ানের দিকে তাকালেন মাত্র। এরপর কিছুক্ষণ পরে ঐ যুবক দাঁড়িয়ে বললেন, "হে খাজা! যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি গ্রহণ করতেন [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তিনি বলেছেন:

إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنُ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

-"মু'মিনের অভ্যন্তরের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কারণ অবশ্যই সে আল্লাহ আ'যযা ওয়াজাল্লাহর নূরে দর্শন করে।"
ইয়া শায়খ! এ হাদিসের পেছনে কোন্ প্রজ্ঞা বিদ্যমান?"

খাজা আবদুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন: "এই হাদিসের পেছনে প্রজ্ঞা হলো তুমি পাদ্রীদের কোমরবন্ধ কর্তন করে ঈমানের নূরে আলোকিত হবে।"
যুবক বললেন, "আস্তাগ্বফিরুল্লাহ! আমার কী পাদ্রীদের একটি কোমরবন্ধ আছে?"
খাজা সাহেব উপস্থিত শ্রোতাদেরকে বললেন, "যাও! তার জুব্বা খুলে দেখো।"
লোকজন তার জুব্বা উত্তোলন করে দেখলো সত্যিই তার কোমরে একটি [অমুসলিমের পরিচিতি নির্ণয়ক] কোমরবন্ধ আছে! যুবক সাথে সাথে কোমরন্ধ কেটে ফেলে হযরতের সম্মুখে এগিয়ে এসে বললেন, হে শায়খী! আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন।"[26]

নশবন্দিয়া তরীকার ৮টি মূলনীতি

খাজা আবদুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নকশবন্দিয়া তরীকার ৮টি মূলনীতি প্রবর্তন করেন। সালিকদের জন্য এগুলো অনুসরণ করা একান্ত জরুরি। নিচে এগুলোর বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

১. হুশ দর দম [চেতনশীল শ্বাস-নিঃশ্বাস]

হুশ অর্থ মন, দর অর্থ ভেতর এবং দম অর্থ শ্বাস-নিঃশ্বাস। এ ব্যাপারে খাজা সাহেব বলেন: "প্রত্যেক সালিক তার শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। শ্বাস গ্রহণ ও ছাড়ার সময় মনের

---

[26] নাফাহাতুল উন্স, পৃ. ৬১৪

মধ্যে জাগ্রত রাখতে হবে আল্লাহর উপস্থিতি। কারণ প্রতিটি শ্বাস ও নিঃশ্বাস যদি আল্লাহর স্মরণে হয় তাহলে সালিক সত্যিকার অর্থে জীবিত থাকলো। আর যে শ্বাস-নিঃশ্বাস আল্লাহর জিকির ছাড়া গাফিলতির মধ্যে অতিবাহিত হলো, তা মৃত লোকের মতো হলো। সে তখন তার প্রভু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।”

২. নজর বর ক্বদম [পদের প্রতি দৃষ্টি রেখো]

প্রত্যেক সালিককে চলার সময় নিজের পায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। বিনা কারণে এদিক-সেদিক তাকানো যাবে না। এতে হৃদয়ের উপর পর্দা পড়ে যায়। কারণ অধিকাংশ পর্দা সৃষ্টি হয় প্রাত্যহিক জীবনের চোখের দৃষ্টি থেকে। অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যাবলী মনের ভেতর জায়গা করে নেয়। এ থেকেই মানুষের মন কলুষিত হয়।

৩. সফর দর ওয়াতন [বাসস্থানের দিকে ভ্রমণ]

সালিককে তার নিজের বাড়ির দিকে সফর করতে হবে। এর অর্থ হলো সৃষ্ট জগত থেকে সৃষ্টিকর্তার দিকে ভ্রমণ। একটি হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমি আমার প্রভুর দিকে চলে যাচ্ছি এক স্তর থেকে অপর উত্তম স্তর হয়ে এবং এক মাক্বাম থেকে উত্তম মাক্বামে।” বলা হয়ে থাকে, সালিককে হারাম আকাঙ্ক্ষার স্তর থেকে হালাল আকাঙ্ক্ষার স্তরে উন্নীত হয়ে ঐশি উপস্থিতির দিকে ভ্রমণ করতে হবে।

৪. খালওয়াত দর আঞ্জুমান [লোকসমাগমে নির্জনতা]

খালওয়াত অর্থ নির্জনতা। এর অর্থ হচ্ছে বাহ্যিকভাবে মানুষের সাথে মেলামেশায় থাকলেও অভ্যন্তরীণভাবে খালওয়াত অবলম্বন করা। আর একমাত্র নির্জনতার মধ্যেই আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব সম্ভব। খালওয়াত মূলত দু ধরনের: ১. বাহ্যিক [শারীরিক] খালওয়াত ও ২. অভ্যন্তরীণ [মানসিক] খালাওত। প্রথমটির অর্থ হলে নিজেকে স্বশরীরে সত্যিকার অর্থে মানুষের নিকট থেকে দূরে রাখা। দ্বিতীয়টির অর্থ হলো মানুষের মাঝে থেকেও নিজেকে আত্মিকভাবে একাকী বা মানুষের নিকট থেকে দূরে রাখা।

৫. ইয়াদ করদ্ব [জরুরি জিকির]

ইয়াদ অর্থ জিকির। আর করদ্ব হচ্ছে জিকিরের নির্যাস। সালিককে জিহ্বা দ্বারা জিকির করতে হবে। এরপর সে এমন এক স্তরে উপনিত হবে যে, তার জিকির মুরক্বাবায় পরিণত হবে। এই স্তরে পৌঁছুতে হলে নিয়মিত নফি [বিলুপ্তি] ও ইসবাত [স্থিতি] জিকির করতে হবে। নফি হচ্ছে লা-ইলাহা এবং ইসবাত হচ্ছে ইল্লাল্লাহ। এই জিকির ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ বার করতে হবে প্রত্যেক দিন।

৬. বায গাশ্ত [ফিরে যাওয়া]

এটা একটি স্তর যা আসতে পারে সালিকের অনবরত নফি-ইসবাত জিকিরের মাধ্যমে। সে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ, "ইলাহী, আনতা মাক্বসুদি ওয়া রিদ্বাকা মাতলুবি" [হে প্রভু! আপনিই আমার উদ্দেশ্য এবং আপনার সন্তুষ্টি লাভই আমার লক্ষ্য"] -এর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। নফি-ইসবাত জিকির করতে করতে সলিক আল্লাহর চিরন্তন অস্তিত্ব অনুভব করে। সে তখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া জগতের সকল সৃষ্ট বস্তু থেকে গাফিল হয়ে যায়।

৭. নিগ্বাহ দাশ্ত [অনন্যচিত্ত হওয়া]

নিগ্বাহ অর্থ দৃষ্টি। এর অর্থ হলো সালিককে তাঁর হৃদয়ের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে এর ভেতর কোনো কলুষিত চিন্তা-চেতনাও প্রবেশ না করে। বলা হয়ে থাকে যদি কোনো সালিক নিজের হৃদয়কে ১৫ মিনিটের জন্যও কলুষযুক্ত চিন্তা-চেতনা-ধারণা থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয় তবে তা-ও একটি বিরাট প্রাপ্তি হিসেবে বিবেচিত। একজন সুফি বলেন, "আমি যেহেতু ১০ রাতদিনের জন্য আমার হৃদয়কে কলুষমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম, তাই সে [আমার হৃদয়] আমাকে দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ কলুষমুক্ত রেখেছে।"

৮. ইয়াদ দাশ্ত [স্মরণ]

এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর উপস্থিতি থেকে এক মুহূর্তের জন্য গাফিল না থেকে তাঁর স্মরণের মধ্যে ডুবে থাকা। সালিককে এই স্তরে এসে আল্লাহর মুশাহাদার মধ্যে সর্বদা নিমগ্ন থাকা

দরকার। এরই মাধ্যমে তার মধ্যে 'আনওয়ার আজ-যাতুল আহাদিয়্যাহ' [আল্লাহর যাতের এককত্বের আলো] এর চেতনা জাগ্রত হবে। সে তখন ফানাফিল্লাহর স্তরে উন্নীত হবে।

মহামূল্যবান বাণী

১. প্রত্যেক সালিকের সর্বিক অবস্থা হতে হবে জ্ঞান, আত্মশুদ্ধি ও পরহেজগারির মধ্যে।

২. সুনাম লাভের অনুসন্ধান করবে না। কারণ সুনাম লাভের অনুসন্ধানে আছে বিপর্যয়।

৩. অপরের কাজকর্মে নিজেকে জড়াবে না। কখনও বাদশাহ ও আমির-উমারার নিকটবর্তী হবে না।

৪. অল্প কথা বলবে, অল্প খাবে, অল্প ঘুমাবে ও মানুষের সঙ্গে অল্প মেলামেশা করবে। বেগানা মহিলা, সুদর্শন ছেলে, ধনী ব্যক্তি ও দুনিয়াদারদের থেকে দূরে থাকবে।

৫. হালাল খাবে এবং সন্দেহযুক্ত খাবার গ্রহণ করবে না।

৬. হট্টহাসি হাসবে না। অট্টহাসি হৃদয়ের সংবেদনশীলতাকে ধ্বংস করে দেয়।

৭. তোমার বহিরাঙ্গকে অলঙ্করণ থেকে মুক্ত রাখো। কারণ সাজগুজ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ গরীবত্বের নিদর্শন। তুমি হবে বাইরে ফকির ও ভেতরে ধনী।

৮. কারো সাথে ঝগড়া করবে না ও কখনও কারো নিকট সাহায্য চাইবে না।

৯. নিশ্চিত হও, তুমি যেনো অপরের বোঝায় পরিণত না হও।

১০. দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের ওপর কোনো ভরসা রেখো না।

১১. নিজের হৃদয়কে নীচতা ও বদান্যতা দ্বারা পূর্ণ রেখো। নফসকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখো। চোখ দুটো অশ্রু দ্বারা সিক্ত করো। তোমার সকল আমল ও কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করো।

১২. পুরাতন বস্ত্র পরো ও সাথী হিসেবে গরীবদের রেখো।

১৩. তোমার গৃহকে ইবাদতখানা বানাও এবং হক্ক আল্লাহ তা'আলাকে তোমার পথপ্রদর্শক করো।

হযরতের খুলাফাবৃন্দ

খাজা আবদুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বেশ কয়েকজন খলিফা ছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম নিচে উল্লেখিত হলো।

১. শায়খ আহমদ সিদ্দীক বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
২. কবিরুল আউলিয়া শায়খ আরিফ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৩. শায়খ সুলাইমান কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৪. শায়খ আরিফ রিওগারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [খিরক্বান]।

ইন্তিকাল

এ নশ্বর দুনিয়ার বুকে কেউই চিরস্থায়ী নন। আমাদের এখনে আসা তো কদিনের মুসাফিরী মাত্র। যুগের এক সুপ্রসিদ্ধ শায়খুল মাশাইখ হযরত শায়খ খাজা আবদুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে মায়াবী ধরার কোল থেকে একদিন বিদায় গ্রহণ করেন। অধিকাংশ মতে হযরতের ইন্তিকালের তারিখ ছিলো ১২ই রবিউল আউয়াল, ৫৭৪ [মতান্তরে ৫৭৫] হিজরি। তিনি তাঁর নিজস্ব শহর গুজদাওয়ানে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি সেখানেই সমাহিত হন।

গুজদাওয়ানের খাজা লুকিয়ে আছেন মৃত্তিকার ভেতর।
প্রভু তুমি বুলন্দ করো তাঁর মাক্বামাত ও স্তর।

নকশবন্দিয়া সিলসিলানুযায়ী পরবর্তী শায়খুল মাশাইখ হচ্ছেন খিরক্বানের হযরত শায়খ খাজা আরিফ রিওগারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফিক ছাড়া কারো পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। হে প্রভু! আমরা তোমার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী সদা-সর্বদা।

হযরত শায়খ খাজা আরিফ রিওগারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৬১৬ হিজরি, সমাধি- রিওগার, বুখারা, উজবেকিস্তান।

হযরত শায়খ আরিফ রিওগারি রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর খুব বেশি জানা যায় নি। তবে নকশবন্দিয়া তরিকার মাশাইখবৃন্দের জীবন ও সাধনার ওপর রচিত ‘নকশবন্দি মুজাদ্দিদী মাশাইখের জীবনী’[27] নামক গ্রন্থে যেটুকু বর্ণনা এসেছে তা-ই আমরা নিচে উপস্থাপন করছি।

তিনি ছিলেন আ’রিফ বিল্লাহ। তাঁর মধ্যে আভ্যন্তরীণ হাক্বিক্বাত সকল নূর ও ঔজ্জ্বল্যতাসহ আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর যুগের জ্ঞানের সূর্য ছিলেন, যিনি অন্ধকার আকাশকে আলোকিত করেন। তাঁকে বলা হতো মা’রিফতের বাগানের নূর।

হযরত আরিফ রিওগারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুখারা শহর থেকে ছয় মাইল দূরে এবং গুজদাওয়ান থেকে মাইল খানেক দূরে অবস্থিত রিওগার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনি শায়খ আবদুল খালিক্ব রাহিমাহুল্লাহর হাতে তরিকতের বাইআত গ্রহণ করেন। শায়খ তাঁকে প্রথমে খানক্বার দ্বাররক্ষী হিসেবে দীর্ঘদিন রেখে দেন। অবশেষে শায়খ একদিন তাঁকে ভেতরে প্রবেশ হওয়ার অনুমতি দেন। দীর্ঘ রিয়াজত মুজাহাদা শেষে শায়খ তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করেন।

স্বীয় শায়খের মৃত্যুর পর হযরত আরিফ রাহিমাহুল্লাহ বুখারার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন বরকতের সুঘ্রাণ। যুগের অসংখ্য মানুষের মন ও হৃদয় তাঁর বরকতে উন্মোচন হয়। অনেকে উচ্চ পর্যায়ের ওলি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সমসাময়িক বুজুর্গবৃন্দ

নিম্নের তিনজন শায়খসহ অনেক ওলিআল্লাহ তাঁর সমসাময়িক যুগে জীবিত ছিলেন।

---

[27] মাওলানা মাহবুব আহমদ ও কামরুজ্জামান নদভী ইলাহাবাদী রচিত মূল গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ “Biographies of Naqshbandi Mujaddidi Mashaikh” থেকে।

১. শায়খ নাজমুদ্দিন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৬১৭ হি.]। তিনি ছিলেন কুবরাবিয়া সুফি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খাওয়ারিজম শহরের অধিবাসী ছিলেন।
২. শায়খ শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৬৩২ হি.]। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাস করতেন বাগদাদে।
৩. শায়খ মুইনুদ্দীন চিশতি আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৬৩৩ হি.] তিনি ভারতবর্ষে বিখ্যাত চিশতিয়া সুফি তরিকার প্রবর্তক ছিলেন। তিনি ভারতের আজমিরে বাস করতেন।

বাণীসমূহ

হযরতের খলিফাবৃন্দ তাঁর অনেক বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। নিচে এর কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

১. আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখো যতক্ষণ না তিনি তোমার উস্তাদে পরিণত হোন।

২. মৃত্যুর স্মরণকে তোমার সাথী বানাও।

৩. ভবিষ্যতের বেশি আশা বর্তমানে আল্লাহর রাস্তায় প্রাপ্ত উত্তম বস্তুর ওপর পর্দা ফেলে দেয়।

৪. যে কেউ দৈনিক দশবার দুআ করবে: "হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পথপ্রদর্শন করুন। হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর বরকত নাজিল করুন। হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর থেকে সকল দুর্ভোগ দূর করে দিন" - তাঁকে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি ওলিদের দলে সংযুক্ত করবেন যাদেরকে 'আবদাল' বলে।

৫. [শরীয়তের ফরয] আমল ছাড়া কেউ যদি বেহেশত কামনা করে তাহলে তার আমলনামায় লেখা হবে গুনাহসমূহের গুনাহ। যে কেউ মনে করে এমনিতেই রাসূলুল্লাহর শাফায়াত লাভ করবে, তা মূলত তার জন্য একটি অহঙ্কারের কারণ হবে।

৬. এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, অনেক 'সালিহীন' [পরহেজগারদের] দেখা যায় অথচ 'সাদিক্বীনের' [সত্যবাদীদের] সংখ্যা খুব কম।

৭. কেনো যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মানুষের কাছে তা গোপন রাখবে। কারণ এটা প্রকাশ করলে তোমার ক্ষতি হবে। তারা না তোমাকে সাহায্য করতে সক্ষম, না তোমার যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারবে।

৮. হৃদয় তিন ধরনের: ১. পাহাড়ের মতো শক্ত হৃদয়, যাকে কোনোকিছুই নড়াতে পারে না। ২. একটি খেজুর বৃক্ষের মতো হৃদয়, যার মূল শক্ত কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা গতিশীল। ৩. একটি পালকের মতো হৃদয়, যাকে বাতাস ডানে-বামে উড়িয়ে দিতে পারে।

৯. যে কেউ তার গোপন বিষয় সংরক্ষণে আগ্রহী তাকে অবশ্যই লোকালয় থেকে দূরে থাকা চাই।

১০ তিনি বলেন: "হে আল্লাহ! যখনই আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন- দিন, কিন্তু অনুগ্রহ করে আপনার উপস্থিতি থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

রচনা

হযরত খাজা আরিফ রিওগারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলমে তাসাওউফের ওপর একখানা উন্নতমানের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এটির নাম ছিলো "আরিফনামা"। গ্রন্থটির এক কপি পাণ্ডুলিপি পাকিস্তানের খানক্কায়ে মূসা জায় শরীফ, দিরা ইসমাইল খান-এ এখনও সংরক্ষিত আছে।

শেষ জীবনে তিনি তাঁর খলিফা নির্বাচিত করেন খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনুউই রাহিমাহুল্লাহকে। সুতরাং মৃত্যুর পর তাঁর সকল মুরিদ তাঁরই সুহবত লাভ করেন।

চিরবিদায়

যুগের অসংখ্য ভক্ত-মুরীদানকে শেকের সাগরে ভাসিয়ে হযরত আরিফ রিওয়াকরি রাহমাতুল্লাহি ৬১৬ হিজরি সনের ১লা শাওয়াল ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরতের জন্মস্থান রিওগারেই তিনি সমাহিত আছেন। তবে বর্তমানে এই স্থানকে সাফিরকন বলে। এটি উজবেকিস্তানের বুখারা থেকে ৪৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

হযরত শায়খ আরিফ রিওগারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পর নকশবন্দিয়া সিলসিলা মুতাবিক পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত শায়খ খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনুউই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমার এখন তাঁরই জীবন ও কর্মের ওপর যেটুকু সম্ভব আলোচনা করবো। আল্লাহর নিকট আমরা তাওফিক কামনা করি।

হযরত শায়খ খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনুউই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৭১৬ (মতান্তরে ৭১৭) হিজরি, সমাধি- ওয়াবানকা [ভাবকেন্ত], উজবেকিস্তান।

তিনি নকশবন্দিয়া তরিকায় জিকরে জলির ওপর গুরুত্ব দিতেন। যুগের আরেক শায়খ হযরত খাজা কবিরুল আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারে তাঁর নিকট দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি কারণ হিসেবে বললেন, যুগের অনেক উচ্চ পর্যায়ের ওলি শেষ মুহূর্তে আমাকে বলেছেন, জিকরে জলির ওপর গুরুত্বারোপ করতে।

জন্ম

হযরত খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনুউই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬২৮ হিজরি সনে আনজির ফাগনি নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ গ্রামটি উজবেকিস্তানের বুখারা শহরের নিকটস্থ ওয়াবানার কাছে অবস্থিত। তিনি ছিলেন হযরত খাজা আরিফ রিওগারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ ও প্রধান খলিফা।

মাওলানা হাফিজুদ্দিন বুখারীর নেতৃত্বে বুখারার তখনকার উলামায়ে কিরাম তাঁর দরবারে উপস্থি হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "আপনি কোন কারণে জিকরে জলির ওপর গুরুত্বারোপ করছেন?" তিনি জবাব দিলেন: "এতেকরে নিদ্রামগ্নরা জেগে ওঠবে। অমনোযোগিরা শুনবে। তারা হয়তো হাক্কিক্বাতের রাস্তায় চলবে। শরীয়তের অনুসরণ করবে। আধ্যাত্মিকতার রাস্তায় চলবে।" মাওলানা হাফিজুদ্দিন বুখারী জবাব দিলেন: "আপনার নিয়ত অবশ্যই সঠিক। সুতরাং এই কর্ম (জিকরে জলি) আপনার জন্য ন্যায়সঙ্গত। তবে এ জিকির পালনের জন্য কিছু নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত করুন।" খাজা সাহেব বললেন: "জিকরে জলি ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ যার জিহ্বা গীবত ও মিথ্যাবাদিতা থেকে মুক্ত। সে হারাম এবং সন্দেহযুক্ত খাবার গলদ্ধকরণ থেকে দূরে অবস্থানকারী। তার হৃদয় রিয়াযুক্ত ও আন্তরিকতাহীন নয়। তাঁর অভ্যন্তরীণ চেতনা সত্য ছাড়া অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষী নয়।" একথা শুনে মাওলানা হাফিজুদ্দিন বুখারী নিরব হয়ে গেলেন।

হযরত মাহমুদ রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা ছিলেন হযরত নিযাম আলী রামিতানী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বর্ণনা করেন: "খাজা মাহমুদ রাহিমাহুল্লাহর যুগে একজন দরবেশ হযরত খিজির আলাইহিসসালামের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজকের যুগে আধ্যাত্মিক গুরু কে যার নিকট বাইআত গ্রহণ উচিত? বর্তনামে কোন ব্যক্তি পরহেজগারির মহাসড়কে চলমান আছেন?' খিজির আলাইহিসসালাম বললেন: 'তিনি হচ্ছেন খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনুউই।'"

একটি ঘটনা

হযরত খাজা রামিতানী বর্ণনা করেন, "একদিন রামিতান শহরে খোলা মাঠে একটি জিকিরের মাহফিল চলছিলো। এতে উপস্থিত ছিলেন খাজা মাহমুদ রাহিমাহুল্লাহর অনেক শাগরিদ ও মুরিদান। হঠাৎ খুব বড়ো একটি শ্বেত পাখি আকাশে উড়তে দেখা গেলো। পাখিটি হযরত আলী রামিতানীর উপরে এসে স্থির হয়ে পরিষ্কার ভাষায় বললো, "হে আলী! পুরুষত্বকে বিসর্জন করো না! সাহসী হও!" উপস্থিত জাকিরীন এ কথাগুলো শুনে এতোই প্রভাবান্বিত হলেন যে, সকলেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তারা হযরত রামিতানীকে জিজ্ঞেস করলো, "আমরা এইমাত্র কী দেখলাম ও কী শুনলাম?" তিনি জবাব দিলেন, "এই পাখি হচ্ছে খাজা মাহমুদ! আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি উপহার দান করেছেন যার ফলে তিনি পাখির বেশে উড়ে বেড়াতে সক্ষম। আজ তিনি কবিরুল আউলিয়ার খলিফা খাজা দিহকানের সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছেন। খাজা দিহকান মৃত্যুপথযাত্রী। খাজা দিহকান আল্লাহর নিকট আবদার জানিয়েছেন, হে আল্লাহ! তোমার কোনো বন্ধুকে আমার নিকট প্রেরণ করুন। সুতরাং হযরত মাহমুদের হাতে ধরেই খাজা দিহকান দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন।"

খুলাফাবৃন্দ

খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনুউই রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চারজন প্রসিদ্ধ খলিফা ছিলেন। তাঁরা হলেন:

১. খাজা নিযাম আলী রামিতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন হযরতের প্রধান খলিফা। তাঁরই মাধ্যমে নকশবন্দী সিলসিলা প্রসার লাভ করে।
২. খাজা আমীর হাসান ওয়াবকনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৩. খাজা আমীর হুসাইন ওয়াবাকনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৪. খাজা আলী আরগুন্দানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বুখারা থেকে ১৬ মাইল দূরে আরগুন্দান গ্রামে তাঁর সমাধি অবস্থিত।

ইন্তিকাল

হযরত খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনুউই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭১৫ হিজরি সনে বুখারার নিকটস্থ ওয়াবানকায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওবানকায়ই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

নকশবন্দিয়া তরিকার শাজারাহ মুতাবিক পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত খাজা আলী রামিতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এখন আমরা তাঁরই জীবনালোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাওফিক দান করুন।

হযরত খাজা আলী রামিতনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৭২১ হিজরি, সমাধি- খাওয়ারিজম।

তোমার দিকে আমা থেকে ধাবমান ভাঙ্গা হৃদয় বলতে এমন কোনো বস্তু নেই; বাস্তবে, আমা থেকে তোমার প্রতি ধাবমান দেহের সকল কোষই তো হৃদয়।
-আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তিনি ছিলেন ইসলামের এক পবিত্র পতাকা। প্রসিদ্ধ আলিম যার মাধ্যমে হৃদয়ে সংরক্ষিত মহামূল্যবান গোপন ধনের বাক্সের চাবি পাওয়া গেছে। যিনি অদৃশ্য জগতের অনেক রহস্য উন্মোচন করেছেন। তিনি আরিফদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন অফুরন্ত নিয়ামত, উপহার ও মর্যাদা। তিনি মানুষকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রাস্তা দেখিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন খাওয়ারিজমের বিখ্যাত ওলি শায়খ আলী রামিতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

জন্ম ও শিক্ষা

খাজা আলী রামিতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুখারা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত রামিতান নামক একটি গ্রামে ৫৯১ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথামিক শিক্ষা তাঁর জন্মস্থানেই শুরু হয়। তখনকার যুগে উজবেকিস্তানের বুখারা ছিলো জ্ঞানর্চার ক্ষেদ্র। সুতরাং হযরত রামিতানীকে উচ্চতর ইসলামী জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে দূরদেশে পাড়ি জমাতে হয় নি। বুখারায় যেয়ে তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, সিরাত ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। অচিরেই একজন বিশিষ্ট মুফতি হিসেবে তাঁর পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যে কোনো বিষয় সঠিক ফাতওয়াহ প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর মতো আর কেউ ছিলেন না।

তরিকতের সালিক বেশে

ইলমে শরীয়ত ছাড়াও আরেক আভ্যন্তরীণ জ্ঞান আছে। একে ইলমে হাক্বিক্বাত বা তাসাওউফ বলে। হযরত রামিতানী রাহিমাহুল্লাহ বাহ্যিক উচ্চতর জ্ঞানলাভ দ্বারা পুরোপুরি

সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। সুতরাং ছিনা থেকে ছিনায় যে হাক্বিক্বাতের জ্ঞান প্রতিস্থাপিত হয় সেটা কীভাবে লাভ করা যায় সে চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

তখনকার যুগের নকশবন্দিয়া শায়খুল মাশাইখের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বুখারার শায়খ মাহমুদ আনজির ফাগনুউই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং শায়খ রামিতানী তাঁরই হাতে তরিকতের বাইআত গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন স্বীয় পীর সাহেবের সুহবতে থেকে তিনি উচ্চ মাক্বামে আরোহণ করেন। এরপর শায়খ মাহমুদ তাঁকে খিলাফতের খিরক্বা দান করেন। তিনি অচিরেই 'আজিজান' নামে ভূষিত হন। ফার্সি শব্দ 'আজিজান' এর অর্থ হলো উচ্চতর মাক্বাম।

মূল্যবান বাণী ও ঘটনাবলী

১. তিনি বলেন, আমল করো- হিসেব করো না। নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে আমল করতে থাকো।

২. পবিত্র সত্তার উপস্থিতি অর্জনে সচেষ্ট হও। খাবার ও কথা বলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থেকো।

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

-হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ করো- আন্তরিক তাওবাহ।" [৬৬:৮]

উক্ত আয়াতাংশ আমাদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাওবাহর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তা-ই তিনি অবশ্যই এটি গ্রহণ করবেন। যদি গ্রহণ করার ইচ্ছে না থাকতো, তাহলে তিনি তোমাকে তাওবাহ করতে বলতেন না।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত ও প্রত্যেক দিনে ৩৬০ বার মু'মিনের হৃদয়ের দিকে তাকান।" এর অর্থ হৃদয়ের মধ্যে ৩৬০টি প্রবেশপথ আছে। আর প্রত্যেক দেহযন্ত্রে আছে ৩৬০টি মূল- এর সবগুলোই হৃদযন্ত্রের সাথে যুক্ত। সুতরাং হৃদয় যদি জিকরুল্লাহর মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে থাকে, তাহলে দেহের

প্রতিটি অংশেই প্রভুর দৃষ্টির প্রভাব পড়বে। ফলে প্রত্যেক দেহযন্ত্রের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্যের ছাপও পড়বে। সুতরাং হৃদয় দ্বারা আল্লাহর জিকির করলে প্রভুর দয়ার দৃষ্টি সমগ্র দেহব্যাপী বিস্তৃত হবে।

৫. হযরত রামিতানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁতি ছিলেন। এটা তাঁর রোজগারের উপায় ছিলো। বিখ্যাত ফার্সি কবি ও শায়খ জালালুদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরতের স্মরণে কবিতার দুটি লাইন রচনা করেন। নিম্নের দুটি লাইন যে হযরত রামিতানীকে উদ্দেশ্য করে লিখা হয়েছিল তার সাক্ষ্য প্রদান করেন আল্লামা জামি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, "আমি, ফকির জামি একজন ওলির মুখে শুনেছি যে, নিঃসন্দেহে হযরত জালালুদ্দিন রুমী রাহিমাহুল্লাহ হযরত রামিতানীকে উদ্দেশ্য করেই এই দুটি লাইন রচনা করেছেন:

যদি হালের জ্ঞান শরীয়তের জ্ঞান থেকেও উচ্চমানের না হতো
কীভাবে তাহলে বুখারার মহান ব্যক্তিত্ব এক তাঁতির গেলামে পরিণত হলেন?[28]

৬. যদিও নকশবন্দিয়া তরিকায় জিকরে জলির [সরবে জিকির] প্রচলন ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো তথাপি এ ব্যপারে কোনো কোনো আলিমের মধ্যে তখনও সন্দেহ যায় নি। হযরত রামিতানী তাঁর মুর্শিদের অনুসরণে জলি জিকির করতেন। মাওলানা সাইফুদ্দিন ফিদ্দা নামক বুখারার এক আলিম একদিন তাঁকে প্রশ্ন করলেন: "আপনি কেনো জিকির করাকালে উচ্চ আওয়াজ করেন?"

জবাবে হযরত রামিতামী বললেন: "হে আমার ভাই! তাবিঈনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জলি জিকিরের সমর্থন করে আসছেন মুসলিম উলামায়ে কিরাম। জীবনের শেষ মুহূর্তে সবাইকে সরবে কালিমা পাঠ করার জন্য বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: লাক্কিনা মাওতাকুম শাহাদাতান লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" - মৃত্যু পথযাত্রীদের শাহাতাদের কলিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে সাহায্য করো। সুফিতত্ত্বের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, প্রত্যেকটি শ্বাসই মৃত্যুর সংকেত। সুতরাং এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তুমি সর্বদাই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সরবে উচ্চারণ করতে পারো। কারণ প্রতিটি মুহূর্তই তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত হতে পারে।"

---

[28] নাহাফাতুল উনস, পৃ. ৬১৬

৭. শায়খ মাওলানা বদরুদ্দিন মিদানীর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন: “শুরুতে সালিককে আল্লাহর জিকির সরবে [জিকের জলি] করার নির্দেশ দেওয়া উচিৎ। কারণ আল্লাহর জিকির কলবে স্থায়ী [বা জারি] হতে বেশ সময় লাগে। বাস্তবে উচ্চতর স্তরে আরোহণ না করা পর্যন্ত জিকরুল্লাহ হৃদয়ে জারি হয় না। জিকির জারি হয়ে গেলে আর যবানী বা জলি জিকিরের প্রয়োজন নেই।”

৮. মুর্শিদের দায়িত্ব হলো সালিকের রূহানী ক্ষমতাকে উপলব্ধি করা। এটা জানার পরই কোন্ জিকির কোন সময় কীভাবে করলে সালিকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, তা জানা যাবে ও সে মুতাবিক সবক দেবেন।

৯. হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর যুগে যদি হযরত গুজদাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহর একজনও অনুসারী জীবিত থাকতেন তাহলে হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহকে শূলে চড়তে হতো না। অর্থাৎ তাঁর প্রতি যে অভিযোগ উঠেছিলো সেটা বাতিল করার ক্ষমতাসম্পন্ন লোক থাকতেন।

১০. তাঁর যুগের আরেক শায়খ ফখরুদ্দিন নূরী রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, “হযরত! আলমে আরওয়ায় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন: “আমি কী তোমাদের প্রভু নই?” আমরা সবাই জবাব দিলাম, “অবশ্যই, আমার সাক্ষ্য প্রদান করছি।” [কুরআন: ৭:১৭২] অন্যদিকে, রোজ কিয়ামতে যখন আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করবেন: “আজকের দিনের রাজত্ব কার?” [কুরআন: ৪০:১৬] তখন কেনো সবাই নীরব থাকবে?”

হযরত রামিতানী রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন: “যেদিন আলমে আরওয়ায় প্রশ্ন করা হয়েছিল- আলাসতু বিরাব্বিকুম? [আমি কী তোমাদের প্রভু নই?], সেদিন ছিলো মানবমণ্ডলীর ওপর পবিত্র শরীয়তের হুকুম-আহকাম প্রতিষ্ঠিত করার দিন। আইনতঃ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হচ্ছে বাধ্যবাধকতা। এ কারণেই সবাইকে উত্তর দিতে হয়েছিল ‘ক্বালু বালা শাহিদনা’ [তারা বললো অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি।] অপরদিকে শেষবিচার দিবসে সকল শরয়ী বাধ্যবাধকতা বা আমলের ইতি ঘটবে। তখনতো মহাসত্যের সচেতনতা ও আধ্যাত্মিক জগতের সূচনা ঘটবে। আধ্যাত্মিকতায় নীরবতা থেকে উত্তম কোনো জবাব নেই। এর কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা এমন জিনিস যার বিচরণ হৃদয় থেকে ও হৃদয়ের মধ্যে। এর সঙ্গে জিহ্বার কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণেই সেদিনের দ্বিতীয় প্রশ্নের কোনো সরবে জবাব দান নিষ্প্রয়োজন। বাস্তবে আল্লাহ নিজেই তাঁর প্রশ্নের জবাব

দেবেন: “ইল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহহার” -এটা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট যিনি একক ও অপ্রতিরোধ্য।”

১১. হযরত উলামাদদৌলা সিমনানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে প্রশ্ন করলেন: “আপনি আমি উভয়ে সেবা করি যারা আসে ও যায়। আপনি তাদেরকে যা দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন তাতে আপনি অস্বস্থিবোধ করেন না। অথচ আমি তাদেরকে উত্তম খাদ্য দান করি কিন্তু এরপরও সবাই আপনার প্রশংসা করে এবং আমার প্রতি অভিযোগ তুলে- এর কারণ কী? হযরত রামিতানী জবাব দিলেন: “অনেকেই অপরদের সেবা ও তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করে। তবে অনেকেই যখন অপরদের সেবা করে, তাদের খুব অল্পজনই এর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।”

সিমনানী রাহিমাহুল্লাহ আবার প্রশ্ন করলেন: “আমি শুনেছি হযরত খিজির আলাইহিসসালাম নাকি আপনাকে দীক্ষা দিয়েছেন? ব্যাপারটি কী- বলুন?”

তিনি জবাব দিলেন: “যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাঁকে খিজিরও ভালোবাসেন।”

হযরত সিমনানী রাহিমাহুল্লাহ আবার প্রশ্ন করলেন: “আমরা শুনলাম আপনি জিকরে জলি করেন। কেনো?”

তিনি জবাব দিলেন: “আমি শুনেছি আপনি জিকরে খফি করেন। মনে করুন, এখন এটা জিকরে জলিতে পরিণত হয়েছে!”[29]

১২. কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, “ঈমান কী?” তিনি জবাব দিলেন, “কাটা ও জোড়া দেওয়া।” [অর্থাৎ নিজেকে দুনিয়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা ও প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হওয়া।]

১৩. আল্লাহর সঙ্গ দাও। তা যদি সম্ভব না হয় যাঁরা আল্লাহর সঙ্গে আছেন তাঁদের সঙ্গ দাও।

১৪. আল্লাহর ওলিদের প্রতি বিনয় হও- এতে তুমি তাঁদের দু’আ এমনিতেই প্রাপ্ত হবে।

১৫. কিছু দূরবর্তীরা আমার নিকবর্তী আর কিছু নিকটবর্তীরা আমার দূরবর্তী। যারা বিহ্যকভাবে দূরে অবস্থান করছে তাদের হৃদয় ও আত্মা আমার নিকটবর্তী। যারা বাহ্যিকভাবে নিকটে অবস্থান করছে তাদের আত্মা ও মন আমার থেকে অনেক দূরে।

---

[29] মাশাইখে নখশবন্দিয়া মুজাদ্দিদীয়া, পৃ. ৯৬-১০০

খাওয়ারিজমে অবস্থান

ঐশি ইশারা হেতু হযরত রামিতানী রাহিমাহুল্লাহ বুখারা থেকে খাওয়ারিজমে যেয়ে উপস্থিত হলেন। শহরের তোরণে পৌঁছুয়ে তিনি তাঁর আগমনের বার্তাসহ বাদশাহর নিকট দূত মারফর পয়গাম পাঠালেন। তিনি লিখলেন:

"একজন গরীব তাঁতি আপনার শহরের তোরণে অপেক্ষা করছে। আপনার শহরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে যাতে সে এখানে অবস্থান করতে পারে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে অনুমতি প্রদান করেন তাহলে সে ভেতরে প্রবেশ করবে। আর যদি অনুমতি না দেন তাহলে ফিরে চলে যাবে।"

দূতকে বললেন, তুমি বাদশাহর পক্ষ থেকে অনুমতির লিখিত দলিল নিয়ে আসবে। দলিলে তাঁর সাক্ষরও থাকবে। বাদশাহ অনুমতিপত্র প্রেরণ করলেন। শহরে প্রবেশ করে তিনি বসবাস শুরু করেন ও ইলমে তাসাওউফের নূর চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে মনোনিবেশ করলেন। তিনি প্রত্যেকদিন শহরের কেন্দ্রস্থলে যেয়ে মানুষকে আহ্বান করতেন: আমার খানক্বায় এসো। আমি তোমাদেরকে এদিনের মজুরি দেবো। অচিরেই শহরের অধিকাংশ অধিবাসী হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করে মুরিদ হয়ে গেলো। সমগ্র শহরব্যাপী তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়লো।

হযরত রামিতানীর এরূপ জনপ্রিয়তা দেখে স্বয়ং বাদশহ ও তাঁর সভাসদগণ চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারা তাঁকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। শায়খ রামিতানী ব্যাপারটি বুঝার পর বাদশাহের দেওয়া সে-ই অনুমতিপত্র ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। এতে বাদশাহর মনে ভাবান্তর হলো। তিনি হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন ও তাঁর মুরিদ হয়ে গেলেন। হযরত রামিতানী রাহিমাহুল্লাহ বাকি জীবন এখানেই কাটালেন।

ইন্তিকাল

মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত আলী রামিতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। ১৩০ বছরের এক সফল জীবন অতিবাহিত করে তিনি ১৮ জিলক্বাদ ৭২১

[মতান্তরে ৭১৫] হিজরি সনে খাওয়ারিজমেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরতের সমাধি খাওয়ারিজমেই অবস্থিত।

তাঁর দুজন স্বনামধন্য পুত্রসন্তান ছিলেন। উভয়ে ইলমে তাসাওউফের উচ্চ স্তরে আরোহণ করেন। তবে হযরত রামিতানী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ বাবা সামাসি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। নকশবন্দিয়া তরিকার পরবর্তী শায়খ তিনিই ছিলেন। সুতরাং আমরা এখন আল্লাহ চাহেন তো তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা করবো। আমরা মহান আরশের অধিপতি আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করি।

হযরত খাজা মুহাম্মদ বাবা সামাসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৭৫৫ হিজরি, সমাধি- সামাস, রামিতান, বুখারা, উজবেকিস্তান।

শায়খ মুহাম্মদ বাবা সামাসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আজিজান রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন সুফিদের ভাষ্যকার ও ভাষ্যকারদের সুফি। তিনি শরীয়ত ও মা'রিফাতের জ্ঞানে এক একক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর যুগের প্রত্যেক জাতি হযরতের বরকতপূর্ণ দাওয়াত ও তাবলীগ দ্বারা উপকৃত হয়েছে। যুগের সকল শাইখুল মাশাইখ হযরত বাবা সাহেবের খানক্কায় এসে উপস্থিত হতেন ও ইলমে মা'রিফাতের বাগানে বিচরণ করে ফায়দা লাভ করতেন।

জন্ম, শিক্ষা ও মুজাহাদা

হযরত খাজা মুহাম্মদ বাবা রাহিমাহুল্লাহ বুখারা ও রামিতানের অদূরে সামাস নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি কুরআন শরীফ হিফজ, হাদিস শাস্ত্রে অধ্যয়ন ও ফিহাক শাস্ত্রের উপর লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি যুক্তিবিদ্যা, ইলমুল কালাম [দর্শন], ইতিহাস ইত্যাদি উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত হন। হযরত আলী রামিতানী আজিজান রাহিমাহুল্লাহকে অনুসরণ করেন। তিনি হযরতের মুরীদ ছিলেন। রিয়াজত-মুজাহাদায় তাঁর মতো কঠোর পরিশ্রমী খুব কম ব্যক্তিই দেখা যেতো। স্বীয় পীর সাহেব তাঁকে প্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খিলওয়াত [নির্জনবাস] অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন। তিনি তা বিনাবাক্যে মেনে নিয়ে নফসের বিরুদ্ধে সাধনা ও জিকির-আজকার করতেন। দীর্ঘদিন এভাবে চলে যাওয়ার পর একদা শায়খ রামিতানী রাহিমাহুল্লাহ হযরত বাবা সাহেবকে তরিকতের খিলাফত দান করেন। প্রতিস্থাপিত হয় হাক্বিক্বাতের গোপন রহস্যাবৃত জ্ঞান ছিনা থেকে ছিনায়। অচিরেই বাবা সাহেবের সুনাম চতর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একজন কারামতওয়ালা শায়খ হিসাবে তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ মুর্শিদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্বে শায়খ রামিতানী রাহিমাহুল্লাহ নিজেই তাঁর এই প্রিয় মুরীদকে প্রধান খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন।

হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

বুখারার নিকটে 'ক্বসর আল-আরিফীন' নামক একটি গ্রাম আছে। একদা হযরত বাবা সাহের এ গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সাথীদেরকে বললেন, "এ স্থান থেকে আমার নাসিকায় আধ্যাত্মিকতার আ'রিফের সুঘ্রাণ আসছে। তিনি শীঘ্রই জন্ম নেবেন এবং তাঁরই নামের সঙ্গে জড়িত থাকবে তরিকতের এই সিলসিলার নাম।"

অন্য আরেকদিন ক্বসর আল-আরিফীন গ্রামটি অতিক্রমকালে হযরত বাবা সাহেব বললেন, "এখন আমি সুঘ্রাণটি এতো বেশি পাচ্ছি যে, মনে হচ্ছে সেই শ্রেষ্ঠ আ'রিফের আগমন ঘটে গেছে।" এর তিনদিন পরই এক শিশুর দাদা এসে উপস্থিত হলেন হযরত বাবা সাহেবের দরবারে। শিশুটিও সাথে নিয়ে এসেছেন। বললেন, "হযরত! এ হচ্ছে আমার নাতি। তাঁর জন্য দু'আ করুন।" বাবা সাহেব শিশুর দিকে তাকালেন। বললেন, "আমি যে আ'রিফের আগমনের কথা বলছিলাম, সে-ই আ'রিফ হচ্ছে এই শিশু! আমি দেখতে পাচ্ছি সে ভবিষ্যতে মানবতার পথপ্রদর্শক হবে। তাঁর থেকে গোপন রহস্য প্রত্যেক আন্তরিক পরহেজগার সালিকের অন্তরে প্রতিস্থাপিত হবে। মধ্য এশিয়ার প্রতিটি ঘর তাঁর প্রতি দানকৃত আল্লাহর জ্ঞানের বারিধারা দ্বারা প্লাবিত হবে। আল্লাহর পবিত্র নাম তাঁর হৃদয়ে খোদিত হবে [নকশ]। আর এই তরিকতের সিলসিলার নামকরণ হবে খোদিত নকশা মুতাবিক।"

ইমামুত তারীক্বা হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দুআ

খাজা বাহাউদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি যখন শৈশবে পদার্পণ করি তখন আমার সম্মানিত দাদা সহেব আমাকে হযরত শায়খ খাজা মুহাম্মদ বাবা সামাসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে প্রেরণ করেন। তিনি বলে দিলেন, তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সালাম জানিয়ে বলবে, "আপনার পদযুগলের বরকতে কাঙ্ক্ষিত মাক্বামে পৌঁছুতে আমাকে অনুগ্রহপূর্বক সাহায্য করুন।" আমি তাঁর দরবারে যেয়ে এ আবদার করেছি।

ঐ রাতেই হযরত বাবা সাহেবের একটি কারামত প্রকাশ পেলো। আমি এতে আরো বেশি বিনয় ও অসহায়ত্ব অনুভব করি। আমি তাঁর মসজিদে চলে গেলাম। খুব বিনয় ও খুশু-খুজুর মাধ্যমে দু রাকাআত নফল নামায আদায় করলাম। এরপর এই দুআটি যেনো এমনিতেই আমার মুখ থেকে নিঃস্বর্গ হলো: "হে আল্লাহ! তোমার ভালোবাসার জন্য আমাকে দান করুন চেষ্টা-সাধনার কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা"। আমি যখন ভোরবেলা হযরতের দরবারে নিজেকে উপস্থিত করলাম, তখন তিনি বললেন, "হে পুত্র বাহাউদ্দিন! তোমার জন্য উচিৎ হবে এভাবে দুআ করা: 'হে আল্লাহ! এই দুর্বল বান্দাকে কষ্টের মধ্যেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় ইবাদতের ক্ষমতা দান করুন।' যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম জ্ঞান-প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাঁর বন্ধুজনের ওপর কষ্ট আরোপ করেন, তাহলে স্বীয় দয়া হেতু ঐ বন্ধুজনের মধ্যে কষ্ট সহ্য করার ধৈর্যও দিয়ে থাকেন। অন্যথায় নিজের থেকে কষ্টযুক্ত পরীক্ষা প্রার্থনা মূলত কঠিন হবে। তোমার জন্য এভাবে চাওয়াটা হবে অযৌক্তিক।'"

ঘটনাবলী ও বাণীসমূহ

১. সালিককে সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ [শরীয়ত] মেনে চলতে হবে। তাকে সব সময় পবিত্র অবস্থায় থাকতে হবে।

২. সালিকের হৃদয় পবিত্র থাকা চাই। আল্লাহ ছাড়া সবকিছু [গাইরুল্লাহ] অন্তর থেকে মুছে ফেলতে হবে।

৩. সালিকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা একমাত্র স্বীয় মুর্শিদ ছাড়া কারোর নিকট ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ।

৪. সত্যিকার সালিক স্তরে স্তরে উন্নীত হবে: সত্যস্বপ্ন, বক্ষ সম্প্রসারণ, হালাল খাদ্যগ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু পেটে না যাওয়া, তাক্বওয়া অবলম্বন, আত্মসমর্পণ, বিনয় ও শ্রদ্ধানুভতি, গোনাহ থেকে পরহেজ, তাওবাহ, জিহ্বার হিফাজত, জিকরুল্লাহ, দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ।

৫. আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সুফি-দরবেশদের অনুসরণ করা ও তাঁদের প্রদর্শিত রাস্তায় চলা। হৃদয়কে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে নিরাপদ রাখা।

৬. স্বীয় শায়খের পথনির্দেশনা দ্বারা চলা। তাঁরা হচ্ছেন আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। কিতাব পাঠ করে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা সম্ভব নয়।

৭. কেনো কামিল পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ করো। এরপর সুহবত অবলম্বন করো। সুহবতের চেয়ে উত্তম কিছু নেই। স্বীয় পীর সাহেব ও অন্যান্য সুফি-দরবেশদের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলবে না। তাঁদের সঙ্গে থাকাকালে অতিরিক্ত নফল ইবাদতও করবে না। তাঁদের কথা নীরবে শ্রবণ করবে। নিজের পীর ছাড়া অন্য কোনো শায়খের সঙ্গে নিজের হৃদয়কে সম্পৃক্ত করবে না। মুরীদ হওয়ার পূর্বে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে যাকিছু তুমি শিখেছো সব অন্তর থেকে মুছে ফেলো।

৮. **এক আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি:** তিনি বলেন, "একদা আমি আমার শায়খ হযরত আলী রামিতানী রাহিমাহুল্লাহকে দেখতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "হে আমার পুত্র! তোমার অন্তরে উচ্চ পর্যায়ে আরোহণের আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছে- তা আমি দেখতে পাচ্ছি।" একথা বলার পরই আমি একটি দিবাস্বপ্ন দেখলাম। আমি দ্রুত হেঁটে চলেছি। দিবারাত্র হাঁটছি। এরপর দৃষ্টিতে ভেসে এলো জেরুজালেমের মসজিদের গম্বুজ। আমি মসজিদুল আক্বসার ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম সেখানে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শরীরে শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল সবুজ রংয়ের জুব্বা। বললেন, "স্বাগতম! আমরা আপনার আগমনের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষারত আছি।" আমি বললাম, "হে আমার শায়খ! আমি আমার দেশ থেকে অমুক তারিখে রওয়ানা হয়েছি। আজকের তারিখটি কী?" তিনি জবাব দিলেন, "আজ রজব মাসের ২৭ তারিখ।" আমি বুঝতে পারলাম যেনো ইতোমধ্যে তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমি আশ্চর্য হলাম যে, যে রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গমন করেছিলেন, সে রাতেই আমি মসজিদুল আক্বসায় উপস্থিত হয়ে গেছি!"

সবুজ জুব্বায় আবৃত ব্যক্তি আমাকে বললেন, "তোমার শায়খ হযরত রামিতানী তোমার জন্য অনেকদিন যাবৎ এখানে অপেক্ষা করছেন।" আমি দেখলাম আমার শায়খ নামাযে ইমামতি করতে প্রস্তুত হয়েছেন। এরপর দু রাকাআত নামায পড়লেন। আমিও শরীক হলাম। এরপর আমার শায়খ বললেন, "হে আমার পুত্র! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাকে নিয়ে এই মসজিদুল আক্বসা থেকে সিদরাতুল মুনতাহায় চলে যেতে। সেখানেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহণ করেছিলেন শবে মিরাজের রাতে।" এরপর সবুজ বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি দুটি জন্তু নিয়ে

আসলেন- এরূপ কোনো পশু বা জন্তু আমি জীবনেও দেখি নি। এরপর আমরা ঐ জন্তু দুটোর উপর আরোহণ করে উর্ধ্বাকাশের দিকে দ্রুত ছুটে চললাম ... ”

পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণ

হযরত মুহাম্মদ বাবা সামাসি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সামাসেই ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। জুমাদিউল আখিরের ১০ তারিখ ৭৫৫ হিজরি সনে তিনি এ ধরাধাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর সমাধি স্বীয় জন্মস্থান সামাসেই অবস্থিত। আল্লাহ তা’আলা তাঁর রহস্যকে সংরক্ষণ করুন এবং উন্নীত করুন সর্বোচ্চ মাক্বামে।

হযরত মুহাম্মদ বাবা সামাসি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চারজন খলিফা ছিলেন। এদের মধ্যে নকশবন্দিয়া তরিকানুযায়ী খলিফার নাম ছিলো হযরত খাজা সায়্যিদ আমীর কুলাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আল্লাহর মর্জি হলে আমরা এখন তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর যেটুকু সম্ভব আলোচনা করবো।

হযরত খাজা সায়্যিদ আমির কুলাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৭৭২ হিজরি, সমাধি- সুকহার, বুখারা, উজবেকিস্তান।

তাঁর আসল নাম ছিলো শামসুদ্দিন। তাঁর পিতা ছিলেন সুফি গবেষক হযরত সাইফুদ্দিন হামযা। হযরত আমির কুলাল রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কুলাল শব্দের অর্থ কুম্ভকার। কুলাল বংশের ঐতিহ্য দীর্ঘ। পিতার মৃত্যুর পর হযরত আমির কুলাল বংশের নেতা হিসাবে অধিষ্ঠিত হন।

কুলাল বংশ ও পারিবারিক ঐতিহ্য

হযরত আমির কুলালের পিতা শামসুদ্দিসের পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত হুসাইন বিন আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুলাল বংশের লোকজন মদীনা মুনুওয়ারা থেকে ইরাকের শাইখান নিনাওয়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। প্রায় ৫ শতাধিক বছর এ বংশ এখানে স্থয়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। পুরো পরিবার এরপর ইরাকের জানাহ অঞ্চলে আসেন এবং সেখান থেকে উজবেকিস্তানের বুখারার নিকটে ভাবকেন্ত নামক শহরে এসে বসবাস শুরু করেন ঈসায়ী দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে। বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪০ সালের দিকে এই শহর ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "এই শহরটি খুব সুন্দর। এতে আছে অনেক মনোরম বাগান ও নদ-নদী"।[30] কুম্ভকার হিসেবে কুলান বংশ বসবাস শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই শহরে একটি বড়ো আকারের মৃৎশিল্প গড়ে তুলেন। তবে শুধুমাত্র শিল্প-কারখানা নিয়েই ব্যস্ত ছিলো না এই ঐতিহ্যবাহী বংশটি। কিছুদিন পরই তারা একটি সুন্দর উন্নতমানের মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন।

তখনকার দিনে সর্বত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। তবে কোনো পক্ষই কখনও কুলাল বংশের ওপর হামলা করে নি। এর মূল কারণ ছিলো সায়্যিদ বংশ হওয়ায় সবাই তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

---

[30] ইবনে বতুতা: ট্রাভেলস ইন এশিয়া এন্ড আফ্রিকা।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

হযরত সায়্যিদ আমির কুলাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৭৬ হিজরি সনে উজবেকিস্তানের বুখারার নিকটস্থ সুখার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তখন কুলাল বংশের নেতা। তাঁর উপাধি ছিলো 'আমির-ই-কুলাল'। হযরত কুলালের জন্ম-নাম ছিলো শামসুদ্দিন। তবে পরবর্তীতে তিনি আমির কুলাল নামেই পরিচিত হন। তাঁর মাতা বলেন: "আমার পুত্র আমির কুলাল যখন উদরে ছিলো তখন কোনো সন্দেহযুক্ত খাবারের দিকে হাত বাড়ালেই অবশ হয়ে যেতো। আমি খাবার মুখে দিতে পারতাম না। অনেকবার এ অবস্থার শিকার হই। আমি তখনই জানতাম, আমার পেটে বিশেষ কোনো শিশু অবস্থান করছে। সুতরাং একমাত্র নিশ্চিত হালাল খাবার ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকি।"

একটি ঘটনা

ছোটবেলা হযরত আমি কুলাল কুস্তি পছন্দ করতেন। এরপর তিনি ধীরে ধীরে কুস্তিগীর হিসাবে বেশ সুনাম অর্জন করেন। বুখারার সকল কুস্তিগীর তাঁর নিকট থেকে প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। একদিন একব্যক্তি তাঁর কুস্তি খেলা দেখছিলেন। তার মনের মধ্যে ধারণা জন্মালো: "একজন সায়্যিদ বংশের লোক, শরীয়ত ও তরিকতে জ্ঞানবান অথচ তিনিই এই কুস্তি খেলায় মত্ত। এটা কীভাবে সম্ভব হলো?" এরপর লোকটি হঠাৎ নিদ্রামগ্ন হলেন। স্বপ্নে দেখলেন কিয়ামত দিবস এসে গেছে। তিনি নিজেকে বিরাট বিপদগ্রস্ত দেখলেন। তিনি গভীর জলে ডুবে যাচ্ছিলেন। এরপর হযরত আমির কুলাল সেখানে উপস্থিত হলেন। তার হাত ধরে পানি থেকে উঠালেন। তার নিদ্রা ভেঙ্গে গেলো। হযরত আমির কুলাল তার দিকে তাকিয়ে বললেন: "ও হে! তুমি কী কুস্তিতে আমার ক্ষমতা দেখলে এবং সুপারিশে আমার কাজটি অবলোকন করলে?"

আরো একটি ঘটনা

হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ প্রাথমিক জীবনে বুখারায় কাযান খান ইবনে ইয়াসিরের জল্লাদ হিসাবে কাজ করতেন। একদা বাদশাহকে রাগান্বিত করার

অপরাধে একব্যক্তির ফাঁসির আদেশ হয়। বাহাউদ্দিনকে নির্দেশ দেওয়া হলো তার ফাঁসি কার্যকর করতে। কিন্তু লোকটি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে হযরত বাহাউদ্দিনকে বললো, হযরত আমির কুলালের ওয়াসিলায় আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তাঁর একজন মুরিদ ও শিষ্য। ইতোমধ্যে হযরত আমির কুলাল এসে লোকটির পক্ষে সুপারিশ করলেন। ফলে বাদশাহ তার নির্দেশ বাতিল করে দিলেন। এ ঘটনার পরই হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ হযরত সায়্যিদ আমির কুলাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি আকৃষ্ট হলেন ও তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।

মুরীদ হওয়ার ঘটনা

একদিন শহরের একটি এলাকায় আমির কুলাল কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছিলেন। এ সময় একদল শিষ্যসহ হযরত মুহাম্মদ বাবা সামাসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর এক শাগরিদ কিছুটা আশ্চর্য বোধ করলেন। মনে মনে ভাবলেন: “আমাদের শায়খ কেনো এই কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখতে আগ্রহী হলেন?” শায়খ সামাসী শাগরিদের মনোভাব ধরে ফেললেন। বললেন, “আমি এক ব্যক্তির স্বার্থে এখানে দাঁড়িয়েছি। সে একদিন উচ্চ পর্যায়ের আ’রিফ হবে। সবাই তাঁর দ্বারস্থ হবে পথনির্দেশার আশায়। তাঁর মাধ্যমে অনেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওলিতে পরিণত হবে। ইচ্ছে হলো এই ব্যক্তিকে আমার পাখার নিচে নিয়ে আসা।” কথা শেষ হতেই দেখা গেলো কুস্তিগীর হযরত আমির কুলাল স্থির দৃষ্টিতে হযরত সামাসীর দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্ষণকালের মধ্যে তার অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। কুস্তিগীরি ছেড়ে দিলেন। ছুটে চললেন হযরত সামাসী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে। হযরতের খানক্বায় এসে বললেন, হুজুর এ অধমকে শাগরিদ হিসেবে গ্রহণ করুন। হযরত সামাসী তাঁকে মুরীদ করে বললেন, “বাবা আমির কুলাল, এখন থেকে তুমি আমার পুত্র।”

মুর্শিদের সুহবতে ২০ বছর ও খিলাফত লাভ

হযরত সায়্যিদ আমির কুলাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুর্শিদের সুহবতে দীর্ঘ ২০ বছর অতিবহিত করেন। এসময় তিনি পীরের নির্দেশ মুতাবিক জিকির, নির্জনবাস, ইবাদত, কঠোর রিয়াজত ও মুজাহাদা করে মা’রিফাতের উচ্চ স্তরে উপনিত হন। এই দীর্ঘকাল তাঁকে স্বীয় পীর সাহেবের সুহবত ছাড়া আর কোথাও কেউ দেখে নি। নিজের বাড়ি থেকে

৫ মাইল হেটে হযরত সামাসীর দরবারে তিনি উপস্থিত হতেন। কঠোর সাধনার ফলে তিনি অবশেষে মুকাশাফার মাক্বামে উন্নীত হন। তখন হযরত সামাসী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ প্রিয় মুরীদকে খিলাফত প্রধান করেন।

সন্তানাদি

হযরত সয়্যিদ কুলাল রাহিমাহুল্লাহর চারজন পুত্রসন্তান ছিলেন। এরা হচ্ছেন সায়্যিদ আমির বুরহানুদ্দিন, সায়্যিদ আমির হামযা, সায়্যিদ আমির শাহ ও সায়্যিদ আমির উমর।

ইন্তিকাল

হযরত সায়্যিদ আমির কুলাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সুখার গ্রামেই ৭৭২ হিজরি সনের জুমাদিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি সুখারেই সমাহিত হন। কোনো কোনো সময় তাঁর সমাধি ও তাঁরই দাদা শামসুদ্দিন কুলালের সমাধি নিয়ে বিভ্রান্তের সৃষ্টি হয়। বাস্তবে হযরতের দাদার কবরটি শাহরিসাবজ নামক স্থানে অবস্থিত।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত সায়্যিদ আমির কুলাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খুলাফাবৃন্দের সংখ্যা ১০৪ জন ছিলেন বলে জানা যায়। উপরোক্ত চরজন পুত্রসন্তানও তাঁর তরিকতের খলিফা ছিলেন। বাকি প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম হলো:

১. হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
২. হযরত মাওলানা আ'রিফ দেগ-গিরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৩. হযরত শায়খ মুহাম্মদ খালিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৪. হযরত আমির কুলাল ওয়াশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫. হযরত শায়খ শামসুদ্দীন কুলাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ খলিফা হচ্ছেন ইমামুত তারিক্বা হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং পরবর্তীতে আমরা ইনশাআল্লাহ এই মহান ওলির জীবন, সাধনা ও কর্মের ওপর আলোচনা করবো। আল্লাহর পবিত্র দরাবরে তাওফিক কামনা করছি।

ইমামুত তরিক্বা হযরত খাজা শায়খ বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৭৯১ হিজরি, সমাধি- বুখারা, উজবেকিস্তান।[31]

খচ্ছপ-পায়রাটি বিরহ-বিলাপ করে কাঁদে ভোরবেলা।
আমার অশ্রু বিঘ্নিত করে তার নিদ্রা ও তার অশ্রু বিঘ্নিত করে আমায়।
সে ও আমি যখন অভিযোগ করি, আমরা বুঝতে অপারগ একে অপরকে।
তবে আমি জানি তার দুঃখ-বেদনা, সে-ও জানে আমার।
-আবুল হাসান নূরী রাহিমাহুল্লাহ

তিনি ছিলেন জ্ঞানের সৈকতহীন সাগর। যে সাগরের ঊর্মিগুলো তৈরি হয়েছিল ঐশি জ্ঞান দ্বারা। তাঁর সমুদ্রসদৃশ নিষ্কলুতা ও পরহেজগারী পরবর্তী যুগের অসংখ্য মানুষকে পরিশুদ্ধ করেছে। তাঁর আধ্যাত্মিক সুধা পান করে পিপাসামুক্ত হয়েছেন অনেক সুধিজন। তিনি ছিলেন আকাশের তারকাসদৃশ যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দান করেছিলেন হিদাআতের সূত্র। তিনি হচ্ছেন নশখবন্দিয়া তরিকতের ইমাম হযরত খাজা শায়খ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

জন্ম ও শিশুকাল

হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বুখারার নিকটস্থ 'ক্বসর আল-আরিফীন' নামক একটি গ্রামে ৭১৭ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালেই তাঁর মধ্যে কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছিলো, যাতে বুঝা যাচ্ছিলো এ শিশুটি পরিণত বয়সে আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চ সোপানে উপনিত হবেন। তাঁর প্রথম উস্তাদ ছিলেন যুগের প্রসিদ্ধ ওলি সায়্যিদ মুহাম্মদ বাবা সামাসি রাহিমাহুল্লাহ। এরপর পরিণত বয়সে তিনি স্বীয় পীর সায়্যিদ আমির কুলাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে থেকে ইলমে তাসাওউফের উচ্চ মাক্বাতে আরোহণ

---

[31] এই তথ্যাদি এবং অন্যান্য লেখার সূত্র হচ্ছে: http://naqshbandi.org/the-golden-chain/the-chain/

করেন। নিযুক্ত হন হযরত আমির কুলাল রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা। আধ্যাত্মিকভাবে তিনি রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈট্যলাভেও ধন্য হন। তিনি ছিলেন ওয়াইসী শায়খ। ওয়াইসী হওয়ার যুগসূত্র ছিলেন দুই শতাধিক বছর পূর্বেকার নকশবন্দি শায়খ হযরত আবদুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

যৌবনকাল ও তরীকতের সালিক বেশে

হযরত শাহ নকশবন্দের বয়স যখন ১৮ তখন তাঁর দাদা সামাস নামক গ্রামে তাঁকে প্রেরণ করেন। সেখানে অবস্থান করছিলেন তরিকতের শায়খ মুহাম্মদ বাবা সামাসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত সামাসী নিজেই বাহাউদ্দিনকে তাঁর নিকট নিয়ে আসার জন্য তাঁর দাদাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সময়কার অবস্থা সম্পর্কে শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ নিজেই লিখেছোন:

"আমি খুব ভোরে জেগে ওঠতাম। তখনো ফজরের তিন ঘন্টা বাকি থাকতো। অযু সেরে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতাম। এরপর সিজদাবনত হতাম। আল্লাহর নিকট আবেগভরে দু'আ করতাম: 'ইয়া রাব্বী! আপনার প্রতি ভালোবাসার জন্য বেদনা ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আমাকে দান করুন।' এরপর আমি ফযরের নামায আদায় করতাম শায়খ সামাসীর সঙ্গে। একদিন বাইরে যাওয়ার সময় শায়খ আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'হে আমার পুত্র! তুমি তোমার দু'আর বাক্যকে পরিবর্তন করবে। বলবে, 'হে আল্লাহ! এই দুর্বল বান্দার প্রতি তোমার সন্তুষ্টি দান করো।' তাঁর কথায় মনে হলো সিজদাবনত অবস্থায় আমার গোপন সম্পর্কের কথা তিনি জানতেন। আল্লাহ চান না তাঁর বান্দা অসুবিধায় পড়ে যাক। যদিও তিনি তাঁর প্রজ্ঞার মাধ্যমে বান্দাকে সময় সময় পরীক্ষা করতে পারেন।"

তিনি আরো বলেন, "শায়খ মুহাম্মদ বাবা সামাসী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর আমার দাদা আমাকে নিয়ে বুখারায় আসলেন। আমি কিছুদিন পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। ইতোপূর্বে আমি ক্বসর আল-আরিফীনে বসবাস করেছি যাতেকরে বাবা সাসামীর সান্নিধ্য পাই। এরপর বুখারায় থাকাকালে আমার শায়খ সায়্যিদ আমির কুলালের সান্নিধ্য লাভ করি। আমি তাঁর খিদমতে থাকতাম। তিনি একদিন বললেন, বাবা সামাসী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে দীর্ঘদিন পূর্বে

বলেছিলেন, 'হে আমির কুলাল! তুমি যদি বাহাউদ্দিনকে বিশেষভাবে দেখাশুনা না করো তাহলে আমি বেজার হবো।' একদিন আমি ও অন্য আরেক পীরভাই নির্জনবাস করছিলাম। গভীর ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখলাম আকাশ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একটি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলাম: "এটা তোমার জন্য যথেষ্ট নয় কী যে, সবাইকে ফেলে একাকী আমাদের দরবারে আসবে?" এ গায়েবী আওয়াজ হেতু আমার শরীরে কম্পন শুরু হলো। আমি ঘর থেকে দ্রুত দৌড়ে বের হেলাম। একটি নদীর পারে দৌড়ে গিয়ে পানিতে লাফ মেরে পড়ে গেলাম। আমি কাপড় ধুয়ে দু রাকাআত নামায পড়লাম। এই নামাযে এতোই খুজু-খুশু ছিলো যে, যা ইতোমধ্যে আর কোনদিন হয় নি। আমি অনুভব করলাম, সত্যিকার অর্থে মুশাহাদার অবস্থায় আছি। সবকিছু যেনো 'কাশফের' অবস্থায় আমার নিকট উন্মোচন হয়ে গেছে। সমগ্র মহাবিশ্ব বিলুপ্ত হয়েছে এবং আমি একমাত্র তাঁর উপস্থিতির মধ্যে উপাসনা করছি।"

তিনি আরো লিখেছেন, "রাস্তার আকর্ষণের শুরুতে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেনো তুমি এ রাস্তায় পাড়ি জমাতে চাও? আমি উত্তর দিয়েছি, 'এ কারণে যে যাকিছু আমি বলি এবং যাকিছু চাই তা যেনো ঘটে।' আমাকে বলা হলো, 'এটা হবে না! যাকিছু আমরা বলি ও যাকিছু আমরা চাই শুধুমাত্র তা-ই হবে।' আমি বললাম, 'আমি এটা পারবো না! আমি যা চাই, যা পছন্দ করি কিংবা যা চাই না ও যা পছন্দ করি না- তা ঘটতে আমাকে অনুমতি দিতে হবে।' আমি আবার উত্তর পেলাম, 'না! আমরা যা বলি তা-ই এবং আমরা যা চাই তা-ই হতে হবে।' এরপর দীর্ঘ পনেরো দিন আমি একাকী ছিলাম। শীঘ্রই আমি মানসিকভাবে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ি। এরপর একদিন শ্রবণ করলাম, "হে বাহাউদ্দিন! চিন্তা করো না। যাকিছু তুমি চাও, আমরা তা প্রদান করবো।' আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। বললাম, 'আমাকে একটি তরীকা দান করুন। যে পথে চলে যে কোনো ব্যক্তি সব ঐ উপস্থিতি অনুভব করবে।' আমি গায়েবী আওয়াজ শুনলাম, 'যা তুমি চেয়েছো তা তোমাকে দান করা হলো।'

তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণের সাধনা

হযরত নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "একদা আমি আকর্ষণ ও আত্মভুলা অবস্থায় পতিত হলাম। এখান থেকে সেখানে ভ্রমণ করছিলাম নিরুদ্দেশভাবে। আমি জানতাম না কোথায় যাচ্ছি কিংবা কী করছি। অন্ধকারে হাঁটার সময় আমার পায়ে অনেক কাটা বিদ্ধ হলো। রক্ত ঝরতে লাগলো। হঠাৎ আমার শায়খের বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করলাম। চাঁদহীন রাতটি ছিলো ভীষণ অন্ধকারে ঢাকা। আকাশের তারাগুলোও ছিলো অদৃশ্য। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। আমার গায়ে শুধুমাত্র চামড়ার তৈরি একটি জুব্বা। আমি হেটে হেটে শায়খ আমির কুলাল রাহিমাহুল্লাহর দরবারে কোনোমতে পৌঁছুলাম। তিনি তখন তাঁর বন্ধুদের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'ওকে বাইরে নিয়ে যাও। আমার ঘরে তাকে দেখতে চাই না!' তারা আমাকে বাইরে ঠেলে দিলো। আমি বুঝতে পারলাম নফস আমাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। সে আমার অনুভূতি ও হৃদয়কে গ্রাস করতে অগ্রসর হচ্ছে। আমার শায়খের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে বিষ ঢেলে দিতে এগুচ্ছে। এ মুহূর্তে মহাপ্রভুর উপস্থিতি ও দয়াই ছিলো আমার একমাত্র ভরসা। আমি নিজের নফসকে বললাম, 'আমার শায়খের প্রতি বিশ্বাসে বিষ ঢালতে তোমাকে কখনো দেবো না!' আমি কঠোর প্রতিজ্ঞা করলাম, যতক্ষণ না আমার শায়খ আমাকে পুনরায় গ্রহণ করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কারো কথা বা নফসের ওয়াসওয়াসার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবো না।

রাতের অন্ধকারে বরফ পড়া শুরু হলো। আমার হাড্ডিগুলো ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতায় যেনো হিম-শীতল হচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে আমি কচুপাতার মতো কাঁপতে লাগলাম। মহাকাশের চাঁদের ক্ষীণ আলোও যদি থাকতো তাহলে হয়তো আমি কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করতাম। ভীষণ ঠাণ্ডায় আমাকে গ্রাস করে ফেললো। আমি প্রায় হিমায়িত অবস্থায় পতিত হলাম। তবে অন্তরের অন্তঃস্থলে ইশকে ইলাহী ও ইশকে শায়খীর প্রবল শক্তি আমাকে জীবিত রাখলো। আমি কিছুটা উষ্ণতা অনুভব করলাম। অবশেষে কালরাতের অবসান ঘটলো। ভোরোর আভা পূর্বকাশে ফুটে ওঠলো। আমার শায়খ তাঁর দরোজা খুলে বাইরে পদার্পণ করলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেলেন না। আমি তখনো তাঁর দরোজায় পড়ে আছি। তিনি তাঁর পা আমার মাথায় রাখলেন। এতে তিনি চমকে উঠলেন। পা সরিয়ে আমাকে ভেতরে নিয়ে

গেলেন। এরপর বললেন, 'হে আমার পুত্র! তুমি আত্ম-প্রফুল্লতার বস্ত্রে আবৃত হয়েছো। তুমি ঐশি প্রেমের বস্ত্রে নিজেকে ঢেকে দিয়েছো। তুমি এক বস্ত্র পরেছো যা আমার শায়খ কিংবা আমি নিজে পরতে পারি নি। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। স্বর্ণালী সিলসিলার সকল শায়খ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট ...।' এরপর তিনি নিজেই বেশ সতর্কতাসহ আমার পায়ের কাটাগুলো বের করে রক্তাক্ত পা-যুগলের কাটাবিদ্ধ স্থানগুলো ধুয়ে দিলেন। একই সময় তিনি আমার ছিনার মধ্যে এমন কিছু জ্ঞান [তাওয়াজ্জুহ] প্রবেশ করালেন, যা আমি ইতোমধ্যে পাই নি। এতে আমার অন্তরে এক অপূর্ব কাশফ আত্মপ্রকাশ করলো। আমি দেখলাম, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন রহস্য আমার মাঝে প্রবেশ করেছে। হাক্বিক্বাতে মুহাম্মদিয়ার নূরে আমি আলোকিত হলাম। পবিত্র বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর গোপন রহস্য যাকে ওয়াহদানিয়্যাত বলে তা আমার নিকট প্রকাশ পেলো। আল্লাহর পবিত্র সিফাতসমূহের গোপন রহস্য আমার অন্তরাত্মায় প্রবেশ করলো। এগুলো হচ্ছে তাঁর 'আহাদিয়্যাত' এর স্বরূপ মাত্র। আমার এ অবস্থাকে আমি শব্দ-বাক্যে প্রকাশ করতে অপারগ। এটা তো একটি মাক্বাম যার স্বাদ একমাত্র হৃদয় মাঝে অনুভূত হয়।"

নিজের কথায় সুলুকের বর্ণনা

আমরা ইতোমধ্যে হযরত শাহ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর অভিজ্ঞতার বর্ণনা তাঁর নিজের কথায় শুনেছি। বাস্তবে সুলুকের অভিজ্ঞতার বর্ণনা একমাত্র সালিকই ভালো ফুটিয়ে তুলতে পারেন। সুতরাং হযরতের নিজের ভাষায়ই আমরা আরো অনেক তথ্যাদি জানতে প্রয়াস পাচ্ছি। তিনি সুলুকের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন:

এ পবিত্র রাস্তায় ভ্রমণের শুরুতে আমি বুখারার শহরতলীতে রাতের বেলা এখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়াতাম। রাতের অন্ধকারে ঠাণ্ডার সময় একাকী চলে যেতাম কবরস্থানে। এক রাতে চলে গেলাম হযরত শায়খ আহমদ আজগারাওয়া রাহিমাহুল্লাহর কবরপাশে। জিয়ারত করে মনোযোহসহ ফাতিহা পাঠ করে সওয়াব রেসানী করি। এরপর লক্ষ্য করলাম, সেখানে দু ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন যাদেরকে আমি কখনও দেখি নি। উভয়ে একটি ঘোড়া নিয়ে সেখানে অবস্থান করছেন। তারা আমাকে ঘোড়ার উপরে উঠালেন। আমার কোমরবন্ধে দুটি তরবারি বেঁধে দিলেন। ঘোড়াটিকে নিয়ে গেলেন শায়খ মাজদাখিন

রাহিমাহুল্লাহর কবরপার্শ্বে। এখানে উপস্থিত হয়ে আমরা ঘোড়া থেকে নেমে গেলাম। প্রবেশ করলাম হযরতের মাজারে। আমি কবর সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে বসে ধ্যানস্থ হলাম। শায়খের হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়কে যুক্ত করার চেষ্টা চালালাম। ধ্যানস্থ অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম সামনের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ে গেলো। ভেতর থেকে এক বিরাট সিংহাসন বেরুলো। এতে বসা ছিলেন বিরাট আকারের এক ব্যক্তি যার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে আমি অনুভব করছিলাম, তিনি আমার পরিচিত ব্যক্তি। আমি জগতের যেদিকেই মুখ ঘুরিয়েছি সেদিকেই তাঁকে দেখেছি। তাঁর চতুর্দিকে অসংখ্য মানুষ দেখা যাচ্ছিলো। এদের মধ্যে আমার শায়খ সায়্যিদ আমির কুলাল রাহিমাহুল্লাহ ও শায়খ বাবা মুহাম্মদ সামাসী রাহিমাহুল্লাহকেও দেখতে পেলাম।

আমি ঐ বিরাটাকার লোকটিকে দেখে ভয় পাচ্ছিলাম। একই সময় তাঁর প্রতি আকর্ষণও বোধ করলাম। তাঁর উপস্থিতি হেতু ভয় পেয়েও অপূর্ব সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় চেহারা হেতু তাঁর প্রতি প্রচণ্ড মুহাব্বাত অনুভব করলাম। নিজেই আমি প্রশ্ন করলাম, 'তিনি কে?' উপস্থিত লোকজনদের একজন বললেন, 'ঐ ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি যিনি তোমাকে আধ্যাত্মিক ভ্রমণে সাহায্য করেছেন। তিনি তোমার শায়খ। তিনি তোমার আত্মার দিকে তাকিয়েছেন যখন আলমে আরওয়ায় প্রভুর সামনে উপস্থিত ছিলে। তুমি এর পর থেকে তাঁরই দ্বারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আসছো। তিনি হচ্ছেন শায়খ আবদুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর এখানকার সকল ব্যক্তিই হচ্ছেন তাঁর সিলসিলার মাশাইখে কিরাম। তাঁরা ইলমে মা'রিফাতের গোপন রহস্যের ধারক-বাহক।' এরপর তিনি অঙ্গুলি ইশারা করে করে বিভিন্ন শায়খের পরিচয় দিতে লাগলেন: 'তিনি হচ্ছেন শায়খ আহমদ, তিনি হচ্ছেন কবিরুল আউলিয়া, ইনি আ'রিফ রিওয়াকরী, তিনি শায়খ আলী রামাতানী। আর ইনি হচ্ছেন আপনার শায়খ মুহাম্মদ বাবা সামাসী, যিনি তোমাকে এই জুব্বাটি দিয়েছিলেন। তুমি তাঁকে চিনতে পারছো?' আমি বললাম, হ্যাঁ।"

তিনি আরো বললেন, "যে জুব্বাটি হযরত তোমাকে দান করেছিলেন দীর্ঘদিন পূর্বে তা এখনও তোমার ঘরে আছে। এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হিফাজত করেছেন।' এরপর আরেকটি আওয়াজ শুনলাম, 'সিংহাসনে উপবিষ্ট শায়খ তোমাকে কিছু শিক্ষা

দেবেন। এ রাস্তায় ভ্রমণে তোমার জন্য এটা খুব জরুরী।’ আমি শায়খের সঙ্গে মুসাহাফার অনুমতি চাইলাম। তাঁরা অনুমতি দিলেন। আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকালাম। তিনি সুলুকের বর্ণনা দিতে লাগলেন। এ রাস্তায় ভ্রমণের শুরু, মধ্যমাবস্থা ও শেষ পরিণতি সম্পর্কে বললেন। তিনি বলেন, “তোমার নিজস্ব সলতেটিকে সঠিক করতে হবে। ফলে অদৃশ্যের আলো তোমার মধ্যে শক্তিশালী হয়ে ধরা দেবে এবং এরই মাধ্যমে গোপন রহস্যাবলী উন্মোচন হবে। তোমাকে দৃঢ়তা দেখাতে হবে। সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শরীয়তের ওপর অটল থাকতে হবে। তুমি হক্কের প্রতি মানুষকে ডাকবে ও বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।”

“হযরত আবদুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাঁর খলিফা আমাকে বললেন, ‘এই অন্তর্দৃষ্টি যে সত্যি তা নিশ্চয়তা দানে তিনি একটি নিদর্শন দেবেন। আগামীকাল মাওলানা শামসুদ্দিন আম্বিকুটির নিকট যাবে। তিনি দু ব্যক্তির মধ্যস্ত ঝগড়ার বিচার করবেন। তাঁকে বলবে তুর্কি ব্যক্তিটি হক্কের মধ্যে আছে এবং সাক্কা লোকটি বাতিল। তাঁকে আরো বলো, ‘আপনি সাক্কাকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন, কিন্তু এটা ভুল। নিজেকে সংশোধন করো এবং তুর্কি ব্যক্তিকে সাহায্য করো।’ যদি সাক্কা আপনার কথার বিরোধিতা করে এবং বিচারক তার পক্ষাবলম্বন করতে থাকেন তাহলে তাকে বলবে, ‘আমার নিকট দুটি প্রমাণ আছে: ১. প্রথমে সাক্কাকে বলুন, হে সাক্কা! তুমি তৃষ্ণার্ত।’ সে জানবে ‘এই তৃষ্ণার্ত মানে কী? ২. তুমি সাক্কাকে বলবে, ‘তুমি একজন মহিলার সঙ্গে জিনায় লিপ্ত ছিলে। ফলে মহিলাটি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলো কিন্তু তুমি তাকে গর্ভপাত করতে বাধ্য করেছো। তুমি শিশুটিকে আঙ্গুর বাগানে মাটির নিচে পুতে রেখেছো।’

তিনি আরো বললেন, ‘মনে রেখো, বিচারক শামসুদ্দিনের নিকট যাওয়ার পূর্বে তোমার সাথে নিয়ে যাবে তিনটি শুকনো আঙ্গুর দানা এবং তোমার শায়খ হযরত আমির কুলাল রাহিমাহুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে যাবে। যাওয়ার রাস্তায় তুমি একজন শায়খকে পাবে। তিনি তোমাকে এক টুকরো রুটি দেবেন। রুটি গ্রহণ করবে কিন্তু তাঁর সাথে কথা বলবে না। তুমি চলতে থাকবে যতোক্ষণ না একটি কাফেলা দেখতে পাবে। একজন কুস্তিগীর তোমার কাছে আসবে। তাকে উপদেশ দেবে। সে তাওবাহ করে তোমার মুরীদ হবে। তোমার

মাথার টুপি পরবে। আজিজানের জুব্বাটি সায়্যিদ আমির কুলাল রাহিমাহুল্লাহর নিকট নিয়ে যাবে।' এর একটু পরই আমি একটি ঝাকুনি অনুভব করলান। ধ্যান ভেঙ্গে গেলো।

তিনি বলেন, 'পরের দিন আমি গৃহে যেয়ে পরিবারের লোকজনদের ঐ জুব্বাটির কথা জানালাম। তারা এটি বের করে নিয়ে আসলেন। একজন বললেন, এটা বহুকাল যাবৎ এখানে পড়ে আছে। আমি এটি হাতে নিয়ে ভাবানুরাগে কাঁদতে লাগলাম। জুব্বা নিয়ে আমি আম্বিকাটা গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। গ্রামটি বুখারার শহরতলীতে অবস্থিত। সখানেই কাজি শাসসুদ্দিনের মসজিদটি অবস্থিত। আমি তাঁর সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলাম। এরপর তাঁকে উক্ত তিনটি নিদর্শনের কথা জানালাম। তিনি আশ্চর্য হলেন। সেখানে সাক্কা ব্যক্তিটি উপস্থিত ছিলো। সে তুর্কি ব্যক্তিকে দোষারোপ করছিলো। আমি তাকে বর্ণিত প্রমাণ দেওয়ার পর সে নিজের প্রথম দোষটি স্বীকার করলো। কিন্তু দ্বিতীয়টি মেনে নিলো না। আমি মসজিদে উপস্থিত সবাইকে আঙ্গুর বাগানে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানালাম। সেথায় পৌঁছুয়ে সত্যিই ঐ শিশুর কবরটি পাওয়া গেলো। সাক্কা এবার কাঁদতে লাগলো। নিজের দোষ স্বীকার করে মাফ চাইলো। কিন্তু তখন তো দেরি হয়ে গেছে! এদিকে আশ্চর্য এ ঘটনায় মাওলানা শামসুদ্দিন ও উপস্থিত লোকজন এক্কেবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন।'

'পরদিন আমি নসখ শহরে ভ্রমণে যেতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। কথামতো সাথে ৩টি শুকনো আঙ্গুর নিলাম। পথিমধ্যে সিত্যিই ঐ রুটিওয়ালা শায়খের সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে এক টুকরো রুটি দিলেন। কথা না বলে আমি তা গ্রহণ করলাম। এরপর কাফেলাটিও দেখতে পেলাম। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলো, 'হে শায়খ! আপনি কোত্থেকে এসেছেন?' জবাব দিলাম, 'আম্বিকাটা'। তারা জানতে চাইলো, আমি কখন যাত্রা শুরু করেছি? জবাব দিলাম, 'সূর্যোদয়ের সময়।' তাঁরা খুব আশ্চর্যবোধ করলো। চোখ বড়ো করে একে অন্যের দিকে তাকালো। একজন বললো, 'কী বলেন, ঐ গ্রামটি তো অনেক দূরে! এতো দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিতে অনেক সময় লাগার কথা! আমরা ঐ গ্রাম গতরাতে ছেড়েছি আর আপনি ভোরে ছেড়েছেন। এতো দূরের পথ আপনি কীভাবে পাড়ি দিলেন?' বললাম, 'আমি জানি না!'

একটু পর একব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো। সে ঘোড়ায় আরোহণ করছিলো। সে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কে? আমি আপনাকে ভয় পাচ্ছি!' বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। তুমি যে ব্যক্তির হাতে বাইআত গ্রহণ করে তাওবা করবে, আমি সেই ব্যক্তি।' সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। খুব বিনয়ের সঙ্গে আমার হাতে বাইআত গ্রহণ করে তাওবাহ করলো এবং তার থলে থেকে সকল মদের বোতল দূরে নিক্ষেপ করলো। সে আমার সঙ্গী হলো। আমরা শায়খ আমির কুলাল রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলাম। আমি হযরতকে জুব্বাটি প্রদান করলাম।

তিনি কিছুক্ষণ নিরব থাকলেন। এরপর বললেন, 'এটা হচ্ছে আজিজানের জুব্বা। গতরাতে আমাকে জানানো হয়েছিলো, তুমি এটা আমার নিকট নিয়ে আসবে। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দশটি মোড়কের ভেতর এটাকে লুকিয়ে রাখতে। এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন, 'আমার হুজরায় প্রবেশ করো।' তিনি আমার অন্তরে তাওয়াজ্জুর মাধ্যমে জিকরে খফি অনুপ্রবেশ করে দিলেন। তিনি বললেন, 'এই জিকির থেকে এক মুহূর্তের জন্যও গাফিল হবে না। এটা হচ্ছে সুলতানুল আজকার।'

খাবার সম্পর্কে বিশেষ নিয়ম

শাহ নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খাবার সম্পর্কে একটি বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করতেন। এ থেকে তাঁর দুনিয়াবিমুখতার স্বরূপ ফুটে ওঠে। নিজের চেষ্টায় উৎপাদিত গম ছাড়া আর কোনো প্রকার খাদ্য খেতেন না। জমিতে গম চাষ করে একেবারে রুটি বানানো পর্যন্ত সব কাজ নিজেই করতেন। যুগের সকল আলিম-উলামা তাঁর দরবারে আসতেন, হযরতের হাতের বানানো রুটি খেয়ে বরকত লাভের আশায়। তিনি গরীবদের জন্য নিজের হাতে খাবার প্রস্তুত করতেন। তাদেরকে দাওয়াত করে নিয়ে এসে খাবার পরিবশেন করতে খুব আনন্দবোধ করতেন। সবাইকে বলতেন, আল্লাহকে ভুলবে না, তাঁর উপস্থিতির মাঝে সর্বদা বেঁচে থেকো।

তিনি লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো সচেতনভাবে খাবার গ্রহণ করা। খাবার দেহে শক্তি যোগান দেয় আর চেতনার মাধ্যমে খাবার গ্রহণ দেহকে পবিত্র রাখে।

একদা গাযিয়াত নামক একটি শহরে তাঁকে দাওয়াত করে নেওয়া হলো। সেখানকার তাঁরই এক মুরিদ হযরতের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করলেন। যখন সবাই খেতে বসলেন, তিনি খাবার গ্রহণ করলেন না। তাঁর মেজবান এতে বিচলিত হলেন। তিনি বললেন, “হে আমার পুত্র! আমি ভাবছি তুমি কীভাবে এ খাবারটুকু প্রস্তুত করেছিলে? একেবারে শুরু থেকে পরিবেশন পর্যন্ত তুমি রাগান্বিত ছিলে। সুতরাং খাবারটুকু রাগের সঙ্গে মিশে গেছে! আমরা যদি এ খাবার খাই তাহলে শয়তান আমাদের মাঝে প্রবেশ করার রাস্তা পেয়ে যাবে। সে তখন সহজে তার ক্ষতিকর প্রভাব সমগ্র শরীরজুড়ে ছড়িয়ে দেবে।” হযরতের এ কথাগুলো শুনে সবাই অবাক হয়ে গেলো।

কোনো একদিন তাঁকে হিরাত শহরের বাদশাহ হুসাইন দাওয়াত করে নিয়ে আসলেন। বাদশাহ হুসাইন শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর আগমনে খুব উৎফুল্ল বোধ করছিলেন। সুতরাং তাঁর সম্মানে রাজপ্রাসাদে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দকে দাওয়াত করলেন। তিনি সবাইকে বললেন, “আপনারা সবাই নিঃসন্দেহে এ খাবার গ্রহণ করুন। এটা সম্পূর্ণ হালাল। আমার পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে যে হালাল সম্পদ লাভ করেছি তার দ্বারা এগুলো তৈরি হয়েছে।”

সবাই মজাদার খাবার খেতে মত্ত হলো। কিন্তু শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ এক লুকমাও হাতে তুলে নিলেন না। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শাইখুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত হযরত কুতুবুদ্দিনও ছিলেন। তিনি হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলেন, “ইয়া শায়খী! আপনি কেনো খাচ্ছেন না?” তিনি জবাব দিলেন, “আমার একজন বিচারক আছেন যার কাছে আমি উপদেশের জন্য গমন করি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করার পর বললেন, ‘হে আমার পুত্র! এ খাবারের ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা আছে: যদি এ খাবার হালাল না হয় এবং তা তুমি ভক্ষণ করো না, তখন তোমাকে প্রশ্ন করা হলে বলতে পারো, আমি

বাদশাহর টেবিলে এসেছি খাবার খাই নি। তাহলে তুমি নিরাপদ, কারণ তুমি খাবার খাওনি। কিন্তু তুমি যদি ভক্ষণ করো এবং তোমাকে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তুমি কী বলবে? তখন তো তুমি নিরাপদ নয়।' এ কথাগুলো শুনে কুতুবুদ্দিন সাহেবের শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেলো। তিনি বাদশাহর নিকট অনুমতি চাইলেন খাবার ভক্ষণ বন্ধ করে দিতে। বাদশাহ অত্যন্ত বিচলিত হলেন। প্রশ্ন করলেন, "এতো খাবার কী হবে?" শাহ সাহেব বললেন, "খাবারে কোনো সন্দেহ থাকলে গবীরদের মধ্যে বন্টন করে দিন। তাদের প্রয়োজন এটাকে হালাল করে দেবে। আর আপনি বলছেন, এগুলো হালাল- যদি তা হয়, তাহলে এগুলোর প্রয়োজন যাদের নেই তাদের মধ্যে বন্টন করলে সদকা হবে না। সুতরাং গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াই হচ্ছে উত্তম পন্থা।"

বিভিন্ন ঘটনা ও বাণী

১. হযরত শাহ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বুখারার একদল আলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারজন খলিফার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি জবাব দিলেন:

"একদিন আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি কোনো কিছু কখনও দেখি নি যার সম্মুখে আল্লাহ নেই।' হযরত উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি কখনও কোনো কিছু যেখি নি যার পেছনে আল্লাহ নেই।' হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি কখনও কোনো কিছু দেখি নি যার পাশে আল্লাহ নেই।' হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি কখনও কোনো কিছু দেখি নি যার মধ্যে আল্লাহ নেই।' হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ এবার বললেন, এ কথাগুলোর মধ্যে পার্থকের কারণ হলো একই কথার বিভিন্ন অবস্থাভেদে ব্যাখ্যা মাত্র। এর দ্বারা বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য বুঝাচ্ছে না।"

২. তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 'রাস্তার মধ্যে কোনো ক্ষতিকর বস্তু সরানো হচ্ছে ঈমানের একটি অঙ্গ'- এখানে 'ক্ষতিকর' বলতে কী বুঝতে হবে? এর অর্থ হলো 'নফস'। এছাড়া 'রাস্তা' হলো আল্লাহর দিকে যাত্রাপথ। যেমনটি মহাপ্রভু জাল্লে জালালুহু বায়িজিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, "তোমার নফসকে রেখে আমার নিকট এসো।"

৩. তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "রাস্তায় ভ্রমণ কথাটির অর্থ কী?" তিনি জবাব দিলেন, "এর অর্থ আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান।" আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এ জ্ঞানটি কী?" তিনি বললেন, "যে জানে সে তা স্বীকার করে সে কী জানে এবং তাকে দলিল প্রমাণের স্তর থেকে এমন এক স্তরে উন্নীত করা হবে, যা হলো আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির স্তর।"

৪. তিনি বলেন, যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমণে যেতে আগ্রহী হবে সে অবশ্যই ক্লেশ ও পীড়ার দিকে অগ্রসর হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ আমাকে ভালোবাসবে আমি তার ওপর গুরুভার অর্পণ করবো।' এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালোবাসি।" তিনি তাকে বললেন, "তাই যদি হয়, নিজেকে ফকির হতে প্রস্তুত করো।" অপর এক সময় এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহকে ভালোবাসি।" তিনি তাকে বললেন, "তাই যদি হয়, তাহলে নিজেকে ক্লেশ-কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত করো।" তিনি [শায়খ নকশবন্দ] এরপর নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন:

সবাই তো উত্তমকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে,
কিন্তু কেউ ঊর্ধ্বারোহণে সমর্থ হয় নি,
শুধুমাত্র প্রেম ছাড়া তাঁর প্রতি
যিনি সে উত্তমতার সৃষ্টিকর্তা।

৫. তিনি বলেন, "যে কেউ নিজেকে পছন্দ করে তাকে অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করতে হবে। আর যে কেউ নিজেকে ছাড়া কিছু চায়, সে মূলত নিজেকেই চায়।"

৬. তিনি বলেন, তিনটি উপায়ে আ'রিফরা আ'রিফ হতে পারেন:

১. মুরাক্বাবা - ধ্যান।
২. মুশাহাদা - অন্তর্দৃষ্টি
৩. মুহাসাবা - হিসাব করা

উক্ত তিনটির ব্যাখ্যায় বলেন, "মুরাক্বাবার অবস্থায় সালিক সমগ্র সৃষ্টিকে ভুলে যায় এবং শুধুমাত্র আল্লাহকে স্মরণ করে।

"মুশাহাদার অবস্থায় অদৃশ্য জগত থেকে অনুপ্রেরণা আসে সালিকের হৃদয়ে। এতে থাকে দুটি অবস্থা: সংকোচন [কব্জ] ও সম্প্রসারণ [বাস্ত]। সংকোচন অবস্থায় রাজকীয়তার দৃশ্য ভেসে আসে। সম্প্রসারণ অবস্থায় সৌন্দর্যের দৃশ্য ফুটে ওঠে।

মুহাসাবার অবস্থায় সালিক অতীতের প্রতিটি মুহূর্তের কথা হিসাব করে। তখন কী সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপস্থিতিতে ছিলো না দুনিয়ার উপস্থিতিতে ছিলো?"

৭. তিনি বলেন, "এ রাস্তার সালিককে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হবে দুষ্ট ওয়াসওয়াসাকে প্রতিহত করতে। নফসের কটাক্ষপাত থেকেও সতর্ক থাকা চাই। সে এসব ক্ষতিকর উপাদানকে তার অন্তরে প্রবেশের পূর্বেই কিংবা পরেও প্রতিহত করতে পারে। তবে পূর্বে করাই উত্তম। প্রবেশেরে পর তাকে বশ করে নিতে পারে। তখন কোনো সুফল আসবে না- কারণ, অন্তরের ওয়াসওয়াসা হৃদয় থেকে সরানো যায় না।"

৮. একদা শাহ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো, "আল্লাহওয়ালারা কীভাবে গোপন আমল ও হৃদয়ে জাগ্রত ওয়াসওয়াসাকে সনাক্ত করেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ কর্তৃক দানকৃত নূরের দৃষ্টি দ্বারা। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে এই পবিত্র হাদিসে: 'ঈমানদারদের অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কারণ সে তো আল্লাহর নূরে তাকায়।"

৯. ওলিদের কারামত সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন: "তুমি আর কী কারামত দেখতে চাও, যেখানে চতুর্দিকে পাপেপূর্ণ পৃথিবীর জমিনে ওলিরা নিরাপদে হাঁটছেন?"

১১. তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর একটি কউল হলো, 'নিজেকে বইয়ের পাঠকারীদের থেকে আলাদা করো এবং সুফিদের সঙ্গলাভ করো।' এ কথাটি দ্বারা তিনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন, "তিলাওয়াতকারী আল্লাহর পবিত্র সিফাতসমূহের শাব্দিক উচ্চারণে ব্যস্ত আছে। অপরদিকে সুফিরা পবিত্র নামসমূহের নির্যাস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।"

১২. তিনি সতর্ক করেছেন, "যে কেউ - হোক সে মুরিদ বা পীর, যে স্তরে উপনিত হয়েছে বলে দাবি করে কিন্তু সেখানে পৌঁছুয় নি, আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনও ঐ স্তরে আরোহণ হতে দেবেন না।"

১৩. তিনি বলেন, "প্রত্যেক শায়খের আয়নার দুটি দিক আছে। কিন্তু আমাদেরটির দিক ছয়টি।"

১৪. পবিত্র হাদিস "যে আমার [আল্লাহর] স্মরণ করে আমি তার সাথী" এর ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে তিনি বলেন, "এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট দলিল ও প্রমাণ যে, হৃদয়বানরা সব সময় তাঁকে স্মরণ করে।" এছাড়া অপর পবিত্র হাদিস যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের মাধ্যমে বলেন, "আস-সাওমু লী" [রোযা আমার জন্য]। এর ব্যাখ্যায় বলেন, "সত্যিকার রোযা হলো সেটি যার দ্বারা মানুষ আল্লাহ ছাড়া যাকিছু আছে [গাইরুল্লাহ] তা থেকে নিজেকে দূরে রাখে।"

১৫. তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "ফক্কিরী [দীনতা] অর্থ কী?" তিনি জবাব দিলেন, "ফক্কিররা হচ্ছেন গরীব। তাদের প্রয়োজন নেই যাচ্ঞার। যেমন নবী ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে যখন নমরূদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো, জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কী সাহায্য চান?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তিনি তো এমনিতেই আমার অবস্থা অবলোকন করছেন।"

১৬. তিনি বলেন, ফক্কিরী বা নিঃস্বতা হচ্ছে ফানার [বিলুপ্তির] ও অস্তিত্বের গুণাবলীসমূহ মুছে যাওয়ার নিদর্শন।

১৭. একদিন তিনি উপস্থিত লোকদেরকে প্রশ্ন করলেন, "কে হচ্ছে গরীব?" কেউ জবাব দিলো না। তিনি বললেন, "সে-ই হচ্ছে গরীব যার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সর্বদা সংগ্রামে লিপ্ত অথচ বাহ্যিকভাবে তিনি শান্ত।"

১৮. তিনি বলেন, "প্রত্যেক মুরিদের জন্য এটা একান্ত কর্তব্য যে তার শায়খ যদি কিছু নির্দেশ দেন, তা মেনে নেওয়া, যদিও এ বিষয়টির মর্মার্থ তার কাছে অস্পষ্ট থাকে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ উচিৎ হবে না। একেবারে শুরুতে হয়তো সে মনের প্রশ্ন ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু মধ্যম পর্যায়ের মুরিদকে কখনও শায়খের নিকট কারণ জিজ্ঞেস করতে নেই।"

১৯. তিনি বলেনে, "নিজের থেকে বের হয়ে না আসা পর্যন্ত আল্লাহওয়ালাদের মুহাব্বতের পাত্রে কখনও পরিণত হতে পারবে না।"

২০. তিনি আরো বলেন, "আমাদের রাস্তায় তিন ধরনের আদব বিদ্যমান: ১. আল্লাহ সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখা এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে তাঁর উপাসনায় নিমগ্ন থাকা।

হালালকে গ্রহণ করা ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা। গাইরুল্লাহর আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকা। ২. আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। এই আয়াতের ওপর মুরিদকে খেয়াল করে অগ্রসর হওয়া:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ * وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

-বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। [৩:৩১]"

মুরিদকে বুঝতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার সেতু স্বরূপ। ৩. স্বীয় শায়খের সঙ্গে উত্তম আচরণ থাকতে হবে। পীর সাহেবরা হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নমুনাস্বরূপ। প্রত্যেক মুরিদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের মুর্শিদের সম্মুখে এবং অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সর্বদা বজায় রাখা।"

২১. একদিন হযরতের সম্মুখে তাঁর এক মুরিদ উপস্থিত হয়ে সালাম জানালেন। তিনি এর জবাব দিলেন না। অথচ সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত তাঁর আরেক মুরিদকে প্রেরণ করলেন ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে আসতে। সে আসার পর তিনি প্রথমে 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' বলে তাকে অবগত করলেন যে, "আমি তোমার প্রতি ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি যখন সালাম দিচ্ছিলে তখন আমি গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলাম। আল্লাহর মুশাহাদায় থেকে তাঁর গায়েবী নির্দেশনা অন্তরের কর্ণে শুনছিলাম। এ কারণে তোমার সালামের জবাব দিতে অক্ষম থাকি।"

২২. শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ নিয়ত সম্পর্কে বলেন, "নিয়ত সহীহ হওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হলো নিয়ত আসে অদৃশ্য জগত থেকে, বাহ্যিক বস্তুজগৎ থেকে নয়। এ কারণে, ইবনে সিরীন রাহিমাহুল্লাহ হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জানাযায় অংশগ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছিলেন, 'আমি কীভাবে জানাযা পড়বো, যখন আমার নিয়ত অদৃশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় নি?'" হযরত নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, "নিয়ত শব্দটি তিনটি হরফে গঠিত। 'নূন' যার দ্বারা নূরুল্লাহ বুঝায়। এ আলো হচ্ছে আল্লাহর নূর। 'ইয়া' যার দ্বারা ইয়াদুল্লাহ বুঝায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কুদরতি হাত।

'হা' যার দ্বারা হিদায়াতুল্লাহ বুঝায়। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা। নিয়ত হচ্ছে আত্মার বায়ু।"

২৩. তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন, বস্তুতান্ত্রিক জীবনকে ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু মানুষ চায় আমি যেনো বস্তুতান্ত্রিক জীবনকে গড়ে তুলি!"

২৪. আল্লাহর ওলিদের সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহওয়ালাদের কাঁধে সৃষ্টির বোঝা আছে যাতেকরে এ থেকে তাঁরা শিক্ষাগ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁর ওলিদের হৃদয়ের দিকে স্বীয় নূরের মাধ্যমে তাকান। আর যে কেউ এসব ওলির সুহবতে থাকে তারাও ঐ নূরের প্রভাবে নূরান্বিত হয়ে ওঠে।"

২৫. তিনি বলেন, "শায়খকে তাঁর মুরিদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তাঁকে জানতে হবে মুরিদের অতীত, বর্তমান ও ভভিষ্যতকে।"

২৬. তিনি বলেন, শায়খ আবদুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহ তিনটি চেতনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে: ১. উক্বুফ জামানি - সময়ের চেতনা। ২. উক্বুফ আ'দাদি - সংখ্যার চেতনা এবং ৩. উক্বুফ ক্বালবি - হৃদয়ের চেতনা।

২৭. উম্মাতে রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মাহর যে অংশ দোযখের অগ্নিতে দগ্ধ হবে তা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের যে অংশ নমরূদের অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়েছিল, তার মতো।" তিনি এখানে স্বীয় উম্মাতের মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন। ঠিক সেদিন যেরূপ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে মুক্তি দিয়েছিলেন:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

-আমি বললাম: হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। [২১:৬৯]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "আমার উম্মাহ কখনও বাতিলের ওপর একমত হবে না।" সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবিবের উম্মাহকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন।"

২৮.শায়খ আহমদ ফারুকী মুজাদ্দিদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, হযরত বাহাউদ্দিন বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "রসূলের পরে যাদের আগমন তাঁরাই হচ্ছেন উম্মাতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত। এরা তিন ধরনের:

১. উম্মাতুদ দাওয়াহ: যতো লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এসেছেন এবং তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে বা না করে শুনেছেন তারা সবই এ স্তরের উম্মাত। এ দলে পুরো মানবজাতি।

২. উম্মাতুল ইযাবা: এরা হচ্ছে তারা যারা দাওয়াত গ্রহণ করেছেন।

৩. উম্মাতুল মুতাবাদা'আ: এরা দাওয়াত গ্রহণ করেছে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদানুসরণ করেছে। এ দলের সকল উম্মাত হচ্ছেন ফিরক্বাতুন নাযিহার [মুক্তিপ্রাপ্ত দলের] অন্তর্ভুক্ত। যদি তাদের আমল দ্বারা মুক্তি না পায় তাহলে রাসূলের শাফায়াতের মাধ্যমে তারা মুক্তি পাবে। যেমন তিনি বলেছেন, "আমার শাফায়াত হচ্ছে উম্মাহর বড়ো গোনাহগারের জন্য।"

২৯. তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "আসসালাতু মি'রাজুল মু'মিনীন" [নামায মু'মিনদের জন্য মি'রাজ] -এ হাদিসটির ব্যাখ্যা কী? তিনি জবাব দিলেন, "এটা হচ্ছে সঠিক নামাযীদের স্তর সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিদর্শন। যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ স্তরের নামায পড়তে সক্ষম তিনি নামায অবস্থায় আল্লাহর পবিত্র সত্তার সম্মুখে উপস্থিত হন। প্রভুর গোপন রহস্যাবলী তার অন্তরে উন্মোচিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্তর এরূপ উচ্চপর্যায়েরই ছিলো।"

৩০. হযরতের খাদিম শায়খ সালাহ বর্ণনা করেন: "শায়খ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ একদা তাঁর অনুসারীদেরকে বললেন, 'গাইরুল্লাহর প্রতি হৃদয়ের সামান্যতম সম্পর্ক হলো সালিকের জন্য হাক্বিক্বাত উন্মোচনের সামনে সর্বাধিক গাঢ় পর্দা।' একথা বলে তিনি নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন,

"গাইরুল্লাহকে হৃদয়ে লালন করা
সর্বাধিক শক্তিশালী পর্দা,
আর একে বিসর্জন হচ্ছে,
সিদ্ধি লাভের দরোজা উন্মুক্তকরণ।"

এ কবিতাটি আবৃত্তির পরই আমার (বর্ণনাকারী সালাহর) অন্তরে এই ধারণা জন্মালো যে, আমার শায়খ 'ঈমান' ও 'ইসলামের' মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলছেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। এরপর বললেন, "তুমি কী শুনোনি হযরত মনসুর হাল্লাজ

রাহিমাহুল্লাহ কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'আমি আল্লাহর ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছি, আর এ প্রত্যাখ্যান আমার জন্য ওয়াজিব, যদিও তা মুসলামনদের ক্ষেত্রে অতিকুৎসিত।' হে সালাহ! তোমার অন্তরে যা এসেছে, এটা ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক- তা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং যা হচ্ছে গুরুত্ববহ তাহলো বাস্তব ঈমান। হাক্বিক্বাতপন্থীদের জন্য বাস্তব ঈমান হচ্ছে গাইরুল্লাহর সবকিছুকে অস্বীকার করা। আর এ কারণেই হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহ উক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। তাঁর হৃদয় তো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই চায় নি। তিনি অবশ্যই ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। কিন্তু তিনি তাঁর হৃদয়ের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিদ্যমান- সে কথাটির ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন মাত্র। তিনি যদি আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই অন্তরে স্থান দিতে ইচ্ছে করে না থাকেন, তাহলে কীভাবে বলা যায়, তিনি আল্লাহর ধর্মকে অস্বীকার করেছেন? তাঁর কথাগুলো যারা বুঝেন নি তারা সবাই ছিলেন সাধারণ মুসলমান। তারা তাঁর এই কথার গভীরার্থ সম্পর্কে গাফিল ছিলেন।'''

শায়খ সালাহ আরো বলেন, ''শাহ নকশবন্দ বলেন, 'আল্লাহওয়ালারা কী করছেন সে ব্যাপারে কোনো গৌরববোধ করেন না। তারা তো যা করেন তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসার কারণে করে থাকেন।'''

৩১. হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা বলতেন, হে আল্লাহ! আমি বেহেশতের আশায় তোমার ইবাদত করি না, কিংবা দোযখের ভয়েও নয়। আমি তো শুধু তোমার জন্য ও তোমার ভালোবাসা পেতে ইবাদত করি।' তুমি যদি কিছু পাওয়ার জন্য কিংবা নিজেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর ইবদত করে থাকো তাহলে তুমি একটি গোপন শিরকে লিপ্ত আছো। কারণ তুমি অজান্তে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে নিচ্ছো। তুমি শরীক করছো তাঁর সাথে প্রতিদান ও শাস্তিকে। হযরত মনসুর হাল্লাজ এসব ব্যাপার বুঝাতে যেয়েই বিভিন্ন উক্তি করেছেন। এবার দেখুন তাঁর উক্তিগুলো: 'হে আল্লাহ! তোমার ধর্ম গোপন শিরক বৈ কিছু নয়। সুতরাং সত্যিকার বান্দার জন্য এতে অবিশ্বাস রাখা জরুরি। যারা মনে করে ধর্মানুসরণ করছে তারা তো তোমার উপাসনা করে না। তাদের ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেহেশত লাভ ও দোযখ থেকে মুক্তি। তারা এ দুটোকে উপাসনার 'মূর্তি' বানিয়েছে। আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক প্রকারের মূর্তিপূজা। আপনি তো বলেছেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا
-"যারা গোমরাহকারী ও তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গবার নয়।" [২:২৫৬]

সুতরাং, ওসব মূর্তিতে অবিশ্বাস করা এবং একমাত্র তোমার প্রতি বিশ্বাস রাখাই তো হচ্ছে হক্কপন্থীদের জন্য ফরজে আইন।" ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হবে তাঁর হক্ক হিসাবে। এর বিনিময় কামনা তা বেহেশ-লাভ কিংবা জাহান্নাম-মুক্তি হোক তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সুফিদের ইবাদত এরকমই। একজন ওলি তাঁর এক মুরিদকে প্রশ্ন করলেন, "হে আমার পুত্র! কী নিয়ে তুমি তোমার প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াবে?" সে জবাব দিলো, "আমি ফকীরি নিয়ে তাঁর সামনে যাবো।" তিনি বললেন, "হে আমার পুত্র! এ কথাটির পুনরাবৃত্তি কখনও করবে না। এটাই তো হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মূর্তিপূজা! কারণ তুমি তো তাঁর সম্মুখে যেতে চাও একটা কিছু সাথে নিয়ে। তুমি নিজেকে সবকিছু থেকে মুক্ত করো, তারপর তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হও।"

৩২. তিনি বলেন, "আমাদের রাস্তা খুব বিরল ও মূল্যবান। এটা হচ্ছে 'উ'রওয়াতিল উছক্কা' সুদৃঢ় হাতল। এ রাস্তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও সাহাবায়ে কিরাম রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈনের রাস্তা।"

৩৩. তিনি বলেন, "আমরা এ রাস্তায় বহন করে চলেছি আত্মসমর্পণ। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর বরকত ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।"

৩৪. হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাওহিদের মর্মার্থ উপলব্ধি কোনো কোনো সময় সম্ভব। কিন্তু মা'রিফাতের গোপন ভেদ উপলব্ধি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মা'রিফাত হচ্ছে স্বচ্ছ পানির মতো। এটা যে পাত্রে রাখা হবে সে পাত্রের রং ধরবে। আল্লাহর মা'রিফাত এতোই অসীম যে, যাকিছুই আমরা প্রাপ্ত হই না কেনো, তা মহাসাগরের একফোটা পানির মতো। এটা একটি বিরাট বাগানের মতো। এ থেকে যতোটি পুষ্পই আমরা কর্তন করি না কেনো, মনে হবে আমরা যেনো একটি মাত্র ফুল কেটেছি। "

৩৫. হযরত নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ প্রায়ই নফল রোযা রাখতেন। তবে কেউ তাঁর সম্মুখে খাবার সামগ্রী উপহার হিসেবে নিয়ে আসলে রোযা ভেঙ্গে মেহমানের সঙ্গে খেয়ে নিতেন। তিনি মুরিদদেরকে বলতেন, আসহাবে কিরামের অভ্যেস অনুরূপ ছিলো। হযরত আবুল

হাসান খারক্কানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন: 'বন্ধুদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার রাখবে। তবে গোনাহের কাজে নয়। এর অর্থ হলো তুমি যদি [নফল] রোযা রেখে থাকো আর কোনো বন্ধুজন তোমাকে দেখতে আসে তাহলে রোযা ভেঙ্গে তাদের সাথে খাবে। মনে রেখো, উপাসনা হেতু কারো মনে কষ্ট দিতে নেই কিংবা উপাসনাকে দেখিয়ে রিয়ার মতো মারাত্মক প্রবণতায় পড়তে নেই। যেমন তুমি যদি বলো, 'আমি রোযা রেখেছি', তাহলে রিয়া অন্তরে ঢুকে তোমার রোযাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।'

৩৬. কেনো একদিন হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহকে কেউ একজন হাদিয়া হিসেবে একটি ভাজা মাছ পাঠিয়ে দিলেন। এসময় তাঁর সম্মুখে অনেক গরীব লোকজন উপস্থিত ছিলো। এদের মধ্যে একজন পরহেজগার বালক ছিলেন যিনি রোযা রেখেছেন। শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ ভাজা মাছটি গরীবদের হাতে দিলেন এবং বললেন, "বসো ও খাও।" তিনি ঐ রোযাদার বালককে বললেন, "বসো! খাও!" কিন্তু সে খাবে না বললো। তিনি বললেন, "তোমার রোযা ভেঙ্গে খাও।" কিন্তু সে অনড়, খাবে না। এবার হযরত বললেন, "আমি যদি তোমাকে আমার রমজানের [ফরয] একটি রোযা দান করে দিই তাহলে খাবে?" সে বললো, "না, খাবো না!" তিনি বললেন, "যদি এক মাস রমজানের রোযা দান করে দেই, খাবে?" সে তখনও অনড়। খেতে অস্বীকার করলো। এবার তিনি বললেন, "মহান ওলিআল্লাহ হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহ একদা তোমার মতো একটি লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।" এরপর ছেলেটি চলে গেলো। পরবর্তীতে জানা যায়, এই ছেলেটি চরম দুনিয়াদার হয়ে যায় এবং কখনও রোযাই রাখে নি কিংবা ইবাতদ করে নি।

হযরত শাহ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছিলেন তাহলো এই: একদিন শায়খ আবু তুরাব রাহিমাহুল্লাহ হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহকে দেখতে আসেন। হযরতের এক খাদিম উভয়কে খাবার পরিবেশন করে। আবু তুরাব খাদিমকে বললেন, "তুমিও আমাদের সঙ্গে বসো ও খাও।" কিন্তু সে জবাব দিলো, "মাফ করুন হযরত! আমি রোযাদার।" তিনি বললেন, "তাতে কী হয়েছে? তুমি তো ফরয রোযা রাখছো না। বসো- খাও, আল্লাহ তোমাকে এক বছরের রোযা রাখার সওয়াব দেবেন।" সে অস্বীকৃতি জানালো। তিনি আবার বললেন, "আমি দু'আ করবো, আল্লাহ তোমাকে দু

বছরের রোযা রাখার সওয়াব দেবেন। খাও!” সে এবারও অস্বীকৃতি জানালো। হযরত বায়িজিদ রাহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, “ওকে ভুলে যান! সে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে!” পরবর্তীতে জানা যায়, খাদিম একটি চোরে পরিণত হয়েছিল।

৩৭. তিনি বলেন, “বেলায়েত হচ্ছে একটি খোদায়ী অনুগ্রহ। ওলিকে এ ব্যাপারে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে অবিরত।”

৩৮. ওলিকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই সংরক্ষণ করে থাকেন। তাঁকে সকল বিপর্যয় থেকে মুক্ত রাখেন। আর কারামত হচ্ছে এক ধরনের পরীক্ষা। এটার উপর ভরসা করতে নেই।

৩৯. তিনি বলেন, আসল ব্যাপার হচ্ছে কথা বলা ও আমলের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা। মা'রিফাতের যাত্রীকে তখনই বেলায়াতের স্তরে উন্নীত করা হবে যখন তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে ঐশি নির্দেশা ও আইন-কানুন অনুসরণের অভ্যেস। তিন ধরেন সুফি বিদ্যমান: মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী), কামিল (পরিপক্ক) ও সম্পূর্ণ ফানী [মযজূব- আল্লাহতে বিলীন]। যে কেনো মুরিদকে তার পীরের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। এটাকে বলে তাসলিম।

৪০. হযরতকে পীর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দিলেন, “পীর হচ্ছেন একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো। মুরিদের প্রয়োজনে সঠিক ঔষধ দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে মুরিদকে বিনাবাক্যে ঔষধ সেবনে নিয়োজিত হওয়া চাই। অন্যথায় বিপদ আসবে। আমাদের পথ ও পাথেয় হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের উপর নির্ভরশীল। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ হেতু আমরা এই রাস্তায় চলার তাওফিক লাভ করেছি।

৪১. কেউ একজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, “আপনার বেলায়েত সরাসরি প্রাপ্ত না কষ্ট-সাধনার বিনিময়?” তিনি জবাব দিলেন, “এটা হচ্ছে ঐশি আকর্ষণ হেতু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অনুভূতি যা অনুগ্রহের ফলে আমার মাঝে জাগ্রত হয়েছে।” আরো কেউ প্রশ্ন করলো, “আপনি কী সরবে জিকির (জিকরে জলি), আধ্যাত্মিক সঙ্গীত (সামা') ও নির্জনবাস (খিলাওয়াত) অনুসরণ করেন?” তিনি জবাব দিলেন, “আমার মূল পদ্ধতি হচ্ছে ‘ভিড়ের মধ্যে নির্জনবাস’ [খিলওয়াত দার আঞ্জুমান]।”

৪২. তিনি বলেন, “আমাদের রাস্তা হচ্ছে পীরের সুহবত লাভ করা। আমাদের পরিচিতি নির্ভরশীল ‘খিলওয়াতের মাঝে’। যাতে আছে ভীষণ পীড়া ও নিদারুণ যন্ত্রণা।”

৪৩. তিনি বলেন, ‘লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ’তে দুটি অংশ আছে: ‘লা-ইলাহা’ মানে আত্ম-অস্বীকৃতি ও ‘ইল্লাল্লাহ’ মানে ‘শুধু আল্লাহ’। তাঁর নির্যাসে সবকিছু বিলুপ্ত। কালিমার দ্বিতীয়

অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্যে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণে অভ্যস্ত হওয়া। জিকিরের উদ্দেশ্য হলো কালিমা তাওহিদের হাক্কিক্কাত উপলব্ধি করা। এর দ্বারা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সকল 'অন্যান্যতা' (গাইরুল্লাহ) বিসর্জন দেওয়া হয়। তিনি আরো বলেন, "সিররে তাওহিদ" [তাওহিদের গোপনকথা] অনুধাবন করা অনেকটা সহজ। কিন্তু তাঁর মা'রিফাত হাসিল করা বেশ কঠিন।"

৪৪. প্রভুর উপাসনা সম্পর্কে তিনি বলেন, "তাঁর ইবাদতে আমাদের প্রয়োজন হয় দেহের ও উবুদিয়াতের [দাসত্বের]। দেহকে ইতমিনানের ওপর রাখতে হবে। তবে কোনো আমল সুফল বয়ে আনবে না, যতক্ষণ না আমরা আত্ম-অনুভূতি থেকে মুক্ত হই।"

৪৫. কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো, "সাইর-অ-সুলুক" এর অর্থ কী? তিনি জবাব দিলেন, "এটা হচ্ছে আল্লাহর মা'রিফাত।" আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "তা কী হযরত?" তিনি বললেন, "মুখাবির ই সাদিক্ব [সত্যিকার বুদ্ধি আনয়নকারী- আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি উপাধি] দ্বারা যাকিছু প্রাপ্তি হয়েছে, তা থেকে আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করা।"

৪৬. একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "যখন ফখর সম্পন্ন হবে তখন আল্লাহ -এ কথাটির মানে কী হয়? তিনি জবাব দিলেন, "এর অর্থ হলো মানবের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে এবং স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিপূর্ণ সত্তার মাঝে। কিংবা বলা যায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সার্বজনিন সত্তার মধ্যে নিশ্চিহ্ন করা। এটা হচ্ছে আত্মপরিচিতির মৃত্যু।"

৪৭. তিনি বলেন, "অভ্যন্তরীণ বীচিকে তার বহিরাঙ্গ বা খোসা নিরাপদ রাখে। খোসা যদি বিশৃঙ্খলে পড়ে যায় তাহলে অভ্যন্তরীণ বীচিও স্থির থাকতে পারবে না। শরীয়ত হচ্ছে খোসা আর তরিক্বাত [মা'রিফাত] হচ্ছে তার বীচি [মূল]। শরীয়ত অনুসরণে কমতি থাকলে মা'রিফাতের রাস্তায় ভেসে ওঠবে অস্পষ্টতার ধূর্মজাল।"

৪৮. কেউ একজন বললো, " কোনো কোনো শায়খ বলেন, বেলায়েত নাকি নবুওয়াত থেকেও উৎকৃষ্ট! এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?" তিনি জবাব দিলেন, "অবশ্যই নয়! একমাত্র নবীর বেলায়েত তাঁর নবুওয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ।"

৪৯. তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কীভাবে নামাযে চেতনশীল অনুভূতি আসতে পারে?" তিনি জবাব দিলেন, "যদি হালাল দানা ভক্ষণ করা হয় চেতনাশীল অবস্থা ও খেয়ালের

ওপর তবে তা সৃষ্টি করবে ঐশি অনুভূতি। অনুরূপ যদি অযু ও নামাযের তাকবিরগুলো পূর্ণ চেতনশীল অবস্থায় পালিত হয় তবে ঐশি অনুভূতি জাগ্রত করবে।”

৫০ তিনি বলেন, একদা মুসাফির অবস্থায় আমার অভ্যন্তরীণ হাল এমন এক স্তরে পৌঁছুলো যে, মনে হলো মনসুর হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর মতো আমার মুখ থেকেও বেরিয়ে এসে পড়বে, “আনাল হাক্ব”। বুখারায় অনেক ফাঁসিকাষ্ঠ ছিলো। আমি ভাবলাম শীঘ্রই আমার মাথাও হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর মতো কর্তিত হবে। আমি দুবার ফঁসিকাষ্ঠের দিকে ধাবিত হই। কিন্তু আল্লাহর অসীম মর্জিতে আমি এই স্তরও অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হলাম।

৫১. খাজা সাহেবের কেনো পুরুষ বা নারী দাস-দাসী ছিলো না। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বললেন, “দাসত্বের মাঝে আবার মনিবত্ব থাকবে কী করে?”

৫২. কেউ জিজ্ঞেস করলো, “আপনার সুফি সিলসিলা কোথায় এসেছে?” তিনি বললেন, “সুফি সিলসিলা দ্বারা কেউ কোথায়ও আসতে পারে না।”

৫৩. তিনি বলেন, “ঐশি গোপন তথ্য আউলিয়াদের নিকট উন্মোচন হয়। এগুলো সম্পর্কে অনুমতি ছাড়া বক্তব্য প্রদান নিষিদ্ধ। বলা হয়ে থাকে, যার কাছে কিছু গোপনীয় আছে সে তা গোপন রাখে, আর যার নিকট কিছু গোপনীয় নেই সে তা প্রকাশ করে!”

৫৪. তিনি বলেন, “আমি একজন উচ্চ পর্যায়ের ওলির নিকট প্রশ্ন করলাম, দরবেশী কী? তিনি জবাব দিলেন, এটা হলো নিচুবস্থায় যাওয়া ও ভীষণ কষ্টভোগ।”

৫৫. কারামত সম্পর্কে তিনি বলেন, “আমাদের কারামত এটাই যে, বিরাট গোনাহ-খাতা কাঁধে বহন করেও পৃথিবীর জমিনে হাঁটতে পারছি!”

৫৬. হযরত শায়খ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “হাক্বিক্বাত সত্যিকার অর্থে তখনই প্রাপ্ত হয় যখন কেউ ফানার স্তর অতিক্রম করে নেয়। যতক্ষণ বশরিয়াত [প্রাণীবস্থা] অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ কেউ না ফানা, না বাক্বা, না হাক্বিক্বাতের স্তরে উন্নীত হবে।”

৫৭. তিনি বলেন, “প্রত্যেক ধাবক বলটি ধরতে পারবে না। কিন্তু বল ধরতে হলে অবশ্যই দৌড়াতে হবে।”

তাঁর কারামত ও অনুগ্রহ

অধিকাংশ ওলির মধ্যে আল্লাহ তা’আলা কারামতের ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। এর দ্বারা মূলত মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান উদ্দেশ্য। তবে কোনো কারামতই ওলির নিজের

নয়- বরং তিনি শুধু মাধ্যম। সব কারামতের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারামত সংঘটন করতে পারবে না। ইমামুত তরিক্বা হযত শাহ বাদাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন কারামতওয়ালা সুফি দরবেশ ছিলেন। তাঁর জীবনে বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন কিতাবে এ ব্যাপারে এসব ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে। অনেক জীবনীকার স্বয়ং তাঁকেই আল্লাহর কারামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শায়খ আলাউদ্দিন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ নিচের ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে এগুলো তুলে ধরছি।

১. জাহিদের মৃত্যু ও জীবন লাভ: হযরত শায়খ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেন, "একদিন আমার মুরিদ মুহাম্মদ জাহিদকে নিয়ে মরুভূমিতে যাই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো গর্ত খোঁড়া। কোদাল দ্বারা খোঁড়তে লাগলাম উভয়ে। আমরা কাজ করে করে একে অন্যের সঙ্গে গভীর জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এক পর্যায়ে তা এতোই গভীরে চলে গেলো যে, কোদালগুলো উভয়ে ছুড়ে মারলাম। আমাদের আলোচনা তখন ইবাদতের হাক্বিক্বাত নিয়ে হচ্ছিলো। জাহিদ আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া শাইখী! ইবাদতের ব্যাপ্তির সীমানা কী?' আমি বললাম, 'ইবাদত সে পর্যন্ত উৎকর্ষতায় পৌঁছুতে পারে যে, ইবাতদকারী কউকে বলতে পারে, 'মরে যাও!', এবং সে সত্যিই মরে যাবে। কিছু না ভেবে আমি জাহিদের দিকে অঙ্গুলি ইশারা করে কথাটি বললাম। সাথে সাথে জাহিদ মাটিতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বিচলিত হলাম। জাহিদ মৃতাবস্থায় সূর্যোদয় থেকে দুপুর পর্যন্ত ছিলো। প্রচণ্ড গরমে তার দেহ দ্রুত ফুলে উঠছিলো। আমি তাকে টেনে একটি গাছের ছায়ায় নিয়ে আসলাম। আমি ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ আমার মধ্যে একটি অনুভূতি জেগে ওঠলো। আমি চোখ বুজে ধ্যানস্থ অবস্থায় শুনতে পেলাম কে যেনো বলছে: "বলো, হে মুহাম্মদ, জিবীত হও!" আমি সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে তিনবার এ বাক্যটি উচ্চারণ করলাম। সুবহানাল্লাহ! জাহিদের ভেতর আত্মা পুনরায় ঢুকতে শুরু করলো। সে অচিরেই জীবিত হয়ে ওঠলো। আমি ঘটনাটি আমার শায়খের নিকট বর্ণনা

করলাম। তিনি বললেন, "হে আমার পুত্র! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে একটি গোপন ক্ষমতা দান করেছেন, যা অন্য কাউকে এ যুগে দেওয়া হয় নি।"

২. বাদশাহরা ওলির দরবারে আসেন নতজানু হয়ে: একদিন ট্রান্সসক্সিয়ানার বাদশাহ সুলতান আবদুল্লাহ খাজাগান বুখারায় আগমন করেন। তিনি বুখারার শহরতলিতে শিকারে গেলেন। তার সঙ্গে অনেক লোকও আসলেন। এসময় শাহ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ সে অঞ্চলের একটি গ্রামে অবস্থান করছিলেন। বাদশাহর শিকারের খবর শুনে তিনি একটি নিকটস্থ টিলার উপরে যেয়ে বসে পড়লেন। ধ্যানস্থ অবস্থায় তাঁর খেয়ালে আসলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলিদেরকে পৃথিবীর বুকে মর্যাদাশীল করেছেন। সকল বাদশাহ এসে তাঁদের সম্মুখে নতজানু হয়। খেয়ালটি শেষ হওয়ার পূর্বেই দেখা গেলো ঘোড়ায় সওয়ার অবস্থায় একজন সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তার মাথায় মুকুট শোভা পাচ্ছে। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে হযরতের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বাদশাহ হযরতকে সালাম জানিয়ে নতজানু অবস্থায় বসে গেলেন। শায়খ তার দিকে তাকালেন না। দীর্ঘ ঘন্টা খানেক পার হয়ে গেলো। বাদশাহ তখনো সেখানে উপস্থিত আছেন। অবশেষে শায়খ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন। বললেন, "আপনি এখানে কী করছেন?" বাদশাহ জবাব দিলেন, "আমি সুলতান খাজাগান। আমি শিকারে বের হয়েছিলাম। এ অঞ্চলে অতি মনোরম আতরের সুগন্ধি পেলাম। আমি এ সুগন্ধি অনুসরণ করে এখানে এসে আপনাকে পেলাম। দেখলাম আপনি খুব উজ্জ্বল একটি অংশুজালের মধ্যে বসে আছেন।" সুবাহানাল্লাহ! হযরতের খেয়ালের সত্যতা এভাবেই প্রমাণিত হলো।

৩. মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকার খবর প্রদান: হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর একজন অনুসারী যিনি মার্ভ শহরে বসবাস করতেন, বর্ণনা করেন: "একদা আমি খবর পেলাম আমার ভাই শামসুদ্দিন মারা গেছেন। তিনি বুখারায় থাকতেন। আমি তাই সেথায় যেতে ইচ্ছে করলাম। নিজের শায়খের অনুমতি ছাড়া যাওয়া যাবে না, তাই হিরাতের শাহজাদা আমির হুসাইনকে অনুরোধ জানালাম হযরতের নিকট থেকে অনুমতি পেতে সুপারিশ করতে। আমির হুসাইন হযরতকে আমার ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ জানালেন ও সেখানে

যেয়ে আমার পরিবারকে দেখার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, “না, এটা সম্ভব নয়। আপনি কীভাবে বলেন, তিনি [শামসুদ্দিন] মৃত, যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি তিনি জীবিত! আমি এমনকি তার গন্ধ পাচ্ছি। আমি বরং তাকে এখানে নিয়ে আসবো।” আশ্চর্যের ব্যাপার যে, হযরতের কথা শেষ হতে না হতেই আমার ভাই শামসুদ্দিন সেখানে উপস্থি হয়ে গেলেন! তিনি শাখয়ের কাছে যেয়ে সালাম করে তাঁর পবিত্র হাতে চুমো খেলেন। শাহজাদা আমির হুসাইনকে সালাম জানালেন। আমি ভাইকে জড়িয়ে ধরলাম। এক অনাকাঙ্ক্ষিত আনন্দের বন্যা বইতে লাগলো।”

৪. কাশফের প্রমাণ: একদিন হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বুখারায় শায়খদের সম্মুখে কাশফ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, “আমার একান্ত বন্ধু মাওলা আ’রিফ [চারশ মাইল দূরে অবস্থিত] খাওয়ারিজম শহরের সরকারী অফিসে যাচ্ছেন। তিনি ঘোড়ার গাড়ির কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ উপস্থিত থেকে পুনরায় নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছেন। তিনি সরকারী অফিসের দিকে যাচ্ছেন না। এভাবেই একজন ওলি কাশফের মাধ্যমে দেখতে সক্ষম হন।” উপস্থিত সবাই এ কাহিনী শুনে অবাক হলেন। তবে তাঁর বর্ণনার সময়টি লিপিবদ্ধ করে রাখা হলো।

বেশ কিছুদিন পর শায়খ মাওলা আ’রিফ বুখারায় আসলেন। সে-ই আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক দিন অমুক সময়ে আপনি কী করেছিলেন? তিনি যে বর্ণনা দিলেন তার সঙ্গে শাহ সাহেবের বর্ণনা হুবহু মিলে গেলো। সুবহানাল্লাহ!

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুরিদ হতে নির্দেশ: বুখারার কয়েকজন আলিম ও হযরত শায়খ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর কিছু শাগরিদ একবার ইরাকের সিমনান শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর তারা জানতে পারলেন শহরে সায়্যিদ মাহমুদ নামক এক উঁচু মাপের শায়খ অবস্থান করছেন। তিনি শায়খ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর একজন শাগরিদ ছিলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন শায়খের সাথে

সাক্ষাৎ করতে। হযরতের নিকট পৌঁছুয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কীভাবে আমাদের শায়খের সংস্পর্শ পেলেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। অত্যন্ত বিনয় ও নম্রভাবে হুজুরের নিকট আবদার করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জীবদ্দশায় আপনার একজন সাথী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি। এখন আমার জীবনে কী করতে পারি যার ফলে সে-ই মর্যাদা প্রাপ্তির কাছাকাছি যেতে সক্ষম হবো? তিনি আমাকে বললেন, "হে আমার পুত্র! তুমি যদি আমাদের বন্ধু হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে চাও তাহলে তোমাকে আমার পুত্র বাহাউদ্দিনকে অনুসরণ করতে হবে।" এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বাহাউদ্দিন কে?" তিনি বললেন, "আমার কাছে বসা এ লোকটিকে তুমি কী দেখতে পাচ্ছো? এ হচ্ছে বাহাউদ্দিন। তার সংস্পর্শে থেকো।" ইতোমধ্যে আমি হযরত শায়খকে কখনো দেখি নি। জেগে ওঠার পর আমি তাঁর নাম ও অবয়ব সম্পর্কে লিখে রাখলাম। এটি সংরক্ষণ করে রাখলাম আমার নিজ কক্ষের আলমিরায়। এ স্বপ্নের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। একদিন আমি একটি দোকানের ভেতর দাঁড়ানো ছিলাম। আমি দেখলাম একজন নূরানী চোহারার ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন। তাঁকে দেখেই আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়লো। সাথে সাথে তাঁকে আবদার জানালাম, হযরত! অনুগ্রহণ করে এ অধমের বাড়িতে পদার্পণের জন্য আমি আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করে হাঁটতে থাকেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটছিলাম। আমি তাঁর সামনে যেয়ে হাঁটতে লজ্জা পাচ্ছিলাম।

তিনি একবারও আমার দিকে তাকালেন না। অথচ নিজেই সোজা আমার বাড়ির রাস্তায় হেঁটে চললেন। আমি যখন তাঁকে শুধুমাত্র জানাবো, এটি আমার বাড়ি- তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এটাই কী তোমার বাড়ি?" তিনি ভেতরে ঢুকলেন এবং সরাসরি আমার নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমার আলমিরার কাছে যেয়ে ভেতর থেকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত যে কাগজে সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম সেটি বের করে আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এতে কী লিখেছো?" আমি কিছু বলার পূর্বেই হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আমি

বুঝতে পারলাম অত্যন্ত শক্তিশালী উজ্জ্বল অংশুজাল আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। কিছুক্ষণ পরই আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। আমি হযরতকে বললাম, শায়খ! আপনি কী এ অধমকে খাদিম হিসেবে গ্রহণ করবেন? তিনি যে শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তা আমার স্বপ্ন থেকে স্পষ্ট ছিলো।"

তিনি বলতে থাকেন, "এ রাস্তায় ভ্রমণকালের শুরুতে একদিন আমি হযরতের নিকট বসা ছিলাম। তখন ছিলো বসন্তকাল। আমার অন্তরে জাগ্রত হলো, হায়! যদি একটি তরমুজ খেতে পারতাম! তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মুহাম্মদ জাহিদ! যাও, নিকটস্থ নদীর তীরে যেয়ে যা দেখবে তা নিয়ে আসবে। আমরা তা খাবো। আমি নদীর তীরে চলে গেলাম। পানি খুব ঠাণ্ডা ছিলো। আমি পানিতে হাত দিতেই একটি তরমুজ পেলাম। এটা খুব তাজা ছিলো। মনে হলো এক্ষুণি কেউ এটি গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে এসেছে। আমি খুব আনন্দিত হলাম। এটি নিয়ে শায়খের নিকট চলে আসলাম এবং বললাম, হযরত! আমাকে গ্রহণ করুন।"

৬. মুরিদের পায়ে জন্তুর কামড়: বর্ণিত আছে, একদিন তাঁর এক মুরিদ তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করেন। তবে ভ্রমণে যাত্রার পূর্বে হযরতের আরেক বিশিষ্ট মুরিদ শায়খ শাদিকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করলেন। শায়খ শাদি উপদেশ দিলেন, 'হে আমার ভাই! তুমি যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে যাবে কিংবা সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন নিজের পা তাঁর দিকে যাতে না থাকে এ ব্যাপারে সতর্ক থেকো।' বর্ণণাকারী বলেন, "আমি যখন হযরতের গ্রাম ক্বসর আল-আরিফীনের উদ্দেশ্যে গাজিউট থেকে বিদায় হলাম, তখন ক্লান্তি দূর করতে রাস্তার মধ্যে একটি বড় বৃক্ষের নিচে পা-যুগল লম্বা করে বিশ্রাম নিলাম। দুর্ভাগ্যবশত কোত্থেকে একটি জন্তু এসে আমার পায়ে কামড় দিলো। এরপর বেদনা নিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমান্তাবস্থায়ও একটি জন্তু এসে আমার পায়ে আবার কামড় দিলো। এরপর আমি বুঝতে পারলাম, বিরাট ভুল করে বসেছি। আমি ক্বসর আল-আরিফীন গ্রামের দিকে পা ছড়িয়ে রেখেছি। আমি সাথে সাথে তাওবাহ করলাম। এরপর আর কোনো জন্তু আমার পায়ে কামড় মারে নি।"

৭. খলিফাকে সাহায্য: বুখারায় শায়খ মুহাম্মদ পারসা নামক তাঁর একজন খলিফা ছিলেন। কোনো এক কারণে এই খলিফাকে সাহায্য করতে যেয়ে হযরতের পক্ষ থেকে একটি কারামত প্রকাশের জরুরত পড়ে গেলো। এসময় প্রখ্যাত ফকীহ শায়খ শামসুদ্দিন জাযারী সমরকন্দে অবস্থান করছিলেন। সে সময় মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাদশাহ মিরজা আলেগ বেগ। উদ্দেশ্য ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের সনদ সঠিক কী না তা নির্ধারণ করা। কিছু হিংসুক ও দুর্নীতিবাজ আলিম অভিযোগ আনলো যে, হযরত শায়খ মুহাম্মদ পারসা একটি হাদিসের বর্ণনা দিয়েছেন যার সনদের কোনো ভিত্তি নেই। তারা শামসুদ্দিনকে বললেন, "আপনি যদি এ ব্যাপারে তাওবা করে নেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে মাফ করবেন ও বিরাট প্রতিদান দেবেন।" কিন্তু শায়খ মুহাম্মদ পারসা এতে তোয়াক্কা করলেন না। এদিকে শায়খ শামসুদ্দিন বাদশাহকে অনুরোধ জানালেন, শায়খ পারসাকে রাজদরবারে ডেকে পাঠাতে। সুতরাং বাদশাহর দরবারে এ ব্যাপারে এক বিচারকার্য শুরু হলো। উপস্থিত আলিমদের মধ্যে বুখারার শাইখুল ইসলাম হুসামুদ্দিন নাহাওয়ীসহ আরো অনেক উলামায়ে কিরাম ছিলেন।

শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহও তাঁর খলিফা মুহাম্মদ পারসার সাথে উক্ত সভায় যোগদান করেন। শায়খ হুসামুদ্দিন শায়খ পারসাকে একটি হাদিস সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। মুহাম্মদ পারসা সনদসহ হাদিসটি বর্ণনা করলেন। শায়খ জাযারী বললেন, "হাদিসটি সঠিক থাকলেও এর সনদ সঠিক নয়।" একথা শুনে হিংসুকরা খুব আনন্দিত হলেন। তারা বললো, "মুহাম্মদ পারসা যেনো হাদিসের অপর আরেকটি সনদ উপস্থাপন করেন।" তিনি তা-ই করলেন। এবারও আলিমরা মন্তব্য করলেন, সদন ঠিক নয়। এবার আরেকটি সনদ উপস্থাপনের কথা শায়খ পারসাকে বলা হলো। তিনি আরেকটি সনদ বর্ণনা করলেন। কিন্তু উপস্থিত কোনো আলিমই তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, এটিও ভুল।

এবার শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শায়খ পারসা সনদ হিসেবে যা-ই বলুন না কোনো তারা তা গ্রহণ করবেন না। তিনি নিজের খলিফাকে বললেন, "হযরত হুসামুদ্দিনকে এই প্রশ্নটি করো, আপনি হচ্ছেন শাইখুল ইসলাম ও মুফতি। বাহ্যিক যে [শরীয়ত ও হাদিসের] জ্ঞান আপনি অর্জন করেছেন তা

থেকে অমুক অমুক বর্ণনাকারী সম্পর্কে আপনার মতামত দিন?” তিনি বললেন, “আমরা এ বর্ণনাকারীকে গ্রহণ করেছি। হাদিসের অনেক জ্ঞান তাঁরই বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। তাঁর গ্রন্থ আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। তাঁর ব্যাপারে কোনো মুহাদ্দিসের মধ্যে ভিন্নমত নেই।” মুহাম্মদ পারসা এবার বললেন, “যে গ্রন্থ ঐ ব্যক্তি রচনা করেছিলেন তা তো আপনার বাড়িতে, আপনার পাঠাগারেই আছে। ঠিক কোথায় আছে তা-ও আপনি জেনে নিন- অমুক ও অমুক গন্থের মাঝখানে। এতে ৫০০ পৃষ্ঠা আছে। এর রং এই-এই। গ্রন্থের মোলাট দেখতে এরূপ এবং যে হাদিস আপনারা গ্রহণ করছেন না, তা অতো নাম্বার পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।”

শায়খ পারসার কথা শুনে শায়খ হুসামুদ্দিন বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর অন্তরে সন্দেহের জন্ম নিলো। তিনি তো এরূপ কোনো গ্রন্থ থাকার ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নন। উপস্থিত সকল আলিমও অবাক। সবাই ভাবলো, এ কেমন ব্যাপার- গ্রন্থের মালিক জানেন না তাঁর পাঠাগারে একটি বই আছে অথচ এই শায়খ পারসা জানেন! সুতরাং বাদশাহ সিন্ধান্ত নিলেন, হুসামুদ্দিন সাহেবের বাড়ির পাঠাগারে এই বইটি আছে কী না তা জানতে হবে।

অনুসন্ধান করে গ্রন্থটি পাওয়া গেলো। আর ঠিক যেভাবে শায়খ পারসা বলেছিলেন, হাদিসটি গ্রন্থের উল্লেখিত পৃষ্ঠায় সহীহ সনদে বর্ণিত ছিলো। বাদশাহ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর উপস্থিত আলিমদের ধিক্কার দিলেন। এদিকে শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর খলিফা শায়খ মুহাম্মদ পারসার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদ-দুনইয়া সিজ্জীনুল মু'মিনীন ...” মুসলমানদের জন্য দুনিয়া হচ্ছে কয়েদখানা। সুতরাং এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে আখিরাতের চিরন্তন জীবনের দিকে পাড়ি জমানো। নখবন্দিয়া তরিক্বার ইমাম হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও একদিন দুনিয়ার কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর প্রেমাস্পদের নিকট চলে যান। হযরতের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে যা জানা যায় তা নিম্নরূপ।

হযরতের একজন খাদিম ছিলেন শায়খ আলী দাম্মান। তিনি বলেন, “শায়খ একদিন আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমার কবর খোঁড়ে রাখো। আমি নির্দেশ পালন কারার পর তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ভাবলাম, ‘তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন?’ তিনি তখন মাথা উত্তোলন করে বললেন, “হে আমার পুত্র! আমরা যখন হিজাযের পথে যাত্রা করছিলাম তখন তোমাকে কী বলেছিলাম- তা ভুলো না কিন্তু। যে কেউ আমাকে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক সে যেনো মুহাম্মদ পারসা ও আলাউদ্দিন আত্তারকে অনুসরণ করে।”

শেষ কটি দিন তিনি স্বীয় কক্ষে অবস্থান করেন। শত শত লোক তাঁকে একনজর দেখতে আসেন। তিনি সবাইকে নসিহত করেন। শেষ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি নিজের কক্ষটি বন্ধ করে দিলেন। তবে দলে দলে তাঁর ভক্ত-মুরিদান আসতে থাকে। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, সূরা ইয়াসীন পাঠ করো। সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত শেষ হতেই তিনি হাত উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে নীরবে দু’আ করলেন। তিনি শাহাদাত অঙ্গুলি উত্তোলন করে কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন। পাঠ শেষ করে আমাদের প্রিয় হযরতের রূহ তাঁর দেহ থেকে প্রস্থান করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। উপস্থিত তাঁর ভক্ত-মুরিদানরা অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকেন।

নখবন্দিয়া সুফি তরিক্বার প্রতিষ্ঠাতা, যুগশ্রেষ্ঠ মহান ওলিআল্লাহ হযরত শায়খ খাজা শাহ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরিদান, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাধারণ জনতাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে হিজরি ৭৯১ সনের [১৩৪৪] ৩রা রবিউল আউয়াল এ ধরাধাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় গ্রাম ক্বসর আল-আরিফীনে তাঁরই নির্বাচিত প্রিয় একটি বাগানে সমাহিত আছেন। পরবর্তীতে আগত বাদশাহগণ তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানক্বা, মাদরাসা ও মসজিদের বিশেষ তত্ত্বাবধান করেছেন। হযরতের এ বাগানটি বুখারা শহরে সুরক্ষিত আছে।

হযরত আবদুর রহমান শা’রানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন তাঁর যুগের কুতুব (আধ্যাত্মিক স্তম্ভ)। তিনি লিখেছেন, “যখন আমাদের শায়খকে তাঁর কবরে রাখা হলো,

তখন বেহেশতের একটি দরোজা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। তাঁর কবরটি বেহেশতের বাগানে পরিণত হলো। দুজন পরম সুন্দর নূরের ফিরিশতা তাঁর কবরে প্রবেশ করলেন। তাঁরা তাঁকে সালাম জানিয়ে স্বাগত জানালেন। এরপর বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আমাদেরকে সৃষ্টির পর থেকে এ পর্যন্ত আমরা আপনার খিদমাত আঞ্জাম দিতে অপেক্ষারত আছি।' তিনি এই দুজন নূরারী ফিরিশতাকে বললেন, "আমি তো তিনি ছাড়া অন্য কারো প্রতি নজর দিতে অপারগ। তোমাদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই- আমি শুধু আমার প্রভুর প্রয়োজন অনুভব করছি।"

ইমামুত তরিক্বাত শাহ বাহাউদ্দিন নশখবন্দ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফার সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কজন হলেন:

১. হযরত শায়খ আলাউদ্দিন বুখারী আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৮০২হি.]। তিনি ছিলেন হযরতের মেয়ের জামাই।

২. হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হাফিজী পারসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৮২২ হি.]। তিনি ছিলেন একজন অতিপ্রজ লেখক। তাঁর লিখিত, "রিসালা কুদসিয়া" নামক গ্রন্থ থেকে নকশবন্দিয়া তরীকার শায়খদের বর্ণনা পাওয়া যায়।

৩. হযরত ইয়াকুব কারখী গজনবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৮৫১ হি.]। তিনি গজনির অধিবাসী ছিলেন।

নকশবন্দি সাহিত্যকর্ম

খাজা বাহাউদ্দি নশখবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের পর যুগ যুগ ধরে নকশবন্দিয়া তরিক্বার ওপর গ্রন্থাদি রচিত হয়ে আসছে। অধিকাংশ গ্রন্থে হযরতের জীবন, কর্ম ও সাধনার ওপর বর্ণনা পাওয়া যায়। এরূপ কটি হচ্ছে: ১. আওরাদুন নকশবন্দিয়া, ২. তাম্বিহুল গাফিলীন, ৩. মসলকুল আনওয়ার ও ৪. হাদিয়্যাতুস সালিকীন ওয়া তুহফাতুত তালিবীন।

জীবনীগ্রন্থাদি

হযরত শাহ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অনেক জীবনীগ্রন্থ নখবন্দি লেখকগণ রচনা করে প্রকাশ করেছেন৷ এগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ কটি হচ্ছে: ১. মাশুদ বুখারী ও শরীফ জারযানী রচিত 'আওরাদে বাহাউদ্দিন', এ গ্রন্থে হযরতের জীবনবৃত্তান্ত ও ফাতওয়াসমূহ স্থান পেয়েছে, ২. শায়খ মুহাম্মদ পারসা রচিত 'রিসালা ক্কুদসিয়া', ৩. খানী রচিত 'আল-বাহজাল সানিয়্যা' এবং সালাউদ্দিন মুহাম্মদ বুখারী রচিত 'আনিসুত তালিবীন'।

নকশবন্দিয়া তরিকানুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত খাজা শায়খ আলাউদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি৷ যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তাওফিক ইনায়েত করেন তাহলে আমরা এখন তাঁরই জীনব ও সাধনার ওপর আলোচনা করবো৷ ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ৷

হযরত খাজা শায়খ আলাউদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৮০২ হিজরি, সমাধি- জাগানিয়ান, বুখারা, উজবেকিস্তান।

তিনি ছিলেন শায়খুল মাশাইখের এক তারকা। ’আলিমুন ‘আলিম, যাকে ভূষিত করা হয়েছিল ‘ঐশি জ্ঞানবৃক্ষের মিষ্টি’ ফল বলে। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের নূর ও জীবন, অন্ধকারের মুছক, উলামা-মাশায়িখ ও সাধারণ মানুষের পথপ্রদর্শক। তিনি হচ্ছেন হযরত খাজা শায়খ আলাউদ্দিন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

জন্ম ও শিক্ষা

হিজরি ৭৩৯ সনে হযরত আলাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয়। তিনি মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বুখারী নামেও পরিচিত ছিলেন। ইমামুত তরিক্বা হয়রত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলিফা ছিলেন হযরত আলাউদ্দিন। হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর জীবদ্দশায়ই হযরত আলাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর হাতে বহুলোক বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। আর এটা স্বীয় পীরের নির্দেশেই হয়েছিল। হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, “আমার পুত্র আলাউদ্দিন আত্তার আমার কাঁধের বোঝা অনেকটা হালকা করেছেন।”

পরিণত বয়সে হযরত আত্তার রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় গ্রাম পরিত্যাগ করে বুখারায় চলে আসেন। ধন-সম্পদ যা ছিলো সবই তাঁর দুই ভাইয়ের মধ্যে বন্টন করে দেন। বুখারায় ইলমে শরীয়তের প্রয়োজনীয় শিক্ষা শেষে তিনি আধ্যাত্মিক চর্চায় নিজেকে বাকি জীবনের জন্য নিয়োজিত করেন। হযরত শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণের পর হযরতের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে সম্পাদিত হয়। এ ব্যাপারে একটি ঘটনার কথা বর্ণিত আছে।

হযরত আত্তার বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করার পর শায়খ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ প্রথমে কোনো জাবাব দেন নি। পরদিন মধ্যরাতে তিনি ঘুমন্তাবস্থায় ছিলেন ক্বসর আল-আরিফীনের নিজস্ব

হুজরায়। হঠাৎ জেগে ওঠলেন। তিনি সোজা বুখারার যে মাদরাসায় আলাউদ্দিন ছিলেন সেখানে চলে গেলেন।

গভীর রাত। সবাই নিদ্রামগ্ন। কিন্তু একমাত্র আলাউদ্দিন ছাড়া। তিনি একটি ছোট্ট বাতি জ্বালিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। এদিকে হযরত শাহ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ কক্ষে ঢুকে তিলাওয়াতরত আলাউদ্দিনের কাঁধের ওপর মৃদ্যু নাড়া দিলেন। কিন্তু তাতে যেনো আলাউদ্দিন কিছুই টের পেলেন না। হযরত আবারও নাড়া দিলেন- এবারও গভীর মনোযোগসহ তিলাওয়াতে নিমগ্ন আলাউদ্দিন নিরব রইলেন। শাইখুত তরিক্বা হযরত নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ চোখ দুটো বন্ধ করে ধ্যানস্থ হলেন। তিনি দেখতে পেলেন, আলাউদ্দিন শারীরিকভাবে এখানে থাকলেও আত্মিকভাবে তিনি আল্লাহর গভীর মুশাহাদার মধ্যে আছেন। সুতরাং শায়খ তাকে আধ্যাত্মিক চেতনাসহ ডাক দিলেন। আলাউদ্দিন এবার মাথা তুলে তাকালেন ও বললেন, "ওহ আমার শায়খ!" হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "হে আমার পুত্র! তোমার জন্য সুসংবাদ। আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমার মেয়েকে তোমার জন্য পছন্দ করেছেন। এ কারণেই আমি এই গভীর রাতে তোমার এখানে এসেছি।"

এ সুসংবাদ শ্রবণ করে আলাউদ্দিন কিছুটা লজ্জাবোধ করলেন। এরপর বললেন, "ইয়া শাইখী! আমি তো একেবারে নিঃস্ব! আপনি কিংবা আপনার সাহেবাজদীর জন্য আমি যে কিছুই খরচ করতে পারবো না। যাকিছু সম্পদ ছিলো তা সবই দুই ভাইকে দান করে এসেছি।" শাহ সাহেব বললেন, "হে আমার পুত্র! আল্লাহ তা'আলা আলমে আরওয়ায় তোমার জন্য যা-ই নির্ধারিত করেছেন তা-ই যথেষ্ট। চিন্তার কারণ নেই, আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট।"

শায়খ আলাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "একদিন আমাকে এক শায়খ প্রশ্ন করলেন, 'আপনার হৃদয় কিরূপ আছে?' আমি জবাব দিলাম, 'আমি তো জানি না।' তিনি বললেন, 'আমি আমার হৃদয়কে জানি, এটা তৃতীয় রাতের চন্দ্রের মতো।'" ব্যাপারটি পরবর্তীতে আমি শায়খ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহকে বললাম। তিনি মন্তব্য করলেন, "তিনি তার হৃদয়ের

অবস্থা মুতাবিক বলেছেন।" কথাটি বলার সাথে সাথে তিনি আমার পায়ে নিজের পা রেখে জোরে চাপ দিলেন। আমি সাথে সাথে সজ্ঞাহীন হলাম। এরপর দেখি পৃথিবী ও সমগ্র জগতের সবকিছু আমার হৃদয়ের মাঝে অবস্থান করছে! আমার জ্ঞান ফিরলে দেখতে পেলাম তিনি তখনও আমার পায়ে দাঁড়ানো আছেন। তিনি বললেন, "হৃদয়টা যদি এরূপ হয় তাহলে কেউই এর বর্ণনা দিতে পারবে না। এই পবিত্র হাদিসটির ব্যাপারে এখন কী মনে করো? -'না আমার পৃথিবী না আমার আকাশ আমাকে ধারণ করতে সক্ষম, কিন্তু মু'মিনের হৃদয় আমাকে ধারণ করতে পারে।' এটা হচ্ছে গোপন রহস্যের একটি যা তোমাকে অনুধাবন করতেই হবে।"

হযরত আত্তার রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা শায়খ মুহাম্মদ পারসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি আমার শায়খকে বলতে শুনেছি, 'আমার শায়খ শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর ওয়াসিলায় আমাকে এমন একটি ক্ষমতা দান করা হয়েছে যে, চাইলে বিশ্বের সকল মানুষকে আমি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারি।'"

একদা বুখারার আলিমদের মধ্যে ইহজগতে 'আল্লাহকে দেখা'র ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। একদল বললেন, দেখা সম্ভব আর অপর দল বললেন, সম্ভব নয়। উভয় দল কিন্তু হযরত আলাউদ্দিন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুসরণকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের মতানৈক্য নিয়ে হযরতের দরবারে উপস্থিত হলেন। তারা বললেন, "ইয়া শাইখী! এ বিষয়ে আমরা আপনাকে বিচারক হিসেবে সাব্যস্ত করেছি।" তিনি বললেন, "যারা ইহলোকে দেখার বিপক্ষে তারা তিনদিন পর্যন্ত আমার এখানে অবস্থান করবে। এ তিনদিন অযু অবস্থায় থাকবে এবং কোনো কথা বলবে না।" সুতরাং তারা হযরতের খানক্বায় অবস্থান করতে লাগলেন। হযরত নিজেই তাদের সম্মুখে উপস্থিত থেকে তাদের উপর তাওয়াজ্জু প্রদান করলেন। অচিরেই সকলে আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী হলেন। এ অবস্থায় সকলেই তৃতীয় দিন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তারা যখন পুনরায় জ্ঞান ফিরে পেলেন, দেখা গোলো সবাই অঝোর ধারায় অশ্রুপাত করছেন। সকলে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, "আমান্না সাদ্দাক্বনা" [আমরা বিশ্বাস করি ও সত্য বলে সাক্ষী প্রদান করছি!]। তারা হযরতের হাতে চুমো খেয়ে বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে, ইহজগতে আল্লাহর দীদার লাভ সম্ভব।"

এরপর তারা নিজেদেরকে হযরতের খাদিম হিসেবে বাকি জীবন উৎসর্গ করেন। তারা কখনো তাঁকে ছাড়া কোথাও যেতেন না। সকলে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করতেন প্রায়ই:

অন্ধত্বাবস্থায় তারা প্রশ্ন করে,
তাদের হাতে রেখো পবিত্রতার মোমবাতি।
তারা জানবে দীদারের সম্ভাবনা
কখনো নয় অসম্ভব।
শায়খ আলাউদ্দিন অতি আপনজন শাহ নকশবন্দের
ঠিক যেরূপ ছিলেন নবী ইউসুফ তার পিতা
নবী ইয়াকুবের তরে।

মূল্যবান বাণী

১. খিলওয়াত [নির্জনবাস] অবলম্বনের মধ্যে নিয়ত থাকবে, জাগতিক সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিজকে ঐশি মহাসত্যের দিকে ধাবিত করা।

২. বলা হয়ে থাকে, বাহ্যিক জ্ঞানান্বেষীকে আল্লাহর রজ্জু ধরে রাখা একান্ত জরুরি। কিন্তু অভ্যন্তরীণ জ্ঞানান্বেষীকে স্বয়ং আল্লাহকে ধরে রাখতে হবে।

৩. শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ নতুন কাপড় প্রথমে অপর কাউকে পরতে দিতেন। এরপর পুরাতন হয়ে গেলে তিনি তা ফিরিয়ে এনে নিজে পরতেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাকে জাগতিক ক্ষমতা ও ঐশি রাজ্য থেকে গাফিল করে দেবেন, তখনই তুমি সত্যিকার অর্থে ফানার স্তরে উপনিত হবে। আর তুমি যদি ফানা থেকেও গাফিল হয়ে পড়ো তাহলে তুমি ফানার নির্যাসেও ফানা হবে। অর্থাৎ ফানার মধ্যে ফানার স্তরে উপনিত হবে।

৫. মনুষের মধ্যে অবস্থান করেও তোমার আত্মিক স্তরকে গোপন রাখতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে, মানুষের সাথে সেরূপ কথা বলতে যা তাদের হৃদয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।"

৬. সুফিদের হৃদয়ে আঘাত হানা থেকে নিজেকে সতর্ক রেখো। তাঁদের সুহবতের ইচ্ছা থাকলে প্রথমে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিতির আদব শিখে নাও। অন্যথায় তুমি নিজেকে

ক্ষতিগ্রস্থ করবে। তাঁদের রাস্তা হচ্ছে খুব স্পর্শকাতর। বলা হয়ে থাকে, 'যার উত্তম আচরণ নেই তার জন্য আমাদের এ রাস্তায় কোনো স্থান নেই।'

৭. তুমি যদি মনে করো ভালো আমল করছো, তাহলে তুমি ভুল করলে। কারণ নিজের আমলকে উত্তম মনে করাও এক ধরনের অহঙ্কার।

৮. শায়খদের কবর জিয়ারত করার ফায়দা নির্ভর করে তাঁদের সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের মাত্রার ওপর।

৯. পরহেজগার ব্যক্তির কবরের নিকটস্থ হলে উপকার আছে। তবে তুমি যদি তাঁদের আত্মার দিকে নিজেকে ধাবিত করতে সক্ষম হও তাহলে তা আরো উত্তম। এর দ্বারা উচ্চতর আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করা যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তুমি যেখানেই থাকো আমার ওপর দরূদ প্রেরণ করো।" এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, দূরবর্তী স্থান থেকেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। একই ব্যাপার আল্লাহর ওলিদের ক্ষেত্রেও সত্য। কারণ তাঁরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই ক্ষমতা লাভ করেছেন।

১০. কবর জিয়ারতের আদব হচ্ছে, নিজেকে আল্লাহর দিকে রুজু করা ও কবরের পবিত্র রূহ সমুহের ওয়াসিলার দ্বারা তাঁর সম্মুখে নিজেকে বিনয়সহ উপস্থিত রাখা। বাহ্যিকভাবে কবরবাসীদের সম্মুখে থেকেও অভ্যন্তরীণভাবে তুমি থাকবে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে। কোনো মানুষের সম্মুখে রুকু-সিজদা করা হারাম। সুতরাং কবরের সামনে এসব কর্ম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১১. আল্লাহর ধ্যানমগ্নতা ও গভীর মুরাক্বাবা স্বরবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা থেকেও উত্তম। সালিক ধ্যান-মুরাক্বাবার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং ঐশি রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করবে। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে তাকে অনুমতি দেওয়া হবে। সে জানবে হৃদয়ের ভেতর দিয়ে কী কী জিনিস অতিক্রম করছে। এমনকি অতিসূক্ষ্ম গুজব ও ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে সে অবগত হবে। সে নিজে আলোকিত হবে এবং অপরকে আলোকিত করবে তাওহিদের নির্যাসের অবস্থা থেকে।

১৩. নিরবতা হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর। তবে তিনটি শর্ত ছাড়া: ১. যদি খারাপ ওয়াসওয়াসা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহলে অবশ্যই নিরব থাকা ঠিক হবে না। ২. আল্লাহর

জিকিরের দিকে ধাবিত করতে হৃদয়কে নিরব রাখবে না। ৩. যদি হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ দৃষ্টি তোমাকে কথা বলতে নির্দেশ দেয় তাহলে তুমি নিরব থাকতে পারবে না।

১৪. ক্ষতিকর, দুষ্ট চিন্তাভাবনা থেকে হৃদয়কে নিরাপদ রাখা খুব কঠিন। আমি নিজের অন্তরকে দীর্ঘ বিশ বছর নিরাপদ রেখেছি কোনো একটিও ওয়াসওয়াসা সেথায় প্রবেশ করা থেকে।

১৫. এ রাস্তায় সর্বোচ্চ আমল হচ্ছে হৃদয়ে প্রবেশকৃত ওয়াসওয়াসা ও গুজবকে শক্ত হাতে শাস্তি দিয়ে দমন করা।

১৬. আমার কিছু অনুসারীর ওপর আমি অসন্তুষ্ট ছিলাম। কারণ তারা নিজেদের মধ্যে আগত কিছু কাশফ আসার পরও স্বীয় স্তরে ঠিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৭. যখন মুরিদের হৃদয় তার মুর্শিদের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হবে, তখন সে হৃদয়ে অন্য কোনো প্রেমাকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকবে না। এমতাবস্থায় ঐ হৃদয়ে ঐশি জ্ঞানের শুরুহীন ও শেষহীন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকবে।

১৮. মুরিদকে অবশ্যই তার সকল অবস্থা পীরকে জানাতে হবে। এছাড়া তাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, পীরের সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা ছাড়া সে কখনো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না। তাকে বুঝতে হবে যে, সকল বাহ্যিক ও গোপন দরোজা বন্ধ আছে শুধুমাত্র একটি ছাড়া- সেটি হচ্ছে তার শায়খ। শায়খের তরে নিজেকে কুরবান করা চাই। সে যদি সর্বোচ্চ রিয়াজত-মুজাহাদা পালনে সক্ষমও থেকে থাকে তবুও শায়খের সামনে তাকে নিঃস্ব অবস্থায় হাজির থাকতে হবে। এক কথায়, দুনিয়াবী ও ধার্মিকতার ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শায়খের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। এরূপ মুরিদ হতে পারলে মাক্বামে মাকসূদে পৌঁছার ব্যাপারে আশা রাখা যায়।

১৯. শায়খের সুহবত লাভ করা প্রত্যেক মুরিদের জন্য ওয়াজিব। পারলে সর্বদা, না হয় প্রত্যহ একবার, তা না পারলে একদিন পরপর অবশ্যই শায়খের খিদমাতে থাকা চাই। যদি পীর ও মুরীদের মধ্যে দূরত্ব বেশি থাকে তাহলে অন্তত প্রতি এক কিংবা দু মাস পর পর অবশ্যই শায়খের সুহবতে যেতে হবে।

২০. তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত করছি যে, এ রাস্তার কোনো সালিক যদি তার পীরকে অনুসরণে আন্তরিক হয় তাহলে সে একদা কাঙ্ক্ষিত স্তরে যেয়ে উপস্থিত হবেই। শাহ

নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিলেন, তাঁর ইত্তিবা করতে। আমি তাঁকে যে ব্যাপারেই ইত্তিবা করেছি সাথে সাথে তার সুফলও লাভ করেছি।'

২১. তিনি বলেন, 'আমাদের রাস্তার মাশাইখে আজমকে সঠিকভাবে জানা যাবে না "মাক্বাম আত-তালউইন" [রঙ ও রদবদলের স্তর] ছাড়া। যে কেউ তাঁদের ইত্তিবা করবে সে উক্ত স্তরে উন্নীত হবে। [এখানে এটাই বুঝানো হচ্ছে যে, সালিক উচ্চ মাক্বামে উন্নীত হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার মুর্শিদের অনুসরণ করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।]

২২. তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণ সম্পর্কে শায়খ আলাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য হাসিলে সর্বাধিক স্বল্প দূরত্বের রাস্তা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা যদি অনুগ্রহ করে সালিকের সম্মুখে স্বীয় তাওহিদের নির্যাসের মুখাবয়বের পর্দা উন্মোচন করে দেন। তবে এটা তিনি তখনই করে থাকেন যখন সালিক গাইবা [আত্মবিলুপ্তি] ও পরিপূর্ণ তাওহিদের মধ্যে ফানার স্তরে উপনিত হয়। তখন একমাত্র আল্লাহর মাহাত্ম্যের নির্যাস তার চেতনায় জাগ্রত থাকবে। সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এটাই হচ্ছে আল্লাহপ্রাপ্তির ভ্রমণের শেষ স্তর। এখান থেকে শুরু হবে আরেক উচ্চ স্তরের দিকে ভ্রমণ।'

২৩. আল্লাহপ্রাপ্তি ও আকর্ষণের স্তর শেষে আসে আত্মবিলুপ্তির ভ্রমণের অবস্থা। এটাই হচ্ছে মানবতার চূড়ান্ত লক্ষ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমি জিন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কিছুর জন্য সৃষ্টি করি নি।" এখানে ইবাদত অর্থ আল্লাহর মা'রিফাত [পরিচিতি] লাভ।

২৪. রিয়াজতের উদ্দেশ্য হলো দৈহিক সকল সংযোগকে বিসর্জন দেওয়া ও সম্পূর্ণরূপে আত্মাসমুহের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা।

২৫. যদি নিজের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে বলে অনুভব করো তাহলে তাকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে দাও। যদি হৃদয় আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় জড়িত না হয় তাহলে তাকে ভীতু থাকতে দাও যে, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।

২৬. মাশাইখের কবর জিয়ারত থেকে কী পরিমাণ ফয়েজ লাভ হবে তা নির্ভর করে মাশাইখের প্রতি জিয়ারতকারীর ভক্তির পরিমাণের ওপর।

হযরতের ইন্তিকাল

হযরত শায়খ আলাউদ্দিন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ ৮০২ হিজরি সনের ২য় রজব ভক্ত-মুরিদানকে বললেন, "শীঘ্রই আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো। কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।" মাত্র ১৮দিন পর ২০ রজব তিনি সত্যিই সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বুখারার জাগানিয়ান মহল্লায় সমাহিত আছেন। আল্লাহ তাঁর গোপন সহস্যাবলী সংরক্ষণ করুন।

হযরত শায়খ আলাউদ্দিন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বেশ কজন খলিফা ছিলেন। তবে তিনি যাকে অনুসরণের যোগ্য ভাবতেন তাঁর নাম হচ্ছে হযরত মাওলানা শায়খ ইয়াকুব চারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচার উপর আত্মনিয়োগ করবো। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। তাঁর নিকট আমরা বিনয়ের সাথে তাওফিক কামনা করছি।

হযরত মাওলানা শায়খ ইয়াকুব চারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৮৫১ হিজরি, সমাধি- বালফানুর, তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশাম্বি থেকে ৫ কি.মি. দূরে।

আমি আল্লাহকে জেনেছি ও তাঁকে ছাড়া
আর কাউকে দেখি না
সুতরাং 'অপর' আমাদের থেকে বিস্মৃত।
এককত্বকে অনুধাবের পর থেকে,
আমি আর বিচ্ছেদে ভীতু নই;
এদিন আমি এসেছি ও আমি এখন একত্রিত।
-অজানা এক সুফির উক্তি

তিনি ছিলেন নকশবন্দী তরিকার ইমাম শায়খ হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র ও শাগরিদ। তিনি হচ্ছেন সুফি ও ইলমে শরীয়তের বিখ্যাত ফকীহ হযরত মাওলানা ইয়াকুব চারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি তাঁর স্বনামধন্য উস্তাদ ও নকশবন্দীয়া তরিকার ইমামের কাছ থেকে তরিকতের খিলাফত লাভ করেছিলেন। তবে শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর নির্দেশেই পরবর্তীতে তাঁর অপর খলিফা শায়খ আলাউদ্দিন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রধান খলিফা নির্বাচিত হন।

জন্ম ও শিক্ষা

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো ইয়াকুব ইবনে উসমান ইবনে মাহমুদ গজনবী চারখী। তিনি ৭৬২ হিজরি সনে [১৩৬০ ঈ] গারনিন শাহরের নিকটস্থ চারখ নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শহরটি বর্তমান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল ও কন্দাহারের মাঝখানে অবস্থিত। অল্প বয়সেই প্রাথমিক শিক্ষাশেষে তিনি হিরাতে চলে যান। হিরাতে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে করে চলে যান মিশরে। সেখানে ফিকাহ ও ইলমে মানতিকের ওপর গভীর জ্ঞানার্জন

করেন। তাছাড়া ইলমে হাদিসের ওপর সে যুগে তাঁর মতো বিশেষজ্ঞ খুব অল্প ব্যক্তিই ছিলেন। কথিত আছে ৫ লক্ষাধিক হাদিস তাঁর মুখস্ত ছিলো। যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, 'জ্ঞানকোষ' নামে খ্যাত হযরত শিহাবুদ্দিন শিরাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহর নিকট হাদিস অধ্যয়নে ধন্য হোন হযরত চারখী রাহিমাহুল্লাহ। উচ্চতর লেখাপড়া শেষে ফাতওয়াহ প্রদানের যোগ্যতা লাভ করে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইমামুত তারিক্বা হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গ লাভ

নিজ জন্মস্থানে ফিরে হযরত চারখী রাহিমাহুল্লাহ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্বেষায় যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর বাসস্থান ক্বসর আল-আরিফীনে চলে আসেন। হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করে ইলমে মা'রিফাতের মক্বামগুলো দ্রুত পাড়ি দিতে থাকেন। জীবন সায়াহ্নে শায়খ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে তরিকতের খিলাফত প্রদান করে বললেন, তুমি আমার আলাউদ্দিনের সুহবতে থাকবে। হযরত আলাউদ্দিন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে শীঘ্রই খিলাফতের খিরক্বা প্রদান করেন।

বিভিন্ন ঘটনা ও বাণী

১. একদিন হযরত ইয়াকুব চারখী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এক ছাত্র ও শাগরিদ খাজা আহরার রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলেন, "শুনেছি, শায়খ জিয়াউদ্দিন খোওয়াফী নাকি স্বপ্নের ও কাশফের ব্যাখ্যা দিতে পারদর্শী?" শাগরিদ জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমার শায়খ। কথাটি সত্য।" এরপর তিকি হঠাৎ জ্ঞান হারালেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে মাথা উত্তোলন করে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন:

আমি যখন সূর্যের গোলাম হয়েছি,
আমি সম্পূর্ণ সূর্যের কথাই বলি।
আমি না রাত্রি, না রাত্রির উপাসক,
আমি কথা বলি স্বপ্নের গল্পের।

২. শায়খ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে তিনি বলেন, "তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেই তাঁর প্রতি আমার অন্তরে

ভালোবাসার জন্ম নিয়েছিল। মিশরে থাকতে আমি যখন ফাতওয়াহ্ প্রদানের ইযাজত লাভ করি, তখন দেশে ফিরে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে সাক্ষাতে যাই। আমি হযরতকে সবিনয়ে অনুরোধ জানালাম, 'অনুগ্রহ করে এ অধমকে আপনার খেয়ালে রাখবেন।' তিনি বললেন, 'তুমি তোমার দেশ চারখে যাত্রাকালে আমার নিকট এসেছো?' আমি বললাম, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং আপনার খাদিম। আপনার সুখ্যাতি সর্বত্র এবং সবাই আপনাকে সম্মান করে।' তিনি বললেন, 'তোমাকে গ্রহণ করার জন্য এটাই যথেষ্ট কারণ নয়।' আমি বললাম, 'হে শাইখী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সহীহ হাদিস হলো, "আল্লাহ যদি কাউকে ভালোবাসেন, তিনি মানুষের অন্তরকে এ ব্যক্তিকে ভালোবাসতে প্রভাবিত করেন।" এরপর তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'আমি তো আযিজানের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। তুমি যা বললে তা সত্য।' আমি একথা শুনে অবাক হলাম। কারণ মাস খানেক পূর্বে আমি একটি স্বপ্ন দেখি। কে যেনো বলছিলো, 'আযিজানের মুরিদ হবে।' আমি তখন জানতাম না আযিজান কে ছিলেন? মনে হলো তিনি যেনো আমার স্বপ্নের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিলেন!

আমি তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিলাম। তিনি বললেন, 'তুমি যেতে পারো। তবে তোমাকে আমি একটি উপহার দিচ্ছি। এর দ্বারা তুমি আমাকে স্মরণ করতে পারবে।' তিনি আমাকে নিজের পাগড়ি দিলেন। এরপর বললেন, 'তুমি যখন এটি পরবে বা দেখবে তখন আমার কথা মনে পড়বে। আর আমাকে স্মরণ করলে আমাকে পাবে এবং আমাকে পেয়ে তুমি আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তা পাবে।'

৩. তিনি বলেন, হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, 'তোমার দেশ বলখে যাওয়ার পথে মাওলানা তাজউদ্দিন কাওলাকীর সাঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, তাঁর সঙ্গে খোশ-গল্প করা থেকে বিরত থেকো। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ওলি। তিনি তোমাকে তিরস্কার করবেন।' আমি ভাবলাম, আমি তো হিরাতে যাচ্ছি বলখ হয়ে। আমি কাওলাক হয়ে যাবো না। মাওলানা তাজউদ্দিন কাওলাকে থাকেন। সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হবে বলে মনে হয় না। যাক, আমি যাত্রা করলাম এবং বলখ হয়েই হিরাতের পথে অগ্রসর হলাম।

কিন্তু কী আশ্চর্য! রাস্তায় আমাদের কাফেলা সমস্যায় পড়ে যায় এবং বাধ্য হয়ে আমাদেরকে কাওলাক হয়ে যেতে হলো।

আমি বুঝতে পারলাম যে, হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর ইচ্ছে ছিলো কাওলাক হয়ে যাই, তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছেন। কাওলাকে পৌঁছার সময় সন্ধ্যে ঘনিয়ে গিয়েছিল। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আকাশে কোনো তারাও ছিলো না। আমি একটি মসজিদে যেয়ে মাওলানা তাজউদ্দিন কাওলাকী কোথায় আছেন জানতে চাইলাম। এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বললেন, 'আপনি কী ইয়াকুব চারখী?' আমি এ প্রশ্নে অবাক হলাম, এ ব্যক্তি আমার নাম জানলো কীভাবে? তিনি আরো বললেন, 'অবাক হবার কিছু নয়। এখানে আসার পূর্বেই আমি তোমাকে জানতাম। আমার শায়খ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন, আপনাকে শায়খ তাজউদ্দিনের কাছে নিয়ে যেতে।'

শায়খ তাজউদ্দিনকে দেখতে যাওয়ার পথে আমরা এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্র! আমাদের রাস্তাটি বিস্ময় ও চমকে পরিপূর্ণ। যে কেউ এতে প্রবেশ করে, সে তা বুঝতে পারে না। সালিক তার মনকে পেছনে রেখে আসতে হবে।' আমরা মাওলানা তাজউদ্দিনের দরবারে উপস্থিত হলাম। তাঁর সম্মুখে কথা বলা থেকে নিজেকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলাম। মাওলানা তাজউদ্দিন আমাকে একটুকু আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করলেন। এ সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমি অজ্ঞাত ছিলাম। এই সামান্য জ্ঞানের তুলনায় আমার সারাজীবনের জ্ঞানার্জন খুব তুচ্ছ মনে হলো। আমি আমার শায়খ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ অনুভব করলাম। কী সুন্দরভাবে তিনি শায়খ তাজউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটালেন। এতে তাঁর প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা শত শত গুণ বৃদ্ধি পেলো।

৪. শায়খ চারখী বলেন, নিজের দেশে অবস্থান করলেও সময় সময় আমি বুখারা চলে যেতাম এবং শায়খ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থাকতাম। বুখারায় আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা এক 'মজযূব' বাস করতেন। সবাই তাঁকে চিনতেন। মানুষ তাঁর কাছে যেতো

বরকত লাভের আশায়। একদিন আমি আমার শায়খকে দেখতে যাওয়ার পথে এই মজযূব ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'তোমার গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটে যাও। থামবে না! তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছো তা-ই উত্তম।' এরপর তিনি ধূলো-বালির উপর অনেক লাইন অঙ্কন করলেন। আমি ভাবলাম, লাইনগুলো গুণে দেখবো। যদি লাইনের সংখ্যা বিজোড় হয় তাহলে তা আমার জন্য ভালো হবে। কারণ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ এক, তা-ই তিনি বিজোড় সংখ্যা ভালোবাসেন।" লাইন গণনা করে দেখলাম তা বিজোড়। আমি অন্তরে আনন্দবোধ করি। আমি হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর নিকট চলে গেলাম। আবদার করলাম বাইআত গ্রহণ করতে। তিনি বাইআত গ্রহণ করলেন ও আমাকে জিকিরের সবক দিলেন। তিনি আমাকে সংখ্যার হাক্বিকাত শিক্ষা দিলেন। এরপর তিনি একটি কথা বললেন, তাতে মনে হলো তিনি যেনো উপস্থিত ছিলেন যখন আমি মজযূবের সঙ্গে ছিলাম, 'হে আমার পুত্র! সর্বদা বিজোড় সংখ্যার প্রতি আকর্ষণ রাখবে। ঠিক যেভাবে তুমি ইচ্ছে করেছিলে, সংখ্যাটি যেনো বিজোড় হয়! এটি তোমাকে একটি ইশারা দান করেছিলো। সুতরাং জিকিরকালে [বিজোড় হওয়ার ব্যাপারে] সজাগ থেকো।'

৫. আমি ক্রমান্বয়ে আলোর ফোয়ারা ও প্রেমের বাগানে গভীর থেকে গভীরভাবে নিমজ্জিত হচ্ছিলাম। যতো বেশি আমার শায়খের সুহবতে থাকি ততো বেশি তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একদিন আমি পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করলাম:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ * فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ * قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ

-"এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশমাত্র।" [৬:৯০]

আমি এ পবিত্র আয়াতটি পাঠ করে বেশ উৎফুল্ল হলাম। বার বার পাঠ করলাম। এসময় 'ফাতাহাবাদ' নামক একটি শহরে আমি বাস করতাম। দিনের শেষে আমি শায়খ বাখারাজী

রাহিমাহুল্লাহর মসজিদ ও মাজার জিয়ারত করতে যাই। কিন্তু যাত্রাপথে আমার অন্তরে একটি ভাবনা আসলো, যাতে আমি অস্থির হয়ে ওঠি। সুতরাং আমি পথপরিবর্তন করে হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর বাসস্থান ক্বসর আল-আরিফীনের রাস্তা ধরি। তাঁর সম্মুখে হাজির হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, তিনি যেনো আমার জন্য অপেক্ষারত ছিলেন। তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘নামাযের সময় হয়ে গেছে। আমরা পরে কথা বলবো।’ নামায শেষে তিনি বললেন, ‘আমার দিকে তাকাও!’ আমি তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে তাকিয়ে এর অপূর্ব ঐশি মাহাত্ম্যের মধ্যে নিমজ্জিত হলাম। আমার অন্তরে ততক্ষণে কম্পন শুরু হয়েছে। আমি নিজের মুখকে বদ্ধ রাখলাম। তিনি বললেন, ‘জ্ঞান হচ্ছে দু ধরনের: ১. হৃদয়ের জ্ঞান। এটা হচ্ছে উপকারী জ্ঞান। এটা নবী-রাসূলদের জ্ঞান। ২. জিহ্বার জ্ঞান। এটা হচ্ছে বহির্জ্ঞান। আর তাহলো দৃশ্যমান ও শ্রবণযোগ্য শিক্ষা, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন। আমি আশা করছি যে আল্লাহ তা’আলা তোমাকে আভ্যন্তরীণ জ্ঞান দান করবেন। এটা তো এই হাদিস দ্বারা আসে: ‘‘তুমি যদি হাক্বিকাতপন্থীদের সুহবতে বসো, তাহলে একটি উত্তম হৃদয়সহ বসো। কারণ তারা হচ্ছেন হৃদয়ের গোয়েন্দা। তোমার হৃদয়ে কী আছে তা দেখার জন্য তাঁরা সেথায় প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখেন।’

৬. তিনি বলেন, হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ আমাকে একদিন বললেন, ‘মহান আল্লাহ তা’আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমার শায়খ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এ রাস্তায় কাউকে গ্রহণ করে না নিতে যদি না আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আমার শায়খ তাকে গ্রহণ করেন। সুতরাং আজ আমি দৃষ্টিপাত করছি এবং দেখে দেবো তোমাকে গ্রহণ করার অনুমতি পাওয়া যায় কি না।’

আমার জীবনের এটাই ছিলো সবচেয়ে কঠিন দিন। আমি অনুভব করলাম, তাঁরা হয়তো এ রাস্তার পথিক হিসেবে আমাকে গ্রহণ করবেন না। ফযরের নামায আমি শায়খের পেছনে আদায় করলাম। আমি তখনও ভীষণভাবে আতঙ্কিত ছিলাম। তিনি আমার অন্তরের ওপর দৃষ্টিপাত করতেই সবকিছু বিলুপ্ত হয়ে গেলো। আমি শুধু তাঁকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। এরপর অন্তরের কানে তাঁর কথা শ্রবণ করলাম, ‘আল্লাহ তোমার প্রতি খুশি, তিনি তোমাকে গ্রহণ করেছেন এবং আমিও গ্রহণ করে নিলাম।’ এরপর তিনি নকশবন্দিয়া

তরিকার স্বর্ণালি শাজারাহ মুবারকের সকল মাশাইয়ে আজমের নাম মুবারক একে একে উচ্চারণ করতে লাগলেন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত আমির কুলাল রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত সবার নাম খুব তাজিমের সাথে স্মরণ করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যে মুহূর্তে তিনি যে শায়খের নাম উচ্চারণ করলেন সে মুহূর্তে ঐ শায়খের রূহানী অবয়ব আমার অন্তর্দৃষ্টে ভেসে ওঠলো। যখন তিনি হযরত আবদুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহ বলে থামলেন, আমার সম্মুখে তাঁকে দেখলাম। তিনি [আবদুল খালিক সাহেব] বললেন, 'আমার নিকট তাঁকে দাও।' তিনি আমাকে ক্ষণকালের মধ্যেই 'উকুফুল কাদাদি' [সংখ্যার জ্ঞান] সম্পর্কে অবগত করলেন। তিনি জানালেন, এ জ্ঞান তিনি আহরণ করেছেন হযরত খিজির আলাইহিসসালামের কাছ থেকে। আমার শাইখী সিলসিলার পরবর্তী শায়খদের নাম উচ্চারণ করতে থাকেন। প্রত্যেকবারই তাঁদের রূহানী উপস্থিতি দ্বারা উপকৃত হতে থাকি।

আমি শায়খ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর খিদমাত করতে থাকি। এরপর তিনি একদিন আমাকে খিলাফতের দায়িত্ব দিলেন। বললেন, "হে ইয়াকুব! এই রাস্তাটি হবে তোমার জন্য বিরাট আত্মতৃপ্তির।"

৭. হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমাকে হযরত ইয়াকুব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'হে আমার পুত্র! আমি শাহ নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, তাঁর ইন্তিকালের পর শায়খ আলাউদ্দিন আত্তার রাহিমাহুল্লাহর সুহবত লাভের। আমি এই নির্দেশ হেতু হযরত আত্তারের সুহবতে যাই। আমি তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে মুরিদ হই। বুখারার জাগানিয়ানে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁর সান্নিধ্যে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ! হযরতের বরকতে আমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং আমার প্রশিক্ষণও সম্মপ্ন হয়েছে।"

একটি আশ্চর্য কারামত

শায়খ উবাইদুল্লাহ আহরার বর্ণনা করেন, "শায়খ ইয়াকুব চারখী ও শায়খ জিয়াউদ্দিন খাওয়াফী দু ভাইয়ের মতো ছিলেন। তাঁরা উভয়ে একসঙ্গে মিশরে যেয়ে হযরত শায়খ

শিহাবুদ্দিন শিরাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহর নিকট লেখাপড়া করেন। শায়খ জিয়াউদ্দিন বলেন, হযরত শিরাওয়ানী যখন বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন তখন ইয়াকুব চারখী রাহিমাহুল্লাহ মাঝে মাঝে গায়েব হয়ে যেতেন। এই অদৃশ্য হওয়া ও আবার দৃশ্যমান হওয়ার কারামত দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছিলো যে, তিনি আল্লাহর মুশাহাদার মধ্যে সময় সময় সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হতেন।”

কাতিব

শায়খ ইয়াকুব চারখী রাহিমাহুল্লাহ একজন সুলেখকও ছিলেন। তিনি শরীয়ত ও তরিকতের ওপর বেশ কয়েকটি উন্নতমানের গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। নিম্নে কয়েকটির নাম ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করছি।

১. তাফসিরে ইয়াকুব চারখী (ফার্সিতে রচিত): এ গ্রন্থটিতে সূরা ফাতিহা ও শেষের দুটি পারার তাফসির স্থান পেয়েছে। এটি ৮৫১ হিজরি সনে সম্পন্ন হয়।

২. রিসালা নাযিয়্যাহ: এটি হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী রাহিমাহুল্লাহর মসনবী মা’নবি কিতাবের মুকাদ্দিমার ওপর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। দীর্ঘদিন পাণ্ডুলিপি আকারে থাকার পর এটির মূল ফার্সি সংস্করণ ১৩৩৬ হিজরি সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩. রিসালা উনসিয়্যাহ: এতে তিনি নকশবন্দী পদ্ধতিতে জিকরে খফী ও সর্বদা ওযু রাখার ফজিলত বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এতে নফল ইবাদতের গুরুত্ব এবং পূর্বেকার শায়খুল মাশাইখবৃন্দ তথা খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ, খাজা আলাউদ্দিন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা ও অন্যান্যদের বাণী সংকলিত হয়েছে।

৪. শরহে রুবাই আবু সাঈদ আবুল খায়ির, জামালিয়া, হুরাইয়া: এটা হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবিতাগ্রন্থের একটি শরাহ। কিতাবটি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে।

৫. রিসালা আবদালিয়া: এটা ‘আবদাল’ পর্যায়ের ওলিদের ব্যাপারে একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি অন্য সবগুলোর মতোই ফার্সি ভাষায় রচিত।

৬. শরহে আসমাউল হুসনা: আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। হযরত ইয়াকুব চারখী রাহিমাহুল্লাহর হাতের লেখা এ কিতাবের পাণ্ডুলিপি এখনও সংরক্ষিত আছে।

৭. তাযকিরাতু খতমে আহযাব: হাফিজুদ্দিন বুখারী থেকে বর্ণিত পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত এই কিতাবটি রচনা করেন।

৮. রিসালাতু আলামতে ক্বিয়ামাহ: এই কিতাবটির পাণ্ডুলিপি এখনও উজবেকিস্তানের তাশকেন্দ ও ইরানের তেহরানে সংরক্ষিত আছে।

৯. তাজিক ভাষায় পবিত্র কুআনের তরজমা: সম্ভবত তাজিক ভাষায় কুরআন শরীফের প্রথম তরজমা।

মায়াবী ধরা থেকে চিরবিদায়

হযরত ইয়াকুব চারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হুলগাতু নামক শহরে ৫ম সফর, ৮৫১ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশান্বি থেকে ৫ কি.মি. দূরে বালফানুর নামক স্থানে তিনি সমাহিত আছেন।

জীবন তো নয় চিরন্তন
জন্মিলে একদিন হবেই মরণ।

হযরত ইয়াকুব চারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একাধিক খলিফা ছিলেন। তবে নকশবন্দিয়া সিলসিলা মুতাবিক পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন তাঁর খলিফা হযরত খাজা শায়খ উবাইদুল্লাহ আহরার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা তাই আল্লাহর মর্জি হলে পরবর্তীতে তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা করবো। হে আল্লাহ! তোমার ওলিদের ওয়াসিলায় অধমকে তাওফিক দিন।

হযরত খাজা শায়খ উবাইদুল্লাহ আহরার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৮০৬ হিজরি, সমাধি- কামান কাশান, সমরকন্দ, উজবেকিস্তান।

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো নাসিরুদ্দিন উবাইদুল্লাহ আহরার। তবে তিনি খাজা আহরার নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন নকশবন্দিয়া তরিকার একজন শায়খ। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন হযরত ইয়াকুব চারখী রাহামাতুল্লাহি আলাইহি।

জন্ম ও শিক্ষা

হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহ উজবেকিস্তানের সমরকন্দে একটি সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নানা ছিলেন সুফি শায়খ উমর বাগিস্তানীর সন্তান খাজা খাওয়ান্দ তাহুর রাহিমাহুল্লাহ। উমর বাগিস্তানী রাহিমাহুল্লাহকে হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ খুব সম্মান করতেন। হযরত উবাইদুল্লাহ ৮০৬ হিজরির রমজান শরীফে তাশকেন্দের নিকটস্থ বাগিস্তান নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালীন একটি ঘটনার কথা বর্ণিত আছে।

জন্মকালীন ঘটনা

হযরতের জন্মের বেশ পূর্বে তাঁর পিতা নিজেকে হঠাৎ করে মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে শুরু করেন। তিনি দুনিয়াবী সবকিছু ছেড়ে নির্জনবাসে চলে যান। এসময় তিনি ঘুম ও খাবার প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। সারাক্ষণ জিকির-আজকার ও নফল ইবাদতে লেগে থাকতেন। কেউ জানতো না তার এরূপ কাজকর্মের কারণ কী ছিলো। এদিকে তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলেন। এরপর তিনি সাধারণ জীবন-যাপনে ফিরে আসেন।

শায়খ উবাইদুল্লাহর জন্মের পূর্বেকার আরো একটি ঘটনা শায়খ মুহাম্মদ সিরবিলি বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন, ‘‘একদিন শায়খ নিযামুদ্দিন খামুশ সমরকন্দী রাহিমাহুল্লাহ আমার পিতার কক্ষে বসা ছিলেন। তিনি তখন ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ খুব উচ্চস্বরে চিৎকার দিলেন। এতে বাড়ির সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, ‘আমার মধ্যে একটি কাশফ হয়েছে।

দেখলাম একজন বিরাট আকারের ব্যক্তি পূর্বদিক থেকে আমার দিকে আসছেন। তাঁকে ছাড়া এ জগতে আর কিছুই আমি দেখতে পাই নি। তাঁর নাম উবাইদুল্লাহ। তিনি হবেন যুগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের শায়খ। তাঁর অসংখ্য অনুসারী হবেন। আমি আশা করছি তাঁকে অনুসরণের সৌভাগ্য লাভ করবো।'"

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সুসংবাদ

জানা যায়, হযরত উবাইদুল্লাহর দাদা হযরত শাহাবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ যুগের কুতুব ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় নাতি উবাইদুল্লাহকে কাছে আসতে বললেন। তখন খাজা উবাইদুল্লাহ খুব অল্প বয়সের বালক মাত্র। প্রিয় নাতিকে কোলো তুলে বললেন, "আমার নাতিটি সাধারণ নয়। আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সুসংবাদ জেনেছি। আমার এ নাতি শরীয়ত ও তরিকতের নূর দ্বারা জগতকে আলোকিত করবে।"

স্বপ্নযোগে হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ

হযরত উবাইদুল্লাহর প্রথামিক শিক্ষা শুরু হয় তাশকেন্দে। বাড়িতে তাঁর চাচা ইব্রাহিম শাশীও তাঁকে নিয়মিত পাঠদান করতেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশে তিনি সমরকন্দ চলে যান। তবে বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। একদিন তিনি হযরত ঈসা আলাইহিসসালামকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বললেন, "হে উবাইদুল্লাহ! চিন্তা করো না। আমি তোমাকে শিক্ষা দেবো।"

বাড়িতে ফিরে আসার পর তিনি পারিবারিক কৃষি ক্ষেতে হালচাষ শুরু করেন। এতে বিরাট বরকত হয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিনি অনেক জায়গার মালিক হন। তিনি একজন সফল ব্যবাসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর বাণিজ্যিক কাফেলা সুদূর চীন পর্যন্ত যেতো। ইতিহাসবিদরা বলেন, অচিরেই তিনি সমরকন্দের একজন ধনী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তবে তাঁর ধন-সম্পদের অধিকাংশই গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। তাঁর অনেক জমিজমা ও সম্পদ ওয়াকফ করে দান করেছিলেন।

তরিকতের রাস্তায়

প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও খাজা উবাউদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহ আত্মিকভাবে শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অনুসন্ধান করছিলেন। অনেক ঘোরাঘুরি শেষে আল্লাহর মর্জিতে একদিন সে যুগের নকশবন্দি প্রধান শায়খ হযরত ইয়াকুব চারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে যেয়ে উপস্থিত হন। তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে ইলমে তাসাওউফের স্তরসমূহ অতিক্রম করে যেতে থাকেন।

হযরত চারখী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ প্রিয় মুরিদকে একদিন বললেন, ‘‘নিজেকে জিকির-শুগল ও উকুফ 'আদাদির মাঝে নিমজ্জিত রেখো। এটা আমার নিকট খাজা নকশবন্দ থেকে এসেছে।’’ তিনি একদা তাঁর অন্যান্য মুরিদকে বললেন, ‘‘উবাইদুল্লাহর বাতিটি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। বাতির সলতাও লাগানো ছিলো, বাকি ছিলো মাত্র আগুন ধরিয়ে দেওয়ার।’’

বিখ্যাত সুফি কবি হযরত খাজা আবদুর রহমান জামি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন খাজা উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট খলিফা। তিনি লিখেন, ‘‘এ যুগে হযরত উবাইদুল্লাহর ব্যক্তিত্ব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন। তাঁর মধ্যে একত্রিত হয়েছে বেলায়েত ও কারামত। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপস্থিতি দ্বারা সালিকদের অফুরন্ত ফায়দা হাসিলে তাওফিক দিন।’’

তাঁর মূল্যবান বাণী

১. তুমি যদি হাক্বিকাতের উপস্থিতির মাক্বামে আরোহণ করতে আগ্রহী হও এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকতে চাও, তাহলে তোমার জন্য আহলুল্লাহদের সুহবত লাভ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তাঁরা হচ্ছেন ঐসব ব্যক্তি যারা নিজেদের জীবন ও মালকে আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন করেছেন। কেউ কেউ এই মাক্বামকে ‘শুহুদ’ [সাক্ষ্যদান], অন্যরা ‘উজূদ’ [উপস্থিতি], আরেকদল ‘তাজাল্লি’ [প্রকাশ] এবং অন্য আরেকদল ‘ইয়াদ দাশত’ [স্মরণ] হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২. শুগলের অবস্থায় সালিককে প্রত্যেক শ্বাস ও নিঃশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এর ফলে আল্লাহর সম্পর্ক (নিসবত) ছাড়া কেনো একটি শ্বাস ভেতরে প্রবেশ ও বের হবে না। এই শুগল দ্বারা এক পর্যায়ে এসে হৃদয়ে আল্লাহর উপস্থিতি চিরন্তন হয়ে যাবে। সালিক তখন চেতন-অচেতন উভয় অবস্থায়ই শুগলে অভ্যস্ত থাকবে।

৩. কোনো কোনো মাশাইখে আজম বলেছেন, প্রত্যেক নামায শেষে একটি মুহূর্ত আছে যখন সর্বাধিক উত্তম আমল করা যায়। এই উত্তম আমলটি হলো আমলের হিসাব নেওয়া। যদি পুরো দিনটি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কেটে যায়, তহালে প্রভুর দরবারে শুকরিয়া আদায় করবে। আর কখনও কোনো গুনাহের কাজ হয়ে থাকলে প্রভুর দরবারে তাওবাহ করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

৪. আমল ও চরিত্র অজড় বস্তুর ওপরও প্রভাব ফেলে। সুতরাং কেউ যদি এমন কোনো স্থানে নামায পড়ে যেখানে বে-আমল ও চরিত্রহীনতার পরশ লেগেছে, তাহলে ঐ উপাসনা থেকে উপকারের মাত্রা তেমনটি হবে না। এ কারণেই মসজিদুল হারামে এক রাকাআত নামাযের সওয়াব লক্ষ রাকাআতের সমান।

৫. শায়খ আবু তালিব মক্কী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “সতর্ক থেকো, তোমার অন্তরে যেনো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট না থাকে। যদি এ স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হও তাহলে তুমি মাক্বামে মাকসুদে পৌঁছুয়ে গেলে। এ স্তরে উপনিত হওয়ার পর তুমি যদি কোনো বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা, কাশফ-কারামত-ইলহাম ইত্যাদি অনুভব না-ও করো, তথাপি কোনো চিন্তার কারণ নেই।”

৬. ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকা সার্থক হয়েছে যার হৃদয় দুনিয়াবী ব্যাপারে ঠাণ্ডা কিন্তু আল্লাহর জিকির দ্বারা উষ্ণ। হৃদয়ে উষ্ণতা হেতু সেখানে দুনিয়াবী খাহিশাত প্রবেশ করতে অপারগ। তার স্তর এ পর্যায়ে পৌছুয়েছে যে, তার চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু হয় না।

৭. ইশার পরে যখন নিদ্রা তোমাকে আড়ষ্ট করে নেয় তখন সূরা ইখলাস তিনবার, সূরা ফালাক্ব তিনবার এবং সূরা নাস তিনবার তিলাওয়াত করে নাও। তোমার জন্য অপেক্ষারত কবরবাসী মুসলমানদের প্রতি তিলাওয়াতের সওয়াব রেসানী করো। এতে হয়তো আল্লাহ তা’আলা অনুগ্রহ করে তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অপরের প্রতি দয়াপরবশ হও, তোমার প্রতি রহমত নাজিল হবে।" এরপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করলেন:

হে প্রভু! এ গোলামকে ক্ষমা করো
ফলে তোমার সৃষ্টি নিরুদ্বেগ অনুভব করবে।

৮, ছাত্রাবস্থায় হযরত আবদুর রহমান জামি হযরত উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর বেলায়েতের সংবাদ পেয়ে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যান। তিনি দেখলেন সম্রাটের মতো তাঁর শিষ্য-ভক্ত-অনুরক্তদের সামনে তিনি উপবিস্থ আছেন। এতে জামির মনে ভাবনা আসলো, 'তিনি কিভাবে ওলি বা মা'রিফাত লাভের অধিকারী হতে পারেন? তিনি তো দুনিয়ার জাঁকজমক নিয়ে ব্যস্ত। ওলিরা তো নিঃস্ব থাকেন।'

হযরত জামির এরূপ ভাবনা ক্রমে বৃদ্ধি পেলো। অবশেষে ধৈর্যহারা হয়ে তিনি হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাকে সারাসরি উদ্দেশ্য করে আবৃত্তি করলেন:

"দুনিয়ার বন্ধু কখনও আল্লাহর, সত্যিকার ওলি হতে পারেন না।"

একথা বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন ও স্থানীয় মসজিদে যেয়ে বিশ্রাম নিলেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি নিদ্রামগ্ন হলেন। স্বপ্নে দেখলেন, কিয়ামত দিবস হাজির হয়ে গেছে। একব্যক্তি তাঁর কাছে আসলো। সে তর্ক জুড়ে দিলো। অভিযোগ করলো, 'তুমি যে আমার প্রতি প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা পূরণ করো!
মাওলানা জামি বললেন, "হে ভাই! আমার নিকট তো কিছু দেবার নেই।"
লোকটি বললো, "তাহলে তোমার ভালো আমলগুলো আমাকে দাও।"
মাওলানা জামি রাহিমাহুল্লাহ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এরপর দেখলেন খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহ ঘোড়ায় চড়ে তাঁর দিকে আসছেন। জামি রাহিমাহুল্লাহকে পেরেশান দেখে থামলেন। ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কী হচ্ছে?

দাবীদার লোকটি সব খুলে বললো। খাজা সাহেব বললেন, "এই লোকটি [জামি সাহেব] তো আমার মেহমান। তাঁকে কষ্ট দেবে না। যাকিছু তোমার প্রয়োজন, তা আমার বাইতুল মাল থেকে নিয়ে যাও!" লোকটি প্রস্থান করলো। হযরত জামির ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মাওলানা জামি বসে রইলেন। ইতোমধ্যে দেখলেন হযরত খাজা উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ ঘোড়ায় চড়ে মসজিদের নিকটে উপস্থিত হয়েছেন। তখন নামাযের সময় আসন্ন ছিলো। তাঁকে দেখে জামি সাহেব আরো ভয় পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন খাজা সাহেব সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি অবশ্যই আল্লাহর একজন বড়ো মাপের ওলি। মাওলানা জামি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে গেলেন খাজা সাহেবের নিকট। তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। বার বার ক্ষমা চাইলেন। খাজা সাহেব মৃদু হাসলেন। এরপর বললেন, "হে যুবক! তুমি স্বপ্ন ও ভাবনার উপর নির্ভর করবে না।" একথা শুনে জামি সাহেব আরো অভিভুত হলেন। ভাবলেন, "হয় এ স্বপ্নের জন্য তিনি সরাসরি দায়ী, না হয় তিনি কাশফের মাধ্যমে তা জেনেছেন।" ক্ষমা প্রার্থনার পর তিনি আবদার করলেন, "হযরত! অনুগ্রহ করে এ অধমকে খাদিম হিসেবে গ্রহণ করুন। আপনার পবিত্র হস্তে বাইআত করার অনুমতি দিন।"

হযরত আহরার রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "তুমি এসে যে দুটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলে তা আমাকে আবার শুনতে দাও!"

জামি ভীষণ লজ্জিত হয়ে বললেন, "হযরত! আমাকে ক্ষমা করুন। ওঠা ছিলো আমার অজ্ঞতার কারণ। আমি কীভাবে এ কথাগুলো পুনরায় আমার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি?"

খাজা সাহেব বললেন, "এতে কোনো বে-আদবি নেই। আমি তোমাকে আবৃত্তি করতে নির্দেশ দিচ্ছি! আর নির্দেশ হচ্ছে সম্মানপ্রদর্শন থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।"

অনোন্যপায় হয়ে হযরত জামি পুনরায় পংক্তি দুটো আবৃত্তি করলেন:

"দুনিয়ার বন্ধু কখনও আল্লাহর, সত্যিকার ওলি হতে পারেন না।"

খাজা উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ সাথে সাথে আবৃত্তি করলেন:

যদি তুমি কোনো বন্ধুকে রাখো, তাহলে তাকে তাঁর [আল্লাহর] ওয়াস্তে রাখো।

৯. সবাই প্রবেশ করে ভিন্ন দরোজা দিয়ে; আমি এ তরিকায় প্রবেশ করেছি খিদমাতের দরোজা দিয়ে।

১০. প্রেমিকদের ভালোবাসো ও তাঁদের অনুসরণ করো। তুমি তখন তাঁদেরই মতো হবে এবং তাঁদের প্রেম তোমার মধ্যে প্রতিফলিত হবে।

১১. তাসাওউফের দাবি হচ্ছে সকলের বোঝা কাঁধে তুলে নেওয়া এবং কারো বোঝায় পরিণত না হওয়া।

১২. তিনি বলতেন, আমার বয়স যখন মাত্র তিন বছর তখন আমার মধ্যে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করতাম। আমি যখন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতাম তখন আল্লাহর সাথেই নিজেকে উপাস্থিত দেখতাম। আমি ভাবতাম, জগতের সব মানুষের অবস্থাই বুঝি আমার মতো।

১৩. একদিন শীতকালে বৃষ্টি হচ্ছিলো। আমি বাইরে চলে যাই। এক পর্যায়ে আমার পা ও জুতো গভীর কাদার মধ্যে ধেবে যায়। আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না। এ মুহূর্তে যেনো আমার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে গেলো। আমি সাথে সাথে তাওবাহ করলাম ও জিকিরের মধ্যে নিমগ্ন হলাম। কাদা থেকে অনায়াসেই নিজেকে মুক্ত করে নিলাম।

১৪. আমি এক রাতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর সাথে ছিলেন বেশ বড়ো একদল লোক। তিনি একটি পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ানো ছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে উবাইদুল্লাহ! এই পাহাড়টি উঠিয়ে অপর পাহাড়ের ওপর রাখো!" আমি ভাবলাম, কেউ তো পাহাড় ওঠাতে পারে না- তবে তিনি তো আমাকে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। আমি পাহাড় তুলতে গেলাম। আশ্চর্য! আমি তা সহজেই তুলে নিলাম ও অপর পাহাড়ের উপর রাখলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি জানতাম তোমার মধ্যে এ ক্ষমতা আছে। আমি চাচ্ছিলাম লোকজন তা অবলোকন করুক।" এ স্বপ্ন দ্বারা এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা বড়ো একদল মানুষকে হিদাআত দান করবেন।

১৫. একদিন আমি সামারে অবস্থানরত হযরত কুতুবুদ্দিন সদর এর দরবারে যাই। সেখানে খুব বেশি জ্বরে আক্রান্ত চার ব্যক্তি পাই। আমি তাদের সেবায় লেগে গেলাম। তাদের বস্ত্রাদি

ধৌত করা ও খাবার মুখে তোলে দিতে অভ্যস্ত হলাম। এরপর আমি নিজেও একই জ্বরে আক্রন্ত হলাম। কিন্তু তখনও আমি তাদের খিদমাত করা থেকে বিরত হই নি। এদিকে আমার শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। অবশেষে ভাবলাম, হয়তো আমার মৃত্যু এসে যাবে। আমি একটি প্রতিজ্ঞা করলাম, 'আমাকে মরতে দিন হে আল্লাহ! কিন্তু এ চার জনকে শিফা দান করুন।' আমি তাদেরকে পারতপক্ষে খিদমাত করতে থাকি। পরদিন আমি জ্বর থেকে মুক্ত হলাম কিন্তু ঐ চারজন তখনও জ্বরে আক্রান্ত ছিলো।

১৬. কিছু কিছু শায়খুল মাশাইখ বলেন, 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' হচ্ছে সাধারণ মানুষের জিকির। 'আল্লাহ' হচ্ছে খাস মানুষের জিকির। 'হুয়া' হচ্ছে খাস থেকে আরো খাস মানুষের জিকির। আমার মতে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু' হচ্ছে খাস থেকে খাস মানুষের জিকির।

১৭. তাঁর একজন মুরিদ বলেন, 'একদিন আমরা হযরতের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, কলম ও কাগজ আনো। আমরা এনে দিলাম। তিনি কাগজে অনেক নাম লিখলেন। এরপর আরো একটি নাম অপর আরেক টুকরো কাগজে লিখলেন। এ নামটি ছিলো 'আবু সাঈদ'। তিনি এ কাগজের টুকরো নিজের পাগড়িতে রেখে বললেন, ''এ লোকটিকেই তাশকেন্দ, সমরকন্দ ও বুখারার সকল মানুষ অনুসরণ করবে।'' এর মাত্র এক মাস পর বাদশাহ আবু সাঈদ সমরকন্দ দখল করে নেন। আমরা কেউই ইতোমধ্যে বাদশাহ আবু সাঈদ কে ছিলো তা জানতামই না।'

১৮. বর্ণিত আছে, একদা বাদশাহ আবু সাঈদ একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, হযরত ইউসুফ হামাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা বিখ্যাত ইমাম আহমদ ইয়াসাবী রাহিমাহুল্লাহ তার সম্মুখে উপস্থিত আছেন। তিনি বললেন, 'তোমাকে আল্লাহ যাতে সাহায্য করেন সে জন্য উবাইদুল্লাহ আহরারকে ফাতিহা পাঠ করতে বলো।' আবু সাঈদ জিজ্ঞেস করলেন, 'এই শায়খ কে? আমি তাঁকে চিনি না।'' জবাব আসলো, 'এই দেখো, তিনিই হচ্ছেন তাশকেন্দের উবাইদুল্লাহ আহরার।' এসময় হযরত আহরারকে তিনি দেখতে পেলেন। স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হওয়ার পরও তিনি শায়খ উবাইদুল্লাহর চেহারা ভুলতে পারেন নি। তিনি তার পরামর্শকদের জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কী উবাইদুল্লাহ আহরার নামক কেউ আছেন? তারা বললেনা, আছেন। সুলতান সাথে সাথে তাশকেন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

হযরত উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ তখন তাশকেন্দের নিকটস্থ ফারক্কা নামক গ্রামে অবস্থান করছিলেন। সুলতান আবু সাঈদ এসেছেন জেনে তিনি এগিয়ে এসে তাকে স্বাগত জানালেন। আবু সাঈদ হযরতকে দেখেই চিনে ফেললেন। সাথে সাথে তার হৃদয়ে শায়খের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠলো। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি ছুটে গেলেন শায়খের কাছে। তাঁর হাতে চুমু খেয়ে আবদার করলেন, আমার জন্য ফাতিহা পাঠ করুন। শায়খ উবাইদুল্লাহ বললেন, "হে আমার পুত্র! আমরা যখন কোনো কিছুর প্রয়োজন বোধ করি তখন ফাতিহা একবার মাত্র পাঠ করি। আর তুমি যেভাবে স্বপ্নে দেখেছো, আমরা এ ফাতিহা পাঠ ইতোমধ্যে শেষ করে নিয়েছি। সুলতান একথা শুনে অবাক হলেন। তিনি কীভাবে তার স্বপ্নের কথা জানলেন? তিনি শায়খকে বললেন, আমি সমরকন্দে আক্রমণ করবো, এ ব্যাপারে আপনার অনুমতি ও দু'আ চাচ্ছি। তিনি বললেন, "তোমার ইচ্ছে যদি হয়ে থাকে, শরিয়তকে সমর্থন করা তাহলে আমি তোমার সাথী।" সুলতান বললেন, আমার ইচ্ছে এটাই হযরত। শায়খ বললেন, 'যখন তুমি শত্রুদের আসতে দেখবে তখন সাথে সাথে তাদেরকে আক্রমণ করবে না। ধৈর্য ধারণ করবে। তোমার পেছন দিক থেকে একঝাঁক কাক উড়ে আসবে। সাথে সাথে তুমি আক্রমণ চলাবে।'

যাক সুলতান সমরকন্দ আক্রমণ কালে আবদুল্লাহ মির্জার বিরাট সৈন্যদল আগেই আক্রমণ করে। শায়খের নির্দেশ মুতাবিক সুলতান পাল্টা আক্রমণ করলেন না যতোক্ষণ তা কাকগুলো পেছন দিক থেকে উড়ে আসে নি। ককাগুলো দেখেই তিনি আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। ঐদিকে আবদুল্লাহ মির্জার অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়ার পা কাদা মাটির মধ্যে ধেবে যায়। আবদুল্লাহকে আবু সাঈদ বন্দী করেন। সমরকন্দ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করে নেন।

আবু সাঈদ হযরত উবাইদুল্লাহকে তাসকেন্দে যেয়ে বসবাসের আবদার করলেন। তিনি তা গ্রহণ করে ভক্ত-মুরিদানসহ তাসকেন্দে চলে আসেন। তিনি সুলতান আবু সাঈদের প্রধান উপদেষ্টা হলেন।

কিছুদিন পর খবর আসলো আবদুল্লাহ মির্জার ভাতিজা মির্জা বাবর ১ লক্ষাধিক সৈন্যসহ নিজ চাচার হারানো রাজ্য পুনর্দখল করতে খুরাশানের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সুলতান আবু সাঈদ এ সংবাদ শুনে বিচলিত হলেন। তার সৈন্যসংখ্যা অনেক কম ছিলো। তিনি হযরত উবাইদুল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে পরামর্শ চাইলেন। হযরত বললেন, "চিন্তা করো না আবু সাঈদ।" এরপর নিজের সিপাহসালার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁকে পরামর্শ দিলো, তাসকেন্দের দিকে সরে যেতে হবে। একথা শুনে শায়খ আহরার রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'কী হলো আবু সাঈদ? আমার কথায় তুমি কান দেওনি বুঝি? ইনশাআল্লাহ! বাবরের লক্ষ সৈন্যের জন্য আমি একাই যথেষ্ট!"

পরের দিনই সংবাদ আসলো মির্জা বাবরের সৈন্যেদের মধ্যে মহামারী শুরু হয়েছে। হাজার হাজার সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হলো। সুলতান বাবর আবু সাঈদের সঙ্গে শক্তিচুক্তি করতে বাধ্য হলেন। এরপর তিনি নৈস্যসামন্ত নিয়ে সমরকন্দ থেকে চলে গেলেন।

হযরত খাজা আলাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

ইশার নামায শেষে ৮৯৫ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল [মতান্তরে ২৯ রবিউল আউয়াল] হযরত আলাউদ্দিন আহরার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ধরাধাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। সমরকন্দের কামান কাশানে তাঁর ইন্তিকাল হয়। হযরতের সমাধি এখানেই অবস্থিত। তিনি অনেক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। এর মধ্যে 'আনাসুস সালিকীন ফিত্তাসাওউফ' এবং 'উরওয়াতুল উছক্কা লি আরবা' ইত্তিহাদ' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি একটি বড়ো মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা আজো কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুকালে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইয়াহইয়া এবং উপস্থিত আরো অনেকে লক্ষ্য করলেন, হযরতের চোখদ্বয় থেকে উজ্জ্বল আলো নির্গত হচ্ছে। এ নূরের ঔজ্জ্বল্যতায় মোববাতির আলো ক্ষীণ হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুতে তখনকার সুলতান আহমদসহ সমরকন্দের সবাই ভীষণভাবে শোকাহত হন। সুলতান সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ছুটে আসেন হযরতের হুজরায়।

তাঁর তত্ত্বাবধানে অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণে হযরতের জানাযার নামায সম্পন্ন হয়। সুলতান নিজেই হযরতের মরদেহ কবরে রাখেন।

হযরত শায়খ উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহর তরিকতের প্রধান খলিফা ছিলেন হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ জাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। নকশবন্দিয়া মুজাদ্দীদিয়া তরিকা মুতাবিক তিনিই হচ্ছেন সিলসিলার পরবর্তী শায়খ। আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওফিত ইনায়েত করুন।

হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ জাহিদ ওয়াখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৯২৬ হিজরি, সমাধি- সমরকন্দ, উজবেকিস্তান।

হযরত খাজা মুহাম্মদ জাহিদ ওয়াখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলিফা। তাজিকিস্তানের রাজধানী দাসুম্বি থেকে ১০০ কিমি দক্ষিণে ওয়াকস্ বা ওয়াকাস্ নামক একটি ছোট্ট শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত নকশবন্দি শায়খ মাওলানা ইয়াকুব চারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকটাত্মীয় ছিলেন। নিজেই বলেন, আমি হযরত চারখী রাহিমাহুল্লাহর মেয়ের পুত্র।

হযরত জাহিদ নকশবন্দি তরিকায় সর্বপ্রথম সবক গ্রহণ করেন খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট। দীর্ঘদিন রিয়াজত-মুজাহাদা ও জিকির-শুগল করে উচ্চতর মাক্বামে অধিষ্ঠিত হন। পরে হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করে ইলমে তাসাওউফের উচ্চ স্তরে উপনিত হন। অল্প কিছুদিন পরই শায়খের কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন।

হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহর অনেক মুরিদ বছরের পর বছর তাঁর খিদমাতে উপস্থিত ছিলেন। মুহাম্মদ জাহিদ রাহিমাহুল্লাহর মতো এতো তাড়াতাড়ি কেউ খিলাফত লাভ করেন নি। সুতরাং পুরাতন মুরিদদের মধ্যে কিছুটা অস্বস্থি প্রকাশ পেলো। বলাবলি শুরু হলো, ‘আমরা এতো কাল যাবৎ হযরতের খিদমাতে থেকে খিলাফত লাভে ব্যর্থ। আর জাহিদ সাহেব মাত্র কদিন পরই খিলাফত পেয়ে গেলেন?’ কথাটি যখন শায়খ উবাইদুল্লাহর কানে পৌঁছুলো, তিনি মুরিদানকে একত্রিত হতে বললেন। সবার সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, “আমি তোমাদের কথাগুলো শুনেছি। ব্যাপার হচ্ছে, মুহাম্মদ জাহিদ ইতোমধ্যে খাজা ইউসুফ সাহেবের সুহবতে থেকে বেশ কিছু মাক্বাম অতিক্রম করে নিয়েছিলেন। তিনি আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, বাতি ও সলতাসহ। আমি শুধুমাত্র বাতির মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি- এই যা।”

নিজের কথায় সুলুকের বর্ণনা

হযরত শায়খ মুহাম্মদ জাহিদ ওয়াখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পীর সাহেব শায়খ উবাইদুল্লাহ আহরার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্মানে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের নাম হলো 'সিলসিলাতুল 'আরিফীন ওয়া তাযকিরাতুস সিদ্দিকীন'। তিনি এতে সুলুকের বিভন্ন বিষয়ের ওপর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোনো বন্দাকে নিজের প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করে নিতে সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি সেই বান্দাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন। হযরত জাহিদ ওয়াখসী রাহিমাহুল্লাহকে চার তরিকার প্রসিদ্ধ একটি নকশবন্দিয়ার স্বর্ণালী সিলসিলার একজন শায়খ হিসাবে মহাপ্রভু নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। রোজ কিয়ামত পর্যন্ত সিলসিলার সকল শায়খের মতো মানুষ তাঁকেও স্মরণ করে যাবে। তবে এ রাস্তায় যুক্ত হওয়ার কাহিনী খুব চিত্তাকর্ষক। পাঠকদের আত্মিক খোরাক যোগাতে আমরা নিচে হযরতের নিজস্ব ভাষায় উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত এই কাহিনীটি তুলে ধরছি।

তিনি লিখেছেন, আমি আমার পীর সাহেবের খিদমতে ৮৮৩ থেকে ৮৯৫ হিজরিতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ১২ বছর ছিলাম। তাঁর সঙ্গে নিসবত ও বাইআতের কারণ হলো এই: একদিন শায়খ নিয়ামতুল্লাহ নামক একজন সাথীকে নিয়ে সমরকন্দ থেকে হিরাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমাদের ইচ্ছা ছিলো সেখানকার মাদরাসায় যেয়ে শিক্ষাগ্রহণ করা। তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। ভ্রমণের ক্লান্তি থেকে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শাদিমান নামক একটি গ্রামে পৌঁছুয়ে কয়েক দিনের জন্য যাত্রাবিরতি করি।

একদিন শুনলাম হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহ ঐ গ্রামে আগমন করেছেন। আসরের সময় স্থানীয় মসজিদে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে যাই। তিনি আমার দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কোত্থেকে এসেছো?" জবাব দিলাম, "সমরকন্দ থেকে"। তাঁর কতাবার্তায় এক অপূর্ব গাম্ভীর্য ও মাধুর্য প্রকাশ পেলো। আশ্চর্যের বিষয় যে, কথায় কথায় তিনি আমার অন্তরে লুকায়িত অনেক কিছু প্রকাশ করে দিলেন। এরপর বললেন, "তুমি হিরাতে যাচ্ছো, শিক্ষাগ্রহণ করতে- তাই না?" এসব কথা শুনে আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি। তিনি আবার বললেন, "তুমি যদি জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভে আকাঙ্ক্ষী

হয়ে থাকো তাহলে সুদূর হিরাতে ভ্রমণের কোনো প্রয়োজন নেই, এখানেই সব পাবে।” এরপর তিনি অন্য একটি কক্ষে চলে গেলেন। ঠিক একটি গ্রন্থের পৃষ্ঠায় যেরূপ সবকিছু লিপিবদ্ধ থাকে ঠিক তদ্রূপ মানুষের হৃদয়েও অনেক কথা, অনেক জল্পনা-কল্পনা উপস্থিত থাকে। আমার অন্তর তাঁর এ কথাটি শ্রবণ করেও হিরাতে যেতে তাগিদ দিতে লাগলো।

তাঁর একজন মুরিদ আমার ইচ্ছা সম্পর্কে কিছুটা অখুশী ছিলেন। তিনি বললেন, “শায়খ এখন ব্যস্ত আছেন লেখা নিয়ে। তুমি এখন চলে যেতে পারো।” আমি কিন্তু প্রস্থান করলাম না। শায়খ বের হয়ে পুনরায় আমাদের নিকট আসলেন। তিনি আমাকে বললেন, “এখন তুমি আমাকে বাস্তব কথাটি বলো, কেনো হিরাতে যাবে? তুমি কী আধ্যাত্মিক রাস্তার খুঁজে যাবে? না ওখানে যেতে চাচ্ছো বাহ্যিক জ্ঞান অর্জন করতে?” আমার সাথী নিয়ামতুল্লাহ আমার পক্ষ থেকে জবাব দিলেন, “সে বাস্তবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধানে আছে, তবে বাহ্যিক জ্ঞানকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।” তিনি বললেন, “ওহ! তাই যদি হয় তাহলে ভালো কথা।”

এরপর হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহ আমাকে নিয়ে একটি নির্জন বাগানে গেলেন। আমরা লোকালয় থেকে দূরে চলে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি সাথে সাথে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম [ফানার অবস্থা]। দীর্ঘক্ষণ পরে আমার হুঁশ ফিরে আসলো। আমি বুঝতে পারলাম, হযরত আমাকে তাঁর শায়খের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিচ্ছেন। এরপর সিলসিলা মুতাবিক সকল শাইখুল মাশাইখ ও স্বয়ং রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এ নিসবত চলতে থাকে।

এরপর শায়খ আমাকে বললেন, “এবার তুমি আমার লেখাগুলো পাঠ করে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে।” তিনি সব কাগজ ভাঁজ করে আমার হাতে তুলে দিলেন। এরপর বললেন, “এখানে লিপিবদ্ধ আছে আনুগত্য, পরহেজগারী ও বিনয়ের সাথে উপাসনা পদ্ধতির হাক্বিক্বাত। তুমি যদি সঠিকভাবে কাগজগুলোর লেখা অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহর মুশাহাদার স্তরে উন্নীত হবে।”

তিনি এতে লিখেছেন: এই রাস্তা হচ্ছে আল্লাহপ্রেমের পথ। এর মূলে আছে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ। যা সম্ভব সুন্নাতের জ্ঞানার্জনের ওপর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদেরকে আমার ও আমার খলিফাদের রাস্তা অনুসরণ করতে হবে।” এ উদ্দেশ্য হাসিলে তোমাদেরকে হক্বপন্থী আলিমে দ্বীন ও আধ্যাত্মিক রাস্তায় জ্ঞানবান মাশাইখে আজমের সুহবত লাভ করতে হবে। যারা হচ্ছেন আভ্যন্তরীণ অদৃশ্য জ্ঞান ও পবিত্র ইসমে সিফাতের জ্ঞানে জ্ঞানবান। তাঁরাই হচ্ছেন পবিত্র সত্তার মুশাহাদার প্রেমে ডুবন্ত। তাঁদের সুহবত তোমাকে আল্লাহর মা'রিফাত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাতের সঠিক অনুসরণের জ্ঞান দান করবে।

তোমাকে অবশ্যই দুনিয়াদার দুর্নীতিবাজ আলিমদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তাঁরা ব্যস্ত নিজেদের সামাজিক অবস্থান ও ধন-মাল অর্জনের মাঝে। নৃত্যরত সুফিদের থেকেও দূরে থাকো। এরা হচ্ছে শিশুদের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন। যারা না বুঝে, হালাল-হারাম সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে, অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে তারা দূরে সরে আছে, তাদের প্রতি কর্ণপাত করো না।

দার্শনিক ও যুক্তিবাদীদের তর্কের প্রতি খিয়াল দেবে না। এরা তাসাওউফকে নাম ছাড়া, এ সম্পর্কে আর কিছুই বুঝে না। তারা ভাবে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আধ্যাত্মিকতা বুঝে ফেলবে! আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে একটি রাস্তার ভ্রমণ। এ ভ্রমণে নিজে না চলে কীভাবে পথের দিক-নির্দেশনা ও হাক্বিক্বাত বুঝা যেতে পারে? তারা ভ্রমণকারী না হয়েও ভ্রমণকারীর ভান করে, সুফি না হয়েও সুফির ভান করে।

এরপর হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সাথীদের নিকট ফিরে গেলেন। আমার উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠ করলেন ও বললেন, “যাও! হিরাতে চলে যাও।” আমি তাঁর সুহবত থেকে বিদায় নিয়ে বুখারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একজন বার্তাবাহক আসলেন। তাঁকে পাঠিয়েছেন হযরত উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ। বার্তাবাহক আমার হাতে একখানা চিঠি দিলো। এটি হযরত মাওলানা সাদউদ্দীন কাশগরী রাহিমাহুল্লাহর পুত্র শায়খ কাল্লামের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। এর

মধ্যে লিখিত ছিলো, “তুমি আমার পুত্রের দেখাশুনা করবে। সে এই চিঠিখানা তোমাকে দেবে। তাকে কোনো দুষ্ট আলিমের সঙ্গে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।” তাঁর পক্ষ থেকে এ অনুগ্রহ হেতু আমি তাঁর প্রতি আরো ভালোবাসা অনুভব করলাম। কিন্তু এরপরও আমি হযরতের সুহবতে ফিরে না যেয়ে হিরাতের পথেই যাত্রা অব্যাহত রাখি।

বুখারা পৌঁছাতেই বেশ সময় কেটে গেলো। আমার গাধাটি দুর্বল হয়ে যায়। প্রতি এক দু মাইল পরপর থামতে হয়েছে। এরপর গাধা বদলানোর প্রয়োজন পড়েছে। বুখারায় পৌঁছার পূর্বে সর্বমোট ৬টি গাধা পরিবর্তন করতে হলো। বুখারায় উপস্থিত হওয়ার পর আমার চোখে ঝাপসা পড়ে এবং বেশ কয়েকদিন আমি দৃষ্টি হারিয়ে ফেলি। কয়েকদিন বিশ্রামের পর সুস্থ হয়ে দৃষ্টি ফিরে পাই। এরপর হিরাতের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নিই। কিন্তু হঠাৎ আমার ভীষণ জ্বর হলো। ভ্রমণে যেতে অপারগ হলাম। ভাবলাম, এখন যদি ভ্রমণে যাই তাহলে বেঁচে থাকবো কী না সন্দেহ আছে। সুতরাং বুখারায় থেকে সুস্থ হওয়ার পর ফিরে যাবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে নিজের বাড়িতে নয়- চলে যাবো হযরত শায়খ উবাইদুল্লাহ আহরার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে।

ফেরার পথে তাসকেন্দে এসে হযরত শায়খ ইলিয়াস আশাকী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত করি। আমার কিতাব, অতিরিক্ত কাপড় ও জন্তু একজন রক্ষীর নিকট রেখে আসি। পথিমধ্যে শায়খ উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর এক মুরীদের সাক্ষাৎ পাই। আমি বললাম, ‘এসো শায়খ আশাকীকে দেখে আসি।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার জন্তুটি কোথায়? আমার বাড়িতে নিয়ে আসো। এরপর আমরা যাবো।’ আশ্চর্যের বিষয়, আমি যখন গাধাটি নিয়ে আসতে যাত্রা করবো, তখন এক গায়েবী আওয়াজ আমার কানে বেজে ওঠলো, “তোমার জন্তুটি মরে গেছে! তার ওপর যে বোঝা ছিলো তা-ও হারিয়ে গেছে।” আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করবো। আমি যেনো অনুভব করলাম, শায়খ উবাইদুল্লাহ চাচ্ছেন না, শায়খ আশাকীর সঙ্গে সাক্ষাতের। ভাবলাম, “হে জাহিদ! তুমি লক্ষ করো না? কীভাবে তোমার শায়খ তোমার আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। এখন তুমি অপর আরেক শায়খের কাছে যেত চাচ্ছো?”

আমি আর থেমে থাকতে পারলাম না, সোজা হযরত শায়খ উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে যেতে প্রস্তুত হলাম। এই নিয়ত করার পরই দেখলাম, এক ব্যক্তি ছুটে আসছে আমার দিকে। বললো, "ইয়া শায়খ! আপনার গাধা মালসহ পাওয়া গেছে।" মাল ও জন্তু রক্ষীর নিকট ফিরে যাওয়ার পর সে জানালো, "আমি গাধাটিকে এখানে বেঁধে রেখেছিলাম। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি সে গায়েব হয়ে গেছে! আমি আশ্চর্য হলাম। আমি সব জায়গায় অনুসন্ধান করলাম। কোথাও তার পাত্তা পেলাম না। মনে হলো মাটি তাকে গ্রাস করে নিয়েছে! এরপর আমি ফিরে এসে দেখি, ঠিক যেখানে ছিলো সেখানেই গাধাটি সকল মালসহ বসে আছে!" রক্ষীর কথা শুনে আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট ওলি, যুগের শাইখুল মাশাইখ হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে যাওয়ার জন্যই ইচ্ছা পোষণ করছেন। কালবিলম্ব না করে আমি জন্তু ও মালামাল নিয়ে সমরকন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর শায়খের নূরানী চেহারা পানে তাকিয়ে সালাম জানালাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, "আহলান সাহলান! হে আমার প্রিয় পুত্র!" সেদিন থেকে হযরতের ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁর সুহবত থেকে আর বঞ্চিত হই নি।

তিনি লিখেন, সুহবতে থাকাকালে আমার শায়খ সময় সময় আধ্যাত্মিকতা ও রহস্যাবৃত সুলুকের জ্ঞানের ওপর আমার সাথে আলাপ করতেন। তিনি সর্বদাই নিজের বক্তব্য আমার প্রতি নির্দিষ্ট করে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতেন, "আমি যখন তোমার সাথে ঐশি বাস্তবতা নিয়ে কথা বলি, তখন কী তুমি ঈমান-আমল সম্পর্কিত কোনো সংঘাত এতে আছে বলে মনে করো? আমি বলতাম, 'না, আমার শায়খ। আমি তো কোনো সংঘাত দেখতে পাই না।' এরপর তিনি বলতেন, "তাহলে তোমার সাথে কথা বলা যায়।"

একদিন আমার শায়খ অসুস্থ হলেন। আমাকে নির্দেশ দিলেন, হিরাতে যেয়ে কোনো ডাক্তার নিয়ে আসতে। মাওলানা ক্বাসিম সাহেব বললেন, "হে মুহাম্মদ! তুমি যতো তাড়াতাড়ি পারো যাও এবং ফিরে আসো। শায়খকে দীর্ঘক্ষণ অসুস্থ আছেন দেখে আমি সহ্য করতে পারছি না।" আমি তাড়াতাড়ি হিরাতে যেয়ে ডাক্তারকে নিয়ে ফিরে আসলাম। এসে দেখি আমার শায়খ সুস্থ হয়ে ওঠেছেন, কিন্তু মাওলানা ক্বাসিম মারা গেছেন! এ ভ্রমণে মোট ৩৫ দিন লেগেছিল। আমি শায়খকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কীভাবে মাওলানা

ক্বাসিম মারা গেলেন, তাঁর বয়স তো বেশি ছিলো না?” তিনি বললেন, “তুমি প্রস্থান করার পর মাওলানা ক্বাসিম আমার কাছে এসে বললেন, আমি আমার হায়াতকে আপনার তরে বিলিয়ে দিলাম। আমি বললাম, হে আমার পুত্র! এটা করো না। তোমাকে অসংখ্য মানুষ ভালোবাসে। সে বললো, ইয়া শাইখী! আমি এখানে আসি নি আপনার সাথে পরামর্শ করতে। আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আল্লাহ তাআলা তা আমার পক্ষ থেকে গ্রহণও করে নিয়েছেন।” শায়খ আরো বলেন, “আমি যা-ই বলি না কেনো, তাকে কিছুতেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সম্মত করতে পারি নি। আল্লাহর হুকুমে পরদিনই সে আমার যে রোগ ছিলো সে রোগেই আক্রান্ত হলো। এদিকে আমি সুস্থ হয়ে ওঠলাম। মাওলানা ক্বাসিম রবিউল আউয়াল মাসের ৬ তারিখ মারা গেছেন।”

শায়খ মুহাম্মদ জাহিদ রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

কুল্লু নাফসিন যা-ইক্বাতিল মাউত - প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর অতি প্রিয়জনকেও একদিন এ মায়াবী পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। সবার কবরই, তা জল কিংবা স্থলে হোক প্রস্তুত আছে। শুধু সময়মতো স্থানটিকে খোঁড়ে দেওয়া হয়- এই যা। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলেই বুঝা যায় এ জীবনটা বাস্তবিকই অতি স্বল্পকালীন। বুঝাই যায় না, কীভাবে এতো তাড়াতাড়ি ষাট-সত্তুর-নব্বই বছরের জিন্দেগী শেষ হয়ে গেলো! শায়খ খাজা মুহাম্মদ জাহিদ ওয়াখশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও একদিন তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরিদান ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন তাঁর প্রেমাস্পদের নিকট। দিনটি ছিলো ১২ই রবিউল আউয়াল, ৯২৬ হিজরি। তিনি সমরকন্দে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা তাঁর গোপন সহস্যগুলোকে সংরক্ষণ করুন। তিনি উজবেকিস্তানের সমরকন্দেই সমাহিত আছেন।

হযরতের খুলাফার মধ্যে প্রধান ছিলেন তাঁরই ভাতিজা হযরত খাজা শায়খ দরবেশ মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। নকশবন্দিয়া সিলসিলানুযায়ী তিনিই হচ্ছেন পরবর্তী শাইখুল মাশাইখ। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর বর্ণনা তুলে ধরবো। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ।

হযরত খাজা শায়খ দরবেশ মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ৯৭০ হিজরি, সমাধি- শাহরিসাব্‌জ্‌, উজবেকিস্তান।

তিনি ছিলেন গউস পর্যায়ের সুফি দরবেশ। তাঁকে দরবেশ ওলি হিসেবে মানুষ সম্বোধন করতো। নকশবন্দি তরিকার এই শায়খের লক্ষাধিক মুরিদান ছিলেন। নিজের মামা হযরত খাজা মুহাম্মদ জাহিদ ওয়াখশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুর্শিদ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই তিনি তারিকতের খিলাফত লাভ করেন।

হযরত খাজা দরবেশ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয় ৮৪৬ হিজরি সনে বর্তমান উজবেকিস্তানের সমরকন্দে। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ এলাকায়ই সমাপ্ত করেন। এরপর ইলমে তাসাওউফের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দিন দিন বাড়তে থাকে। সবকিছু বিসর্জন দিয়ে রিয়াজত-মুজাহাদার মধ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

মামার সুহবতে

দরবেশ রাহিমাহুল্লাহর মামা তখন নকশবন্দিয়া তরিকার যুগের শায়খুল মাশাইখ। দরবেশ সাহেব মুরিদ হওয়ার পূর্বেই দীর্ঘদিন রিয়াজতের মধ্যে কাটিয়ে দেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি স্বীয় মামার হাতে মুরিদ হওয়ার পূর্বে পনেরো বছর একনাগাড়ে নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এ সময় তিনি জীবনরক্ষার্থে যেটুকু অত্যল্প খাবারের প্রয়োজন তার বেশি খেতেন না। একটি বা দুটো মাত্র বস্ত্র পরিধান করতেন। সত্যিকার অর্থে দরবেশের মতোই জীবন-যাপন করেছেন। আর এ কারণেই তাঁকে দরবেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়। শহর ও জনপদ থেকে দূরে মরুভূমি ও বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। নিজিকে ডুবিয়ে রাখতেন সর্বদা জিকরুল্লাহর সাগরে।

একদিন প্রচণ্ড ক্ষুধায় অসহ্য হয়ে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হযরত খিজির আলাইহিসসালাম তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। বললেন, “হে দরবেশ! ধৈর্য ও তুষ্টির

প্রয়োজন। খাজা মুহাম্মদ জাহিদের নিকট চলে যাও। তিনি তোমাকে ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টির পথ বলে দেবেন।”

এ নির্দেশ পেয়ে তিনি নির্জনতা ত্যাগ করে চলে আসলেন স্বীয় মামা হযরত মুহাম্মদ জহিদ ওয়াখশী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে। মুরিদ হতে সবিনয় আবদার জানালেন। হযরত খিজির আলাইহিসসালামের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটিও বললেন। ওয়াখশী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এই বিশিষ্ট ভাগিনাকে মুরিদ করে তরিকতের রাস্তায় পাড়ি জমানোর সবক দিতে লাগলেন। অচিরেই দরবেশ রাহিমাহুল্লাহ উচ্চতর মাক্বামে অধিষ্ঠিত হলেন।

স্বীয় পীরের নির্দেশ পালনের নমুনা

একদা হযরত ওয়াখশী রাহিমাহুল্লাহ দরবেশ সাহেবকে ডেকে বললেন, “হে দরবেশ! শহরের বাইরের ঐ উঁচু পাহাড়ে আরোহণ করে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। যাও! চলে যাও।” এ নির্দেশ পেয়ে দরবেশ সাহেব চলে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর স্বীয় পীরের আগমনের জন্য অধীর অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সারাদিন পার হয়ে গেলো, যোহর, আসর ও মাগরিব পরেও শায়খ আসলেন না। মনের মধ্যে ওয়াসওয়াসা শুরু হলো। তিনি আসতে ভুলে গেলেন নাকি? হয়তো আসবেন না, ইত্যাদি ভাবনা জাগ্রত হলো তাঁর অস্থির মনে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের নফসকে বললেন, খামোশ! আমার শায়খ বলেছেন আসবেন- আসবেনই। সুতরাং তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। রাত গভীর হয়ে গেলো- তবুও আসলেন না।

শীতকাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। দরবেশ সাহেব শীতে কাঁপতে লাগলেন। পেটে ভীষণ ক্ষিধে। এক জায়গায় বসে পড়ে সজোরে ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ জিকির পড়তে লাগলেন। জিকিরে উষ্ণতা হেতু কিছুটা স্বস্থি বোধ করলেন। ভোর হয়ে গেলো। ফযরের নামায শেষে শায়খের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু তিনি আসলেন না। এভাবে দ্বিতীয়দিনও পার হয়ে গেলো। হযরত দরবেশের অপেক্ষার শেষ হয় না। তিনি নামাযের সময় নামায পড়েন আর জিকির করে বাকি সময় কাটান। নিকটতম একটি বৃক্ষের ফল খেয়ে জীবন রক্ষা করতে

থাকেন। এভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে গেলো। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয় শায়খ ওয়াখশী তাঁকে ভুলেন নি। তিনি অবশ্যই আসবেন।

দীর্ঘ এক মাস চলে গেলো। দরবেশ সাহেব কিন্তু অনড়। গাছের ফল খেয়ে আর জিকির করে দিনাতিপাত করেন। এক পর্যায়ে লক্ষ করলেন, জঙ্গলের জীব-জন্তু এসে তাঁর চতুর্দিকে বসে জিকিরে শরীক হয়ে গেছে। তিনি ভাবলেন, জন্তুদের জিকিরে শরীক হওয়া নিশ্চয়ই তাঁর মুর্শিদের একটি কারামত। আরো বেশ কিছুদিন চলে গেলো। শীতের প্রকোপ বেড়ে গেলো। বরফ পড়া শুরু হলো। গাছের ফল শেষ হয়ে গেছে। তিনি সবুজ ঘাস বা গাছের পাতা-লতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে থাকেন। তাঁর শায়খ আসবেন, এ বিশ্বাস থেকে তখনও একবিন্দুও সরে যান নি দরবেশ সাহেব।

এাকদিন জঙ্গল থেকে একটি হরিণী আসলো। তিনি হরিণীর স্তনে দুধ দেখে তা দহন করলেন। দহনের সময় হরিণী কোনো নড়াচড়াই করলো না। এরপর আরেকটি এলো। দরবেশের অন্তর আল্লাহর মুহাব্বাতে আরো বেশি আপ্লুত হলো। খোদায়ী প্রেমের ছোঁয়ায় তাঁর অন্তরাত্মায় রোমাঞ্চকর শিহরণ জেগে ওঠলো। তিনি মা'রিফাতের উচ্চ মাক্বামের দিকে অগ্রসর হলেন। যেসব কারমত প্রকাশ পাচ্ছিলো তা যে সবই দরবেশ সাহেবর পীর হযরত ওয়াখশী রাহিমাহুল্লাহর ওয়াসিলায় হচ্ছিলো, তা তিনি অনুধাবন করলেন। তিনি কাশফের মাধ্যমে স্বীয় পীর সাহেবের সঙ্গে আলাপ করলেন। বললেন, "ইয়া শাইখী! আমি যদি আপনার জন্য এখানে অপেক্ষারত থাকতাম না, তাহলে কী আমি সবকিছু থেকে বঞ্চিত হতাম?" শায়খ ওয়াখশী রাহিমাহুল্লাহর মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠলো। ধ্যান ভাঙ্গার পর দরবেশ সাহেব বুঝতে পারলেন, শায়খ ওয়াখশী তাঁর নিকট আসার জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। শীঘ্রই তিনি এসে যাবেন। ঠিক তা-ই হলো।

হযরত দরবেশ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর পীর হযরত শায়খ মুহাম্মদ জাহিদ ওয়াখশী রাহিমাহুল্লাহ টিলায় তাশরীফ এনে হাসিমুখে বললেন, "হে আমার প্রিয় পুত্র দরবেশ! এসো আমার সঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কবুল করেছেন। তোমাকেই নকশবন্দি তরিকার

পরবর্তী শায়খ হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।" এরপর দরবেশ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহকে খিলাফতের খিরক্বা প্রদান করলেন।

হযরত দরবেশ রাহিমাহুল্লাহকে তাঁর পীর সাহেব নিজেই বললেন, "এখন থেকে তুমি মানুষকে মুরিদ করবে। কারণ, আমার মিশনের ইতি ঘটবে অতি শীঘ্রই।" দরবেশ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পীর সাহেবের সুহবতেই ছিলেন।

হযরত দরবেশ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যু

যুগের শাইখুল মাশাইখ, মজযূব ইলাল্লাহ, অসংখ্য মুরিদের পীর সাহেব, ইলমে মারিফাতের সুপেয় ফোয়ারা হযরত খাজা শায়খ দরবেশ মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৯৭০ হিজরি সনের মুহাররম মাসের ১৯ তারিখ এ মায়াবী পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করনে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহস্যাবলীকে গোপন রাখুন। তিনি উজবেকিস্তানের শাহরিসাব্জ নামক স্থানে সমাহিত আছেন।

হযরতের বেশ কয়েকজন খলিফা ছিলেন। নিচে ৫ জনের নাম লিপিবদ্ধ করা হলো।
১. তাঁর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা শায়খ খাজিগী আমকাঞ্জি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
২. খাজা মিরাজ গুনবাজ-সাবজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৩. খাজা মুহাম্মদ রাজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৪. মাওলানা শের মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫. শায়খ সালাওয়াতী রাহামতুল্লাহি আলাইহি।

তরিকতে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদীয়া অনুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন মাওলানা শায়খ খাজিগী আমকাঞ্জি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এখন আমরা তাই আশা করছি এ মহান ওলির জীবন ও সাধনার ওপর যেটুকু সম্ভব বর্ণনা তুলে ধরতে। হে আল্লাহ আমাদের আশাটুকু পূর্ণ ও কবুল করুন।

হযরত মাওলানা শায়খ খাজিগী আমকাঞ্জি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

ওফাৎ ১০০৮ হিজরি, সমাধি- আমকানা, উজবেকিস্তান।

হযরত খাজা দরবেশ মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলিফা ছিলেন নকশবন্দি তরিকার স্বর্ণালী সিলসিলার শায়খ হযরত খাজা খাজিগী আমকাঙ্খী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। স্বীয় পীর খাজা দরবেশ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তাঁর পিতা।

জন্ম

হিজরি ৯১৮ সনে হযরত মুহাম্মদ আমকাঞ্জি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উজবেকিস্তানের সমরকন্দের অদূরে আমকানা নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি স্বীয় পিতা হযরত দরবেশ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর হাতেই সম্পাদিত হয়। পরিণত বয়সে তিনি তাঁরই নিকট বাইআত গ্রহণ করে তরিকতের সাধনায় লিপ্ত হন।

নিজেকে গোপন রাখা

শায়খ আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় পিতা ও মুর্শিদের সার্বক্ষণিক খিমদতে থাকার সুযোগ পেয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইলমে মা'রিফাতের উচ্চতর মক্বামে অধিষ্ঠিত হন। এ অবস্থায় তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ছিলেন। অধি**কাং**শ মানুষ তাঁর গোপন রগস্য সম্পর্কে অবগত ছিলো না। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। মাশাইখে আজম বলেন, তরিকতের সালিককে সর্বদাই নিজের হালকে প্রকাশ হওয়া থেকে সংরক্ষণ করা চাই। এতে অন্তরে রিয়ার আবির্ভাব থেকে মুক্ত থাকতে সহায়ক হয়। আর রিয়া হচ্ছে এ রাস্তায় চলার সবচেয়ে বড়ো এবং মারাত্মক বাঁধা। হযরত আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহ নিজেকে গোপন রাখার ফলে খুব দ্রুত শায়খ হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করেন।

খিলাফত লাভ ও মানুষকে মুরিদ করার নির্দেশ

নিজের মুর্শিদ ও পিতা শায়খ দরবেশ মুহাম্মদ একদা হযরত আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহকে কাছে ডেকে আনলেন। বললেন, "বাবা মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা তোমার কঠোর

সাধনাকে কবুল করেছেন। তোমাকে আমি খিলাফতে খিরক্কা প্রদান করছি।” এরপর তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার পূর্বেকার সকল শাইখুল মাশাইখের নাম উচ্চারণ করলেন এবং দীর্ঘ দু’আ শেষে বললেন, “এখন থেকে তুমি নিজেকে প্রকাশ করো। মানুষকে তরিকতের রাস্তায় ডাক দাও। প্রয়োজনে মুরিদ করবে।”

স্বীয় মুর্শিদ ও পিতার উক্ত নির্দেশ পেয়ে তিনি আর নিজেকে গোপন রাখতে পারলেন না। মুর্শিদের জীবিতাবস্থায়ই অনেক মানুষ তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। খুঁজে পান ইলমে শরীয়ত ও তরিকতের সন্ধান।

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ও ওলিআল্লাহ পুত্রসন্তান লাভ

হযরত খাজা মুহাম্মদ আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহ বিবাহিত ছিলেন। তাঁর শ্বশুর ছিলেন আরেক নকশবন্দি শায়খ খাজা সাবির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আল্লাহ তা’আলা তাঁর স্ত্রীর গর্ভে এক সুযোগ্য পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। তাঁর নাম ছিলো খাজা আবুল ক্বাসিম রাহিমাহুল্লাহ। শরীয়ত ও তরিকতের উচ্চ মাক্বামে আরোহণ করে আবুল ক্বাসিম রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় পীর ও পিতা মুহাম্মদ আমকাঞ্জি রাহিমহুল্লাহর বিশিষ্ট খলিফা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত আমকাঞ্জি মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা ছিলেন খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি একদা তাঁর পীর সাহেবের পুত্র খাজা আবুল ক্বাসিমের নিকট পত্র লিখেন। তিনি এতে খুব তাজিমের সঙ্গে হযরতের প্রতি আনুগত্য ও তাঁর খাদিম হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর খলিফা ইমামে রাব্বানী শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহও একবার তাঁর দাদাপীরের সুযোগ্য সন্তান হযরত আবুল ক্বাসিম রাহিমাহুল্লাহর নিকট পত্র লিখেছিলেন। ইমামে রাব্বানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মালফুজাতের ১৬৪ ও ১৮০ নং পত্রে এর বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

খাজা আবুল ক্বসিম দীর্ঘ জীবন পান নি। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি আমকানায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। স্বীয় পিতা ও মুর্শিদ হযরত দরবেশ মুহাম্মদের পাশেই তিনি সমাহিত আছেন।

মেহমানদের খিদমাত

হযরত খাজা আমকাঞ্জি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন-যাপন করতেন। মেহমানরা প্রথমে তাঁকে চিনতেই পারতো না। এর মূল কারণ ছিলো মেহমানদের সঙ্গে তাঁর অনন্য বিনয়সহ আচরণ। কেউ তাঁর বাড়িতে আসলেই তাদের সওয়ারী ও রসদপত্র নিজেই দেখভাল করতেন। তাদেরকে নিজ হাতে খাবার ও পানীয় পরিবেশন করতেন। মেহমানদের সাথে তাদের কেনো খাদিম থাকলে তাকেও অনুরূপ আদবের সাথে খাবার পরিবেশন করতেন। সুতরাং অপরিচিত লোকজন তাঁকে প্রথমে বাড়ির খাদিম মনে করতো।

হৃদয়কে আলোকিত করার কারামত

হযরত আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহ ওলি **তারাশ** ছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে তাঁর সুহবতে থেকে খুব সহজেই অনেকেই ওলিআল্লাহ হয়েছেন। এটা ছিলো তাঁর একটি কারামত। অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করে তুলতেন। যুগের অন্যান্য অনেক শায়খ পর্যন্ত তাঁর সুহবতে আসতেন বরকতের আশায়। সাধারণ ছাত্ররাও দলে দলে এসে হাজির হতেন তাঁর দরবারে। যুগের বাদশাহগণও তাঁর নিকট খুব তাজিমের সঙ্গে উপস্থিত হতেন বরকত লাভের উদ্দেশ্যে।

বর্ণিত আছে একজন দরবেশ বলেন, "এক রাতে আমি হযরত খাজা সাহেবের সঙ্গে ভ্রমণে ছিলাম। হঠাৎ আমার পায়ে একটি কাটা বিদ্ধ হলো। তিনি বললেন, হে ভাই! হাতে কাটা বিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত পুষ্পের ছোঁয়া পাবে না।"

একটি কারামত

একদা তিনজন আলিম হযরতের দরবারে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকের মনেই একেকটি ইচ্ছে ঘোরপাক খাচ্ছিলো। প্রথম ব্যক্তির খেয়ালে এটাই ছিলো, "যদি খাজা সাহেব কোনো এই-এই বিশেষ ধরনের খাবার পরিবেশন করেন, তাহলে ভাববো তিনি কারামতওয়ালা ওলি।" দ্বিতীয় জনের ভাবনা ছিলোন, "তিনি যদি এই-এই ফল আমাকে দেন, তাহলে

বুঝতে পারবো তিনি আল্লাহর ওলি।” তৃতীয় জনের ধারণা হলো, “যদি কোনো সুদর্শন ছেলে উপস্থিত হয় তাহলে বুঝতে পারবো তিনি, অসাধারণ আমল করে থাকেন।”

তিনজন হযরত আমকাঞ্জি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজির হওয়ার পর হযরত নিজ হাতে খাবার পরিবেশ করলেন। প্রথম ব্যক্তি লক্ষ্য করলন, তিনি যা খেতে ইচ্ছে করেছিলেন, তা-ই তিনি পরিবেশন করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো তকেও হযরত কাঙ্ক্ষিত ফল প্রদান করেছেন। এরপর হযরত শায়খ আমকাঞ্জি তৃতীয় ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনার ইচ্ছেটি পূরণ হাবর নয়। কারণ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসারী। শরীয়ত বিরোধী কোনো আমলের স্থান এখানে নেই।”

তিনি এরপর তিনজনকেই উপদেশ দিলেন, “এমনকি হালাল হলেও, আমাদের মতো মানুষের নিকট উপস্থিত হবে না, যেভাবে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছো। কারণ হলো, সবার অন্তরের হাল একই নয়। অধিকাংশ লোক এরূপ ব্যাপার উপেক্ষা করে যায়। এরূপ নিয়ত করে এসে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিক পরিমাণ কারামত মানে কিছুই নয়। তোমাদের উচিৎ হবে ওলিদের দরবারে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাওয়া। তাঁর আভ্যন্তরীণ নূর দ্বারা যাতে আল্লাহ তা’আলা উপকৃত করেন, সেটাই হবে তোমাদের উদ্দেশ্য।”[32]

খুলাফাবৃন্দ

হযরত খাজা মুহাম্মদ আমকাঞ্জি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বেশ কয়েকজন খিলিফা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নিচের চারজন হচ্ছেন প্রসিদ্ধ।

১. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাক্বি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২. হযরত খাজা আবুল ক্বাসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [হযরতের পুত্র]

৩. হযরত খাজা সাবির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৪. হযরত খাজা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [তিনি ছিলেন হযরত সাবির রাহিমাহুল্লাহর পুত্র]।

---

[32] মাশাইখে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদীয়াহ, পৃ. ১২৮-১৩০

হযরত খাজা আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট কিছু মুরিদান ছিলেন যারা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে নকশবন্দি তরিকার প্রসার ঘটান। এদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁরই জামাতা হযরত খাজা আহমদ অরফে খাজা আমল রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ভারতের গুজরাটে যান এবং সেখানেই ১০২০ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত খাজা আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

তিনি ১০০৮ হিজরি সনের শাবান মাসের ২২ তারিখ তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃতুকালে হযরতের বয়স ৯০ বছর হয়েছিল। তাঁর নিজস্ব শহর উজবেকিস্তানের আমকানায় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক তাঁর মাক্বামাত উন্নত করুন।

নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদীয়া তরিকা মুতাবিক পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন খাজা মুহাম্মদ বাক্বি বিল্লাহ নকশবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা এখন এ মহান ওলির জীবন, সাধনা ও কর্মের ওপর আলোচনায় যাবো ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টি কামনায় রচিত এ গগ্রন্থটি আপনি রোজ কিয়ামতের মুসিবতের সময় আমাদের নাজাতের ওয়াসিলা বানাও। আমাদেরকে যেভাবে আপনি পছন্দ করেন সেভাবে সঠিক তথ্যাদি তুলে ধরার তাওফিক দিন।

হযরত খাজা শায়খ মুহাম্মদ বাক্বি বিল্লাহ নকশবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ১০১২ হিজরি, সমাধি- দিল্লী, ভারত।

ভারতবর্ষে নকশবন্দি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত বিখ্যাত এ ওলির পূর্ণ নাম ছিলো রাজিউদ্দিন মুহাম্মদ বাক্বি। তবে তিনি খাজা বাক্বি বিল্লাহ নামেই সুপরিচিত। তাঁর পিতার নাম ছিলো কাজি আবদুস সালাম সমরকন্দী। কাবুলের একজন সুফি ও আলিম হিসেবে তাঁর সুনাম ছিলো।

জন্ম ও শিক্ষা

যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি, ভারতবর্ষে নকশবন্দি তরিকার প্রবর্তক হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ ৯৭১ [মতান্তরে ৯৭২] হিজরি সনে আফগানিস্তানের কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো বর্ণনা মতে জন্মের তারিখ ছিলো জিলহাজ্জ মাসের ৫ তারিখ। তাঁর পিতা কাজি আব্দুস সালামের পূর্বপুরুষরা ছিলেন তুর্কিস্থানের অধিবাসী। মাতা ছিলেন সাইয়্যিদ বংশের। হযরত বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর পিতা ও পিতামহ সমরকন্দে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে আফগানিস্তানের কাবুলে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

পিতা-মাতা তাঁদের এই আদুরে শিশুর নামকরণ করেন রাজিউদ্দিন মুহাম্মদ বাক্বি। হযরতের তাখাল্লুস [ডাক নাম] ছিলো বিরং - যার অর্থ 'রংহীন'। শিশুকালেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয় হযরত মাওলানা সাদিক্ব হালওয়ায়ী নামক এক শিক্ষকের নিকট। তিনি পাঁচ বছর বয়স থেকে কুরআন শরীফের হিফজ শুরু করেন। আট বছর বয়সে পূর্ণ কুরআনের হাফিজ হন। পিতা-মাতার ইচ্ছায় তাঁকে উচ্চতর শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মাওয়ারুন-নাহারে। সাথে ছিলেন তাঁর উস্তাদ মাওলানা সাদিক্ব।

ইলমে তাসাওউফের প্রতি আকর্ষণ

ইলমে শরীয়তের শিক্ষাকালে একদা তাঁর হাতে তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর লিখিত একখানা কিতাব আসলো। গভীর রাতে কিতাবখানা পাঠরত অবস্থায় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়।

কিতাব পাঠ করাবস্থায় একসময় হযরত কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। অর্ধ-ঘুমান্তবস্থায় তাঁর সম্মুখে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য ভেসে উঠলো। সমগ্র কক্ষটি আলোকিত হয়ে ওঠেছে। নূরের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় এক অপরূপ সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট বুজুর্গ হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। এই বুজুর্গ হচ্ছেন নকশবন্দিয়া তরিকার ইমাম হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বুঝতে পারলেন হযরত নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর হৃদয়কে আধ্যাত্মিক বরকত দ্বারা স্নান করে দিচ্ছেন।

মজযূবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোনো বান্দাহকে বেলায়েতের মর্যাদায় ভূষিত করতে চান তখন তাকে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন বিভিন্নভাবে। উপরোক্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিলো তারই অংশ। তবে এখানেই শেষ ছিলো না।

একদিন হযরতের সম্মুখে এক মজযূব হাজির হলেন। তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন:

তুমি আল্লাহকে কান্জ ও হিদায়ায় পাবে না
নিজের হৃদয় পানে দৃষ্টি দাও, কোনো গ্রন্থ দ্বারা এ দৃশ্য দেখা যায় না।

উক্ত ঘটনা দুটোর পর হযরত বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর মধ্যে এক অপূর্ব পরিবর্তন আসলো। তাঁর অন্তরাত্মা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাহিক্য জ্ঞানার্জনের সীমাবদ্ধতার হাক্বিক্বাত তাঁর মধ্যে উন্মোচন হলো। আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের পথ তথা তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হক্কানী মুর্শিদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

সন্ধানী সেজে হযরত বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। প্রথমত তিনি শায়খ খাজা উবাইদ রাহিমাহুল্লাহর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। খাজা সাহেব হযরত মাওলানা লুতফুল্লাহ নামক এক শায়খের খলিফা ছিলেন। কিন্তু কেনো যেনো তাঁর

মন তখনও উচাটন করছিলো। সুতরাং খাজা সাহেবের অনুমতিক্রমে শায়খ ইফলিখার নামক আরেক বুজুর্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানেও বেশিদিন অবস্থান করতে পারেন নি। এরপর তিনি খাজা আমির আবদুল্লাহ বলখী রাহিমাহুল্লাহর দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু তাতেও মনের তৃপ্তি মিটলো না।

কিছুদিন ট্রান্সসোক্সানিয়ায় অবস্থানের পর কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে তিনি সাক্ষাৎ গ্রহণ করলেন শায়খ বাবা কুবরাবী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে। তাঁর সুহবতে থেকে তিনি উপকৃত হলেন আধ্যাত্মিকভাবে। বাবা সাহেবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অন্য কোথাও যান নি। কাশ্মীরে থাকাকালে হযরত বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন। যুগের শ্রেষ্ঠ নকশবন্দি ওলি খাজা মুহাম্মদ আমকাঞ্জি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে ডাক দিয়েছেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করে তিনি যাত্রা করলেন উজবেকিস্তানের আমকানার উদ্দেশ্যে।

খাজা আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহ হযরত বাক্বি বিল্লাহকে দেখেই বুঝতে পারলেন, এই ব্যক্তিই নকশবন্দি তরিকার পরবর্তী শায়খ হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। সুতরাং তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণের পর হযরত বাক্বি বিল্লাহকে বললেন, ‘‘বাবা বাক্বি! তুমি একান্তভাবে আমার সঙ্গে তিন দিন ও তিন রাত কাটাবে। এরই মধ্যে আল্লাহ চাহে তো, তোমার মাঝে ইলমে মা’রিফাতের পূর্ণতা লাভ হবে। তুমি নকশবন্দি যাবতীয় শায়খদের আধ্যাত্মিক নিসবত লাভে ধন্য হবে। তবে তোমাকে এই অঞ্চলে নয়, বরং চলে যেতে হবে ভারতবর্ষে। সেখানে নকশবন্দিয়া তরিকার প্রসার-প্রচারের দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হয়েছে।’’

খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ নিজের দুর্বলতার কথা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু খাজা আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, ‘‘আল্লাহ তা’আলা তোমাকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করবেন। তোমাকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে।’’

তাঁর উচ্চতর মাক্বাম

হযরত আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহর একান্ত সুহবতে তিন দিন ও তিন রাত কাটানোর পর হযরত বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর আধ্যাত্মিক মাক্বামের স্তর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছুয়ে গেলো। তিনি স্বীয় পীর হযরত আমকাঞ্জি রাহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে খিলাফত লাভে ধন্য হলেন। তিনি 'ওয়াজদ' ও 'জওক্ব' এর স্তরে উপনিত হলেন।

ভারতে আগমন

মুর্শিদের নির্দেশে হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ পুনরায় ভারতে ফিরে আসলেন। প্রথমে লাহোরে এক বছর অবস্থান করেন। এরপর দিল্লীতে এসে ফিরোজ শাহ কেল্লায় অবস্থান নেন। সে যুগে নদীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত এ কেল্লায় একটি বড়ো মসজিদও ছিলো। খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ এখানেই বাকি জীবন কাটান।

নিজেকে আত্মগোপনের চেষ্টা

হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতর মাক্বামের অধিকারী থাকাসত্ত্বেও নিজেকে সর্বদা লুকিয়ে রাখতেন। তিনি নিজেকে সবার থেকে অধম মনে করতেন। তাঁর বিনয়াবনতার একটি উপমা বর্ণিত আছে।

খাজা সাহেবের প্রতিবেশী এক যুবক বাস করতো। সে ছিলো খুব দুষ্ট প্রকৃতির লোক। প্রায়ই খাজা সাহেবের সঙ্গে বে-আদবিপূর্ণ আচরণ করতো। তিনি নীরবে সব সহ্য করে যান। তাঁর এক মুরিদ খাজা হুশামিুদ্দিন যুবকের এরূপ ব্যবহারে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি একদিন যুবকের বিরুদ্ধে পুলিশে নালিশ করলেন। পুলিশ অফিসার যুবককে আটক করে জেলে প্রেরণ করলো। এ সংবাদ যখন খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ শুনলেন, তিনি তাঁর মুরিদের প্রতি রাগ করলেন। হুসামুদ্দিন বললেন, "ইয়া শাইখী! সে একটি লম্পট ও দুষ্ট লোক। সে সীমাতিক্রম করেছে।" একথা শুনে খাজা সাহেব বললেন, "তুমি নিজেকে বড়ো শায়খ ভাবো, তাই না? আর এ কারণেই বুঝি যুবকটি তোমার নিকট দুষ্ট ও বে-আদব মনে হচ্ছে! কিন্তু আমি তো নিজেকে তার থেকেও অধম মনে করি।" এরপর তিনি নিজেই

যুবককে জেল থেকে মুক্ত করলেন। যুবক তাঁর এরূপ ব্যবহারে লজ্জা বোধ করলো। হযরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে দুষ্টোমি ছেড়ে দিলো। তিনি তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে বাকি জীবন একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে কাটিয়ে দিলেন।

যখনই কোনো মুরিদের পক্ষ থেকে ভুল-ত্রুটি হতো, তখন খাজা সাহেব বলতেন, "এটা বাস্তবে আমারই ভুল যা তার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে!"[33]

"জুবদাতুল মাক্বামাত" নামক গ্রন্থের লেখক বলেন: "তখন হযরত খাজা সাহেব লাহেরে বসবাস করতেন। একদা ভীষণ দুর্ভিক্ষ শুরু হলো। মানুষের ক্ষুধার জ্বালা ও যন্ত্রণায় তিনি এতোই মর্মাহত হলেন যে, বেশ কয়েকদিন খাবার মুখে দিলেন না। যখনই তাঁর সম্মুখে খাবার পরিবেশ করা হতো তখনই তিনি বলতেন, 'এটা কী কখনও উচিত হবে যে, মানুষ খাবারের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে আর আমি এখানে বসে বসে খাবো!' তিনি বরং সব খাবার ক্ষুধার্ত মানুষের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।"[34]

একটি ঘটনা

হযরত আহমদ সিরহিন্দী ফারুক্বী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা। একদা তাঁর এক খাদিমকে হযরতের নিকট হাদিয়া হিসেবে কিছু ফালুজাসহ প্রেরণ করলেন। হযরতের দরোজায় পৌঁছার পর তিনি নিজেই এগিয়ে এসে হাদিয়া গ্রহণ করলেন। খাদিমকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?" খাদিম জবাব দিলো, "আমার নাম বাবা।" তিনি বললেন, "তুমি শায়খ আহমদ সিরহিন্দীর খাদিম, তুমি আমাদেরই।"

ফেরার পথে খাদিমের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। সে জযবের নিসবত [আল্লাহর দিকে ধাবমান অবস্থা] ও সুকর [আধ্যাত্মিকভাবে মাতাল অবস্থা] তাকে সম্পূর্ণরূপে আড়ষ্ঠ করে দিলো। সে চিৎকার করতে করতে কোনোমতে হযরত সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর নিকট

---

33 দাওয়াত ওয়া আজিমাত, খ. ৪, পৃ. ১৪৬- আক্বওয়ালে সালাফ খ.৩, পৃ. ৫০-৫১ থেকে।

34 মাওলানা নাসিম আহমদ আমরাবী, তাযকিরাহ খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহ.।

ফিরে আসলো। হযরত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী হয়েছে বাপু?" সে বলতে লাগলো, "ইয়া শাইখী! সমগ্র জমিন, বৃক্ষ-তরু-লতা, পাথর সবকিছুতে শুধু নূর আর নূর দেখছি! এমন ঔজ্জ্বল্যতা প্রকাশ পেয়েছে যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না।" তিনি মন্তব্য করলেন, "বেচারা খাদিমের এ অবস্থার কারণ হচ্ছে, শায়খ বাক্বি বিল্লাহর নূরের কিঞ্চিৎ আভা তার ওপর পতিত হয়েছে মাত্র।"[35]

সিরাতুল মুস্তাক্বিমের ব্যাখ্যা

হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের' একান্ত অনুসারী ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে সবাইকে শিক্ষাদান করতেন। পবিত্র কুরআনে সূরা ফাতিহার তাফসীরে তিনি 'সিরাতুল মুস্তাক্বিম' এর ব্যাখ্যা লিখেছেন:

"হক্কানী উলামায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, 'সিরাতুল মুস্তাক্বিম' [সরল পথ] হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের রাস্তা।"

বংশধর ও খুলাফাবৃন্দ

হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর দুজন স্ত্রী ছিলেন। তিনি দুজন পুত্রসন্তানের পিতা। তাঁর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন বাদশাহ আকবরের সরকারী কর্মকর্তা ক্বালিজ খান আন্দাজানী (মৃ. ১০২৩ হি.) নামক এক ব্যক্তির মেয়েসন্তান। তিনি একজন দক্ষ ফকীহ, হাফিজ ও তাফসীরবিদ ছিলেন। হযরত খাজা সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন মুহাম্মদ সাদিক্ব কাসমী নামক একজন আলিমের বোন।

মৃত্যুকালে খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর মাতা, উভয় স্ত্রী ও নাবালিক দুজন পুত্রসন্তান রেখে যান। হযরতের খলিফা খাজা হুসামুদ্দিন তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। তাঁর প্রথম পুত্র খাজা উবাইদুল্লাহর জন্ম হয় ১০১০ হিজরি সনে। তিনি ১০৭৩ হিজরিতে মারা যান। তিনি 'খাজা কালান' [বড়ো খাজা] নামে সুপরিচিত ছিলেন। কেউ একজন সুফি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর একজন পুত্রসন্তান জন্ম নেবে এবং তাঁর নাম হবে নকশবন্দি শায়খ খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহর নামানুসারে।

---

[35] মাশাইখে নকশবন্দীয়াহ মুজাদ্দিদীয়াহ, পৃ. ১৩৩-১৩৪।

তাঁর দ্বিতীয় পুত্র একই বছর [১০১০ হি.] কিছুদিন পর জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেওয়া এই পুত্রের নাম ছিলো খাজা আবদুল্লাহ। তিনি 'খাজা খুর্দ' [ছোট খাজা] নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে হযরত আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে যান এবং তরিকতের খিলাফত লাভে ধন্য হন। তিনি ১০৭৪ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন।

হযরত খাজা সাহেবের খুলাফাবৃন্দের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ইমামে রব্বানি শায়খ আহমদ সিরহিন্দী ফারুক্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁরই মাধ্যমে পরবর্তীতে উপমহাদেশসহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী নকশবন্দিয়া তরিকার প্রসার ঘটে। নিম্নে হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর কয়েকজন প্রসিদ্ধ খলিফার নাম উল্লেখিত হলো।

১. ইমামে রব্বানি মুজাদ্দীদে আলফে সানি শায়খ আহমদ সিরহিন্দী ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৩৪ হি.]।

২. শায়খ তাজউদ্দিন উসমানী সাম্বালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৫১ হি.]।

৩. খাজা হুসামুদ্দিন আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৪৩]।

৪. শায়খ ইলাহ দাদ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৫১]।

৫. শায়খ উসমান জালান্দারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৬. শায়খা বিবি দৌলত রাহমাতুল্লাহি আলাইহা [তাঁর এক মুরিদের স্ত্রী। এই শায়খাকে নকশবন্দি মহিলাদেরকে জিকির-আজকারের সবক দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।]

কবি শায়খ বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ

হযরত শায়খ খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন বিশিষ্ট সুফি কবিও ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি ছোট-বড়ো কবিতা রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতা মসনবী শরীফের মতো। তিনি তাঁর কলম-নাম [তাখাল্লুস] হিসেবে 'বিরং' [স্বচ্ছ] ব্যবহার করতেন।

হযরতের মালফুজাত [বক্তৃতাসমগ্র] তাঁরই এক প্রিয় মুরিদ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। ইচ্ছে করেই মুরিদ তাঁর নিজের নাম উল্লেখ করেন নি। তবে এই মুরিদ তাখাল্লুস সিহেবে ব্যবহার করেছেন ‘রুশদি’। কিছু কিছু জীবনীলেখক তাঁকে মাওলানা রুশদি বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর কাছ থেকেই আমরা হযরত শায়খ বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা পেয়েছি।

হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর ‘মাকতুবাতে’ মোট ৮০টি পত্র সংকলিত হয়েছে। এগুলোকে বলে ‘রুক্কাত’। তিনি বেশ কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। নিচে উল্লেখিত কটি ‘কুল্লিয়াতে বাক্বি বিল্লাহ’ নামক সংকলনে সংরক্ষিত আছে।

১. হাক্বিক্বাতই নামায।

২. মুখতাসির বয়ানে তাওহিদ।

৩. মা’না’ আউয [আউযুবিল্লাহর অর্থ]।

৪. বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহার তাফসির।

৫. সূরা আশ-শামসের তাফসির।

৬. সূরা আল-ইখলাসের তাফসির।

৭. সূরা আল-ফালাক্বের তাফসির।

৮. সূরা আন-নাসের তাফসির।

৯. শরহে রুবাইয়াত বা সিলসিলাতুল আহরার [১০০৭ হি. রচিত]।

খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর মূল্যবান বাণী

১. তিনি বলেন, যদি কোনো তরিকতের সালিক গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকে কিংবা দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তাহলে এর এক বা একাধিক কারণ হলো: ১. সে নিজেকে যা-ই প্রাপ্ত হচ্ছে তার দ্বারা তৃপ্তিবোধ করে না। ২. সে জনতার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে। ৩. সে আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল আছে। ৪. সে আল্লাহর নিকট থেকে এমন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছে যা গাইরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। ৫. সে তার নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদায় লিপ্ত নয়। ৬. সে শরীয়তের চিরন্তন আইন-কানুন পুরোপুরি গ্রহণ করে নি।

২. তিনি বলেন, তাওয়াক্কুল [আল্লাহর উপর ভরসা] এর অর্থ নয় যে, তুমি সব ওয়াসিলার বিসর্জন দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে। এটা বাস্তবে তাসাওউফের মূলনীতির পরিপন্থী। বাস্তাবে তাওয়াক্কুল হচ্ছে হালাল উপায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া- যেমন, লেখালেখি ইত্যাদি, তবে অবশ্যই এটা মনে করতে নেই যে বেঁচে থাকার উপায় এটাই। এর ওপর ভরসাও করতে নেই। বরং মনে করবে রুজির ওয়াসিলা হচ্ছে তোরণস্বরূপ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাঁর নিকট পৌঁছুনোর রাস্তা হিসেবে নির্ধারণ করছেন। তিনিই হচ্ছেন সকল উপায়-অবলম্বনের কর্তা।

৩. তিনি বলেন, যারা আল্লাহকে পেতে আগ্রহী, তারা যেনো কখনও কাশফের ওপর ভরসা না করে। কাশফ মূলত দু ধরনের: ১. দুনিয়াবী কাশফ- যা মূলত সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয়। ২. আখিরাতমুখী কাশফ- যা মূলত কুরআন ও সুন্নাতের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এগুলোর সঠিক অনুসরণের উপর নিজেকে অটল রাখলেই যথেষ্ট হবে। কুরআন ও সুন্নাহর তুলনায় কাশফ কিছুই নয়।

৪. তিনি সালিকদের উপদেশ দিতেন, সঠিক ঈমান, শরীয়তের সঠিক অনুসরণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ও তাঁর প্রতি সর্বদা ধ্যানস্থ থাকা হচ্ছে সর্বাধিক উত্তম গুণাবলী। কোনো জাওক্ব [আধ্যাত্মিক স্বাদ] বা ওয়াজদ [পরমমগ্নতা] উক্ত গুণাবলী থেকেও উত্তম কিছু নয়।

আবদুল বাক্বি থেকে বাক্বি বিল্লাহ

হযরত খাজা সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এমন উচ্চতর ফানার মাক্বামে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন যে 'আবদুল বাক্বি' [চিরন্তনের গোলাম] থেকে 'বাক্বি বিল্লাহ' [আল্লাহর মধ্যে চিরন্তন] হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত হন। তিনি যখন আরো উচ্চতর মাক্বামের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন বললেন: "ওয়াহদাতুল উজূদ এর ওপর বিশ্বাস হচ্ছে একটি সরু রাস্তা। অপরদিকে রাসূলুল্লাহর [সা.] মহাসড়ক সুপ্রশস্ত।"

বিদায়গ্রহণ

সবাই একদিন যেতে হবে প্রভুর দরবারে। সৃষ্টি করে নির্ধারিত রখেছেন মহাপ্রভু বান্দাকে কোনদিন কোথায় কোন ক্ষণে আবার নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। যুগের এক শ্রেষ্ঠ ওলি, ফানাফিল্লাহর স্তরের সওয়ার শেষ পর্যন্ত দুনিয়াবী জিন্দেগীর ইতি ঘটিয়ে তাঁর মাহবুবের

দরবারে চলে গেলেন অসংখ্য ভক্ত-মুরিদান ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের শোকের সায়রে ভাসিয়ে। ১০১২ হিজরি সনের ২৫শে জুমাদিউল আখির সূর্যাস্তের পূর্বে হযরত বাক্বি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উচ্চস্বরে “আল্লাহ! আল্লাহ!” উচ্চারণ করতে করতে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃতুকালে হযরতের বয়স ছিলো মাত্র চল্লিশ বছর। মৃত্যুর পরের দিন তাঁকে দিল্লী শহরেই সমাহিত করা হয়।

তিনি হচ্ছেন চিরন্তন যার হৃদয় জাগ্রত হয়েছে প্রেমের ছোঁয়ায়
এভাবেই লাওহে মাহফুজে আমার জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করেছি হযরত খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলিফা ছিলেন ইমামে রব্বানি শায়খ আহমদ সিরহিন্দী ফারুকী মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং এখন তাঁরই জীবন, সাধনা ও কর্মের ওপর যেটুকু আল্লাহ তা’আলা তাওফিক দেন তা বর্ণনা করবো। আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া আমাদের কোনো বাসনা-কামনা সফল হবার নয়। আমরা তাঁর পবিত্র দরবারে কায়মনোবাক্যে তাওফিক কামনা করছি।

হযরত ইমামে রব্বানি শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ১০৩৪ হিজরি, সমাধি- সিরহিন্দ, ভারত।

তিনি কখনও সম্রাট আকবরের নিকট মাথানতো করেন নি,
যাঁর জীবন ছিলো স্বাধীনতার তরে নিবেদিত,
তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ
আল্লাহ তাঁকে পাঠালেন ইসলামের এক বিরাট বিপদক্ষণে।

তিনি হচ্ছেন ইসলামী দ্বিতীয় সহস্রাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত ইমামে রব্বানি শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মুসলমানরা মুক্তি পায় সর্বযুগের বিরাট এক ফিৎনা থেকে। সম্রাট আকবরের ‘দ্বীনে এলাহি’ নামক নতুন বাতিল ধর্মমতের ধ্বংস সাধিত হয় তাঁরই হাতে। রক্ষা পায় সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানরা ও সমগ্র বিশ্ব।

নাম ও পূর্বপুরুষ

হযরতের মুবারক নাম ছিলো আহমদ। তাঁর পিতার নাম ছিলো আবদুল আহাদ। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে আটাশতম ব্যক্তি হচ্ছেন আমীরুল মু’মিনীন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। হযরতের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো আলিম ও ওলিআল্লাহর আবির্ভাব হয়। হযরতের পিতাও একজন আলিমে দ্বীন ও চিশতিয়া তরিকার বড়ো মাপের শায়খ ছিলেন। বিখ্যাত চিশতি শায়খুল মাশাইখ হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা ও খলিফা হযরত রুকনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর খলিফা ছিলেন সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর পিতা হযরত মাখদুম আবদুল আহাদ[36] রাহমাতুল্লাহি

[36]একজন সুদক্ষ আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে আবদুল আহাদ রাহিমাহুল্লাহর বিরাট সুনাম ছিলো। সে যুগের ইরান, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শায়খের সুহবতে আসতেন অসংখ্য সালিক। হযরত আহাদ রুমি রাহিমাহুল্লাহর ‘মসনবী’, শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর ‘আওয়ারিফুল মা’আরিফ’, ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহর ‘ফুসুসুল

আলাইহি। এছাড়া তিনি কাদিরীয়া তরিকারও একজন বুজুর্গ থেকে ইযাজতপ্রাপ্ত শায়খ ছিলেন।

হযরত সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর একজন পূর্বপুরুষের নাম হচ্ছে শায়খ শাহাবুদ্দিন আলী। তিনি ফারুক শাহ কাবুলী নামেও খ্যাত। কাবুলের সালতানাতের একজন উজির হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিখ্যাত চিশতি শায়খ হযরত ফরিদুদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশকর[37] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁরই অধঃতন বংশধর ছিলেন।

ইমামে রব্বানির অপর বিখ্যাত পূর্বপুরুষ ছিলেন ইমাম রফিউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ। তিনিও ফারুক শাহ কাবুলীর অধঃতন বংশধর ছিলেন। হযরত রফিউদ্দিন ইলমে তাসাওউফের উচ্চতর শায়খ ছিলেন, সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার শায়খুল মাশাইখ সায়্যিদ জালালুদ্দিন সুরক বুখারী [৫৯৫-৬৯০ হি.] রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে তরিকতের খিলাফত লাভ করেন। হযরত জালালুদ্দিনকে সাধারণত 'মাখদুমে জাহানিয়ান'[38] হিসেবে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। ফিরোজ শাহ তুগলক [৭৫২-৭৯০ হি.] যখন দিল্লীর দিকে যাত্রা করেন তখন ইমাম রফিউদ্দিন ও সায়্যিদ জালালুদ্দিন বুখারীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর সুলতান তাঁদেরকে সিরহিন্দে প্রেরণ করেন এবং সেখানে একটি কিল্লা তৈরি করতে ও শহরের গোড়াপত্তনের জন্য অনুরোধ জানান।

লেখক হাশিম কিশমী বলেন, যখন এই উভয় সুফি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন তখন তাঁরা সিরহিন্দ গ্রামে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। গ্রামের মানুষ উভয় দরবেশকে পেয়ে খুব আনন্দিত হয়। পরবর্তীতে উভয় ব্যক্তি সুলতানের নিটক আবদার জানান, এ এলাকায়

হিকাম' ইত্যাদি তাসাওউফ শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাবের ওপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি এগুলোর ওপর দরসদান করতেন। ক্রমে সিরহিন্দ ইলমে তাসাওউফের এক উল্লেখ্যোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

[37] তিনি ছিলেন চিশতিয়া তরিকার বিখ্যাত ওলি শায়খ বখতিয়ার কাকী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা। তিনি মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। ঈসায়ী ১২৬৫ সালে পাঞ্জাবের উজুদানে [বর্তমান পাকিস্তানে] ইন্তিকাল করেন। চিশতি মাশাইখের জীবন ও সাধনার ওপর লিখিত অত্র গ্রন্থকারের 'আউলিয়ায়ে চিশত' বইটি পাঠ করুন।

[38] তাঁর জন্ম হয় ৭০৭ হিজরি সনে। তিনি চিশতিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার শায়খ ছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক তাঁর বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

একটি টাউন গড়ে তুলতে। সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। অরপ এক বর্ণনায় জানা যায়, সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের শাসনামলে রাজকীয় সম্পদ সিরহিন্দের নিকটস্থ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাত্রাকালে সৈন্য-সামন্তের সঙ্গে একজন দরবেশও ছিলেন। সিরহিন্দের কাছে আসতেই ঐ দরবেশ থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "এখানে একজন উচ্চ পর্যায়ের ওলির জন্ম হবে।" এ সংবাদটি যখন সুলতানের কর্ণগোচর হয় তখন তিনি সিরহিন্দে একটি শহর গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন।[39]

মাতৃভূমি ও জন্ম

হযরতের পূর্বপূরুষগণ মাতৃভূমি মদীনা মুনুওয়ারাহ থেকে আফগানিস্তানের কাবুলে এসে বসতি স্থাপন করেন। এদের মধ্যে কিছু ওলিআল্লাহ ব্যক্তি ভারতের সিরহিন্দে আসেন। হযরতের পিতাও এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর এখানেই হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানির জন্ম হয়। পরবর্তীতে তাঁর সন্তানাদি ও নাতি-নাতনিগণ এখানে বহুদিন স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

হযরতের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা শায়খ আবদুল আহাদ একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন: সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে ছেয়ে আছে। শূকর, বানর ও ভল্লুক মানুষকে খেয়ে ফেলছে। এরপর তাঁর বক্ষ থেকে একটি নূর বেরিয়ে আসলো। এ আলো দ্বারা দৃশ্যমান হলো একটি সিংহাসন। এক ব্যক্তি বালিশে হেলান দিয়ে সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর সম্মুখে অনেক যালিম ও ধর্মত্যাগী লোককে বকরির মতো জবাই করে হত্যা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে কেউ একজন খুব উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করছিলেন:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ * إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

-"বলুন: সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" [ইসরা: ৮১]

---

[39] বুরহান ফারুকী, পৃ. ৭।

ভোরে জেগে ওঠেই হযরত আবদুল আহাদ রাহিমাহুল্লাহ এ আশ্চর্য স্বপ্নের তাবির জানতে হযরত শাহ কামাল কিতালী রাহিমাহুল্লাহর নিকট আবদার জানালেন। তিনি বললেন, "আপনার একজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অন্ধকার, বিদআত ও ধর্মদ্রোহিতা দূর করে দেবেন।"

সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব এক সত্যস্বপ্ন এবং কী সুন্দার এর তাবির, যা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয় ১৪ই শাওয়াল শুক্রবার, ৯৭১ হিজরি সনে। ঈসায়ী তারিখটি ছিলো ২৬ জুন ১৫৬৪। তাঁর পিতা নাম রাখেন, আবুল বারাকাত বদরুদ্দিন আহমদ। জন্মের সময় সিরহিন্দে অবস্থান করছিলেন শায়খ কামাল কাদেরী কিতালী রাহিমাহুল্লাহ। আবদুল আহাদ তাঁর আদুরে শিশুসন্তানকে এই ওলির নিকট নিয়ে যান। তিনি শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে দু'আ করেন।

বাল্যকালে হযরতের লেখাপড়ার হাতেকড়ি তাঁর সুযোগ্য পিতা শায়খ আবদুল আহাদের নিকট শুরু হয়। এরপর বড়ো ভাই শায়খ মুহাম্মদ সাদিক্ব ও অপর আরেক উস্তাদ শায়খ মুহাম্মদ তাহির লাহুরী সাহেবের নিকট লেখাপড়া করেন। অল্প বয়েসেই কুরআনের হাফিজ হন এবং শিয়ালকোটের একটি মাদরাসায় শায়খ মাওলানা কামালুদ্দীন কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে হাদিস, ফিকাহ, তাফসির, মানতিক ইত্যাদি ইসলামী বিষয়ে উচ্চতর অধ্যয়ন করেন। এছাড়া যুক্তিবিদ্যা, তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রে তাঁর উস্তাদ ছিলেন শায়খ ইয়াকুব সারফি কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৫২১-১৫৯৫]। তিনি মীর সাইয়্যিদ আলী হামাদানী রাহিমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হামাদানীয়্যাহ তরিকার একজন শায়খুল মাশাইখ ছিলেন। উস্তাদ কাজী বাহলুল বাদাখশানী তাঁকে ফিকাহ ও সীরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইতিহাস শাস্ত্রে শিক্ষাদান করেন।

চার তরিকার শায়খ

যদিও হযরত ইমামে রব্বানি রাহিমাহুল্লাহর মূল সুফি তরিকা ছিলো নকশবন্দিয়া, তবে তখনকার উপমহাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত অন্য তিনটি তরিকা তথা চিশতিয়া, কদিরীয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকায় তিনি উচ্চতর মাক্বামে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি চার তরিকারই শায়খ ছিলেন।

শায়খ খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ

ইমামে রব্বানির পিতা শায়খ আবদুল আহাদ চিশতিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া ও কাদিরিয়া তরিকায় স্বীয় পুত্রকে খিলাফত দান করেন। এরপর ১০০৭ হিজরি সনের ১৭ই জুমাদিউল উলা ৮০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করার পর সিরহিন্দের শায়খ হিসেবে হযরত ইমামে রব্বানি রাহিমাহুল্লাহ স্থলাভিষিক্ত হন।

পিতার ইন্তিকালের পর শায়খ আহমদ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াজ্জমার দিকে যাত্রা করেন [অক্টোবর, ১৫৯৯]। দিল্লীতে পৌঁছুয়ে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে মাওলানা হাসান কাশ্মীরীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন শিয়ালকোটে অধ্যয়নকালে হযরতের হাম-জামাতি। কাশ্মীরী হযরতের সাথে খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। বাক্বি বিল্লাহ সাহেব তখন শুধুমাত্র দিল্লীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন। সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সম্পর্কে জানার পরই সাক্ষাৎ লাভের জন্য আন্তরিকভাবে আকর্ষণ বোধ করেন। সুতরাং কাশ্মীরী সাহেব তাঁকে নিয়ে গেলেন খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর নিকট।

ইমামে রব্বানিকে খুব সম্মানের সাথে স্বাগত জানান হযরত বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ। সাধারণত, হযরত বাক্বি বিল্লাহ সাহেব কাউকে অতি সহজে মুরিদ করতেন না। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো। তিনি নিজেই সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, "সম্ভব হলে কিছুদিন আমার কাছে অবস্থান করুন।" উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে হযরত বাক্বি বিল্লাহ

রাহিমাহুল্লাহ কাশফের মাধ্যমে তাঁর এই ভবিষ্যতের বিখ্যাত সুযোগ্য খলিফার আগমনের কথা জানতে পেরেছিলেন।[40]

কিছুদিন সুহবতে থাকার পর হযরত সিরহিন্দী বাক্কি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করে মুরিদ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মুরিদ হওয়ার পর ১০০৮ হিজরির রজব মাসে হযরত সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহকে নকশবন্দিয়া তরিকার খিলাফতে ভূষিত করেন। প্রথম সুহবতের সময় হযরত সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ ‘‘আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জ্ঞানলাভ করেন। এরপর খুব দ্রুত তিনি সুলুকের এক স্তর থেকে অপর স্তরে উন্নীত হন। এ রাস্তায় ভ্রমণের বর্ণনা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।’’[41]

উল্লেখ্য উভয় ওলি- শায়খ বাক্কি বিল্লাহ ও শায়খ সিরহিন্দী বলেছেন, তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ ছিলো আধ্যাত্মিক দিক থেকে জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হযরত বাক্কি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে একটি পত্র লিখেন তাঁর এক বন্ধুর নিকট, ‘‘সিরহিন্দ থেকে শায়খ আহমদ নামক এক ব্যক্তি কিছুদিন পূর্বে এসেছিলেন। তিনি অনেক বড়ো আলিম ও আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী। তিনি আমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছেন। আমি তাঁর মধ্যে দেখেতে পেরেছি, তিনি হবেন ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল বাতি যার দ্বারা সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হবে।’’[42]

অপরদিকে শায়খ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ খাজা মুহাম্মদ হাশিম কাশমী রাহিমাহুল্লাহর নিকট পত্র লিখলেন, ‘‘আমি যখন আধ্যাত্মিক চরম তৃষ্ণায় কাতর তখনই খাজা বাক্কি বিল্লাহর খানক্কায় যাই। তিনি আমাকে পবিত্র ইসমে আজম শিক্ষা দিয়েছেন।’’[43] তিনি তাঁর বন্ধু হাসান কাশ্মীরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, আপনি যদি হযরত বাক্কি বিল্লাহ

[40] কাশিমী, পৃ. ১৪১।

[41] নদবী, পৃ. ১৫৫

[42] কুল্লিয়াতে খাজা বাক্কি বিল্লাহ, পৃ. ১৩০।

[43] মাকতুবাত, সিরহিন্দী, খ.১, পত্র নং. ২৯০।

রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে যেতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করতেন না তাহলে আমি কখনও উচ্চতর আধ্যাত্মিক মাক্বামে আরোহণ করতে পারতাম না।[44]

দ্বিতীয়বার রমজান শরীফে [১০০৯ হি.] শায়খ সিরহিন্দী তাঁর পীরের সুহবতে যেয়ে ৩ মাস অবস্থান করেন। এসময় তিনি কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা করেছিলেন। বিদায়ক্ষণে হযরত বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ হযরতকে নকশবন্দিয়া তরিকায় 'মুরিদ' করার অনুমতি দেন। প্রথমে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন কিন্তু শায়খ তাঁকে নির্দেশ করার পর তিনি মুরিদ করা শুরু করেন।

তৃতীয়বার হযরত আহমদ সিরহিন্দী দিল্লীতে যেয়ে তাঁর শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ১০১২ হিজরি সনে। তখন শায়খ বাক্বি বিল্লাহ ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। এরপরও তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাঁর এ বিশিষ্ট খালিফাকে স্বাগত জানিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। নিজের প্রধান খলিফার দায়িত্ব দিয়ে স্বীয় পুত্রকে হযরত সিরহিন্দীর হাতে তুলে দেন। হযরত সিরহিন্দী এরপর লাহোরে গমন করেন। সেখানে তিনি যুগের উচ্চ পর্যায়ের ওলি ও আলিমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। এদের মধ্যে মাওলানা তাহির লাহোরী, খাজা ফারুক হুসাইন, মীর সাইয়্যিদ নাসির আহমদ রুমী প্রমুখ হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।

দিল্লীতে যখন তাঁর মুর্শিদ খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল হয় [১০১২ হি.] তখন শায়খ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ লাহোরে অবস্থান করছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি সাথে সাথে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি তাঁর মুর্শিদের কবর সন্তানাদি ও খলিফা এবং মুরিদানদের নিয়ে জিয়ারত করেন। পরে সবাই তাঁকে নকশবন্দিয়া তরিকার সর্বপ্রধান শায়খ হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

ভারতে নকশবন্দিয়া তরিকার প্রসারে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী

হযরত আহমদ সিরহিন্দী ভারতবর্ষে নকশবন্দিয়া তরিকাকে প্রচার-প্রসারে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন। তিনি এ কাজে প্রণালীবদ্ধ উপায়ে অগ্রসর হন। প্রথমত বিভিন্ন

[44] প্রাগুক্ত, খ.১, পত্র নং. ২৭৯।

খলিফাকে প্রেরণ করেন ভারতের তৎকালীন প্রধান প্রধান শহর ও গঞ্জে। তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন বিভিন্ন নকশবন্দি খানক্বাহ। এভাবে দ্রুত নকশবন্দিয়া তরিকার প্রসার ঘটে সমগ্র উপমহাদেশে।

খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, মীর মুহাম্মদ নু'মান [মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর], শায়খ বাদিউদ্দীন সাহরানপুরী [আগ্রা], শায়খ তাহির বাদেখশানী [জৌনপুর], শায়খ মুহিবুল্লাহ [এলাহাবাদ], শায়খ আহমদ [দেওবন্দ], শায়খ হামীদ [মালদা, বেঙ্গল], শায়খ নূর মুহাম্মদ [পাটনা, বিহার], হযরতের তিনজন সন্তান শায়খ মুহাম্মদ সাদিক্ব, শায়খ মুহাম্মদ সা'দ ও শায়খ মুহাম্মদ মা'সুম [পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল], খাজা মুহাম্মদ সাদিক্ব বাদেখশানী [লাহোর, পাঞ্জাব], শায়খ আহমদ বিন্নৌরী [পাঞ্জাব] প্রমুখ।

ইসলামী সংস্কারের নেতৃত্বে শায়খ সিরহিন্দী

হযরত ইমামে রব্বানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তাজদিদ' [সংস্কার] কাজ শুরু করেন সুন্নাহ, বিদআত, কালাম ও তাসাওউফের ক্ষেত্রে। আর এ কারণেই তিনি মুজাদ্দিদ [সংস্কারক] হিসেবে পরিচিত হন। এরপর তাঁকে 'মুজাদ্দিদে আলফে সানি' [ইসলামী ইতিহাসের দ্বিতীয় সহস্রাব্দির সংস্কারক] খেতাবে ভূষিত করা হয়। তাঁর সময়ের দ্বীনি করুণ চিত্র তুলে ধরতে যেয়ে স্বীয় পুত্র হাযরত মুহাম্মদ আবদুল্লাহর নিকট পত্র লিখে অবগত করেছিলেন।

হযরত সিরহিন্দীর জীবদ্দশায় দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সম্রাট আকবর। বিশিষ্ট ক্ষমতাবলে এবং হিন্দু-মুসলিম সভাসদদের পরামর্শে তিনি 'দ্বীনে ইলাহী' নামক একটি নতুন ধর্মমতের উদ্ভাবন ঘটান। এটির উদ্দেশ্য ছিলো সকল ধর্মাবলম্বীরা এক ছাতার নিচে জড়োত হবে। সুতরাং ধর্মভিত্তিক ভেদাভেদ ও সংঘর্ষ থেকে সবাই মুক্তি পাবে। সে যুগের বেশ কিছু 'আলিম'ও তাঁর এ বিদআতকে গ্রহণ করে নেন। এটাকে তাঁরা সম্রাটের সংস্কার হিসেবে আখ্যা দেন। কিন্তু আকবর ক্রমান্বয়ে হিন্দুধর্মকে ইসলামের ওপর অগ্রাধিকার শুরু করেন। এমতাবস্থায় মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ নিরব থাকতে পারলেন না। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে 'দ্বীনে ইলাহী' একটি বাতিল ধর্মমত ও চরম বিদআত। এটাকে যারা

গ্রহণ করবে তারা কাফির হয়ে যাবে। ইসলামের তৌহিদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথমেই তিনি আকবরের সভাসদদের মধ্যে যারা আলিম ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এরপর বাইরের যেসব উলামা না বুঝে এই ধর্মমতের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড প্রচারণা চালান। এছাড়া আকবরের উত্তরসুরী খসরুর বদলে জাহাঙ্গীর হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

একদা তিনি জাহাঙ্গীরের একজন অমাত্যের নিকট পত্র লিখলেন: “যদি রাজকীয় শাসনের শুরু থেকেই মুসলমানদের তাদের রীতিনীতি ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করা হয় তহালে কী না করা যায়? তবে, আল্লাহ না করুন, যদি এ কাজে শৈথিল্যতা কিংবা দেরি করা হয়, তাহলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হবে। সুতরাং এখন দেখার ব্যাপার হচ্ছে, উত্তরসূরিদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সৌভাগ্যশীল যিনি উক্ত কাজে দক্ষতা দেখাতে সক্ষম। ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - এটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। [৬২:৪]”

সুতরাং হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহ সুকৌশলে জাহাঙ্গীরের সভাসদদের জাগ্রত করে তুলেন। অন্যদিকে স্বয়ং সম্রাট আকবরও তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি তাঁকে একদা রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন। হযরত সিরহিন্দী এ আমন্ত্রণ কিছু শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করে নিলেন। এভাবে তিনি ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টিকে হিন্দুদের প্রভাব থেকে রক্ষা করেন। এর ফলে ভারতের মুসলিম ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকলেন। বাস্তবে হযরত শায়খ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবদানের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে এবং থাকবে।

বন্দী জীবন

আকবরের পর জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অনেকটা ন্যায়পরায়ণ পরহেজগার মুসলমান শাসক ছিলেন। কিন্তু এরপরও কিছু কিছু মোগল ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে খুব কঠোর ছিলেন।

হযরত সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর প্রতি হিংসুক ও দুনিয়াদার কিছু আলিম ও সুফি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে কুপরামর্শ দেয় তাঁর বিরুদ্ধে। একই সময় শিয়াপন্থীরা তাদের বাতিল আক্বিদার প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হয় [জাহাঙ্গীরের স্ত্রী] সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের মাধ্যমে। এদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলে সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি নির্দেশনা জারি করলেন যে, সকল প্রজা তার সম্মুখে সিজদাবনত হতে হবে।

হযরত ইমামে রব্বানি এর বিরোধিতা করেন। তিনি যখন সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তিনি মাতা নতো করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো সম্মানে সিজদা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রথমে হযরত সিরহিন্দীকে হত্যার নির্দেশ দেন। তবে ব্যাপারটি নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা শেষে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তাঁকে গোয়ালিওর কিল্লার উদাইন জেলে প্রেরণ করেন। দীর্ঘ দু বছর তিনি জেলে ছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন ও হযরতের মুক্তি

একদা সম্রাট জাহাঙ্গীর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আঙ্গুল মুবারকে কামড় দিয়ে সম্রাটকে বললেন, “হে জাহাঙ্গীর! কী মহান এক ব্যক্তিকে তুমি জেলে রেখেছো!” এ স্বপ্ন দেখার পরই সম্রাট হযরত আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহকে মুক্তি দিলেন ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তবে, হযরতের দুশমনদের প্ররোচনায় সম্রাট তাঁকে কিছুদিনের জন্য রাজ্যের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করেন। এটাও এক ধরনের শাস্তি হওয়া সত্ত্বেও শায়খ সিরহিন্দী এর সদ্ব্যবহার করেন। তিনি স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে মাঝে মধ্যে ওঠাবসার সুযোগ পেয়ে ধীরে ধীরে তাকে ইসলাম ও তাসাওউফের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম হন। আধ্যাত্মিক এই চিকিৎসা লাভ করে সম্রাট জাহাঙ্গীর শেষপর্যন্ত হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ হয়ে শিষ্যত্ববরণ করেন। অবশেষে রাজ্যের মধ্যে বিস্তৃত অনৈসলামিক কার্জকলাপ নির্মূলে স্বয়ং সম্রাটই সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন। যে বাদশাহ একদিন নির্দেশ দিয়েছিলেন, সকল প্রজাদেরকে তার সম্মুখে সিজদা দিতে, সেই বাদশাহই মৃত্যুকালে বললেন, “আমি এমন কোনো কাজ করি নি যার জন্য মুক্তি পেতে পারি। তবে

একটি আবেদন করতে পারবো মহান আল্লাহর নিকট। সেটা হলো: শায়খ আহমদ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাত দান করেন তাহলে আমি তোমাকে ছাড়া সেথায় যাবো না।'''[45]

তাঁর সময়ে বিদআতের অন্ধকারে সমগ্র উপমহাদেশ ছেয়ে গিয়েছিল। সুন্নাতের নূর নিভু নিভু অবস্থায় চলে যায়। হযরত সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর মতো যুগশ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ ও মুজাদ্দিদের আগমন এসময় না ঘটলে এ উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা যে কোন পর্যায়ে যেয়ে অধঃপতিত হতো তা কল্পনাতীত। মুসলিম নামধারী মোগল সম্রাটরা জেনে বা না জেনে ইসলাম ও সুফিদের প্রতিষ্ঠিত খানক্কাসমূহ সমূলে ধ্বংস করে দিচ্ছিলেন। কিছু উলামাও বলতে শুরু করেন, ''শরীয়ত ও তরিকত ভিন্ন জিনিস। এদের আইন-কানুনও একটি অপরটি থেকে ভিন্ন।''

হযরত সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ কিন্তু স্বরবে ঘোষণা দিলেন: ''তরিকত হচ্ছে শরীয়তের সহায়ক আভ্যন্তরীণ দিক। এ দুটো একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শরীয়তের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবি। শরীয়তের একটি নির্দেশের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা হাজার বছরের রিয়াজত থেকেও উত্তম। যদি সুন্নাত অনুসরণের নিয়তে দুপুরে কিছুক্ষণ কেউ নিদ্রামগ্ন হয়, তাহলে সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার থেকেও বেশি উপকারী হবে। সুফিদের আমল হালাল কিংবা হারামের প্রমাণ নয়। প্রমাণ আসে একমাত্র কুরআন-হাদিস থেকে, সুন্নাহ এবং ফিকাহ শাস্ত্র থেকে। পথভ্রষ্ট মানুষের রিয়াজত তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

মোটকথা, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহ শরীয়ত ও তরিকতের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। তিনি দেখালেন শরীয়ত হচ্ছে ইসলামের বাহ্যিক আমল এবং তরিকত হচ্ছে আভ্যন্তরীণ আমল। উভয়টির সমন্বয় সাধন ছাড়া আল্লাহর নৈকট্যলাভ সম্ভব নয়। তাঁর পূর্বসুরী ইমাম গাযালী [১০৫৮-১১১১ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও অনুরূপ সামঞ্জস্যসাধন করেছিলেন ৫ শতাধিক বছর পূর্বে।

---

[45] শায়খ কামরুজ্জামান ইলাহাবাদী রচিত 'আক্বওয়ালে সালাম', খ. ৫, পৃ. ১১০।

হযরতের মূল্যবান বাণী

১. মুল্লা মুহাম্মদ লাহোরী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আলাপকালে তিনি বললেন, "শরীয়াহ মূলত তিনভাগে বিভক্ত: (ক) জ্ঞান [ইলম], ২. আমল এবং ৩. আন্তরিকতা [ইখলাস]। এই তিনটি অংশ যতোক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হবে না- শরীয়াহও ততক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর যখন শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টিও লাভ হয়। আর এটাই হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাতে সর্বাধিক উত্তম সৌভাগ্য। তরিকত ও হাক্বিক্বাত যার দ্বারা সুফিরা নিজেদেরকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছেন, উভয়টি হচ্ছে শরীয়তের সহায়কশক্তি। আর এরই মাধ্যমে তাঁরা ইহসান (আন্তরিকতা) লাভে ধন্য হন। সুতরাং উভয়টি হচ্ছে শরীয়তে সফলতা লাভের উপায়।

২. সুলুকের রাস্তায় আধ্যাত্মিক স্তর ও পরমানন্দ, সূক্ষ্মতা ও উপলব্ধি মূল লক্ষ্য নয়। এসব অতিক্রম করেই আল্লাহর সন্তুষ্টির স্তরে উন্নীত হতে হবে। আর এটাই হচ্ছে সুলুকের সর্বোচ্চ স্তর।

৩. তরিকত ও হাক্বিকতের স্তরসমূহ অতিক্রম করার একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে ইহসানের অবস্থায় উপনিত হওয়া। আর ইহসান [আন্তরিকতা] দ্বারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

৪. যাদের দূরদৃষ্টির অভাব আছে তারাই আধ্যাত্মিক স্তর, পরমানন্দ ও কাশফ-কারামত অর্জনকে তাদের উদ্দেশ্য মনে করে। এরাই শরীয়তের উৎকর্ষতা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৫. একাকী বসে কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করার চেয়ে আমার কাছে আর কোনো শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান নেই।

৬. নফসের ইসলাহ ছাড়া মুক্তির পথ অবরুদ্ধ।

৭. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল মিথ্যা খোদার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। নফসের ইসলার জন্য এর চেয়ে উত্তম ও উপকারী আর কিছু নেই।

৮. যখনই তোমার নফস আনুগত্যহীন হবে, তখনই কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করে নিজের ঈমানকে পুনর্জীবিত করবে। হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা ঈমান তাজা হয়।"

৮. নিজের ইচ্ছাকে সংরক্ষণের সবচেয়ে বড়ো উপায় হচ্ছে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। তোমার ইচ্ছাকে প্রাপ্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর কালামে পাকে ইরশাদ করেন:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

-যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব। [১৪:৭]

৯. নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অপর আরেক উপায় হচ্ছে, অনবরত আল্লাহর দরবারে আবদার করতে থাকা। এতে করে সালিকের মুখ কখনও অপরূপ কা'বা থেকে অন্যদিকে ঘুরে যাবে না।

১০. আন্তরিক আবদার ও বিনয় যদি সম্ভব না-ও হয়, তথাপি বাহ্যিকভাবে এর ভান করো। যেমনটি হাদিসে এসেছে: "তুমি যদি কাঁদতে না-ও পারো, অন্তত কাঁদার ভান করো।"

১১. তাঁকে প্রায়ই শুনা যেতো একথা বলতে: "আমাদের চেষ্টা-সাধনা ও আমলের মূল্য কী? যা-ই হোক, তা অবশ্যই আল্লাহর দয়া। যদি কোনো উপায় থেকে থাকে তা-তো একমাত্র উভয় জাহানের সরদারের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম] অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। যাকিছু আল্লাহ তা'আলা দান করেন তা একমাত্র তাঁর নির্দেশ মানার কারণেই হয়ে থাকে। যাকিছু প্রাপ্তি থেকে আমরা বঞ্চিত তা অবশ্যই শরীয়তের নির্দেশনা অনুসরণের ঘাটতির কারণ।

১২. একদিন তিনি বললেন, "একদিন আমি ইস্তিঞ্জার জন্য প্রস্রাবখানায় প্রবেশ করি, কিন্তু ভুলবশত ডান পা আগে ঢুকাই। সংশোধনের জন্য পুনরায় সঠিক পদ্ধতিতে প্রবেশ ও বের হওয়ার পরও, এদিন আমি অনেক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হই।"

১২. একদিন তিনি সালেহ কাতলানীকে বললেন, "আমার থলে থেকে কিছু লবঙ্গ নিয়ে এসো।" সালেহ নিয়ে আসলেন ৬টি লবঙ্গ। হযরত এগুলোর দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে বললেন, "আমাদের সুফিরা এখনও জানেন না যে, একটি হাদিসে আছে: 'আল্লাহ হচ্ছেন একক যা বিজোড়- সুতরাং তিনি বিজোড় সংখ্যা ভালোবাসেন।'

১৩. তিনি বলেন, "সকল আধ্যাত্মিক স্তর অতিক্রম করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছি যে, শুরু থেকেই যেটুকু সম্ভব রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ করবে। এর ফলে তুমি দেখতে পাবে উপকার ও নূরানী ফলাফল। এরপর দেখবে জীবনের মিষ্টতা।"

১৪. তাঁর পুত্র খাজা মাসুম বিল্লাহর নিকট পত্র লিখেন: "প্রিয় পুত্র! পরীক্ষা হতে পারে তিক্ত ও বিস্বাদ। কিন্তু এরপরও এগুলো তোমার দিকে আসলে, মনে করো তা তোমার জন্য

আশীর্বাদ। বর্তমানে যদি তুমি সহজে অভিজ্ঞতা লাভ করো তাহলে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে আমল করতে থাকবে। অলসতার মধ্যে একটি মুহূর্তও নষ্ট করবে না। সময়কে তিনটি আমলের মধ্যে কাটাবে: ১. মহান কুরআন তিলাওয়াত। ২. নামাযে দীর্ঘ সূরা পাঠ। ৩. কালিমা তায়্যিবাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অনবরত জিকির। যে কোনো মুহূর্তে এ তিনটির যে কোনোটির মধ্যে নিজেকে জড়িত রাখবে। মনে রোখো 'লা' [না] শব্দটি দ্বারা আত্ম-উপাসনার অস্বীকৃতি বুঝায়। নিজের সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে দূরে ফেলে দেবে। নিজের ইচ্ছার আবদারও এক ধরনের আত্ম-উপাসনা।"

১৫. ক্বিলাজুল্লাহ বিন ক্বিলাজ মুহাম্মদ খানের নিকট প্রেরিত পত্রে তিনি লিখেছেন: "প্রিয় পুত্র! দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষা-নীরিক্ষার ক্ষেত্র। এর বাহ্যিক রং-রূপটি সাজানো হয়েছে মিথ্যাবাদিতা দ্বারা। এর আকার হচ্ছে কাল্পনিক তিল, রেখা, চুল ও গালের সৌন্দর্যকরণ। যখন কেউ দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি দেয়, মনে হয় এটি মিষ্টি ও সতেজ। বাস্তবে এটি একটি মরদেহ যাকে সুগন্ধি দ্বারা আবৃত করা হয়েছে। এটা একটি ধবংসপ্রাপ্ত গৃহ, যা মাছি ও কীট-পতঙ্গে পরিপূর্ণ। এটা একটি মরীচিকা যা নিবেদন করে কাল্পনিক সুপেয় পানীয়ের। এটা চিনি যাতে মেশানো আছে বিষ। এর অভ্যন্তর পূর্ণাঙ্গ ধ্বংসস্তুপ ও নির্জীব। তার মধ্যে আবর্জনা থাকা সত্ত্বেও সে মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর। যারা এরূপ দুনিয়ার প্রতি লালায়িত তারা উন্মাদ ও মোহিত। যারা এর ভালোবাসার ফাঁদে আটকা পড়েছে, তাদের আত্মচেতনা লোপ পেয়েছে। তারা প্রতারিত হয়েছে। যে কেউ এর বাহ্যিক চাকচিক্যের মধ্যে আটকা পড়েছে সে চিরকালের জন্য ক্ষতিতে পেড়ে গেছে। যে কেউ তার লোলুপদৃষ্টি এর মিষ্টতা ও সতেজতার পানে দিয়েছে, তার সম্মুখে হাজির হয়েছে চিরন্তর অনুতাপ।"[46]

[বাকি বাণীগুলোর সূত্র 'আকওয়ালে সালাফ', খ. ৫, পৃ. ১১৭-১২২]

১৬. **হানাফি মাজহাবের গুণাবলী**: তিনি বলেন, আমি নিঃসংকোচে বলছি, হানাফি মাজহাবে যেসব নূরান্বিত দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান তা একটি মহাসাগরের মতো। অন্যান্য মাজহাব এর সম্মুখে যেনো পুকুর ও নদী।

[46] মাশাইখে নকশবন্দ মুজাদ্দিদ।

১৭. **ভারতে নবীদের মিশন:** তিনি বলেছেন, আমার নিকট এটা উন্মোচন হয়েছে যে, অনেক নবীদের আগমন ঘটেছে এই ভারতবর্ষে। যদি ইচ্ছে করি তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি তাঁদের কর্মস্থল ও সমাধিস্থল। তাঁদের সমাধিগুলো থেকে এখনও আল্লাহর নূর চতুর্দিকে ঔজ্জ্বল্যতা ছড়াচ্ছে।[47]

১৮. **খিলওয়াত লাভ:** আমি একদা মানুষের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত করে খিলওয়াত [নির্জনবাস] অবলম্বন করি। সেখানে আমি ইস্তিখারা করলাম। জবাব আসলো, তোমার জন্য উত্তম হচ্ছে বর্তমানে যেভাবে আছো সেভাবে লোকালয়ে থাকবে।

১৯. **নিয়তের বরকত:** তিনি বলেন, এক রাতে এটা আমাকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, কেউ যদি নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিতর নামাজ তাহাজ্জুদের পরে পাঠ করার নিয়ত করে, তাহলে তার আমলনামায় সারারাতব্যাপী ইবাদতের নেকি লেখা হবে। সুতরাং বিতর নামায যতো দেরিতে সম্ভব আদায় করার নিয়ত করা উত্তম। [জানা থাকা দরকার যে, কেউ যদি মনে করেন তাহাজ্জুদের সময় জেগে উঠতে পারবেন না, তাহলে তাকে ইশার পরই বিতর পড়ে নেওয়া উত্তম।]

২০. **আল্লাহর পবিত্র নামের প্রতি শ্রদ্ধা:** একদিন হযরত রাহিমাহুল্লাহ প্রস্রাবখানায় যেয়ে দেখেন এক টুকরো ভাঙ্গা পাত্র পড়ে আছে। তিনি লক্ষ করলেন, পাত্রের মধ্যে আরবিতে 'আল্লাহ' নামটি খোদাই করা। তিনি সাথে সাথে এটি হাতে তুলে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, আমাকে কিছু পানি দাও। খাদিমরা বার বার বললেন, হযরত! আমরাই এটা ধৌত করে দিচ্ছি। কিন্তু তিনি নিজের হাতে ধৌত করলেন। পাত্রের টুকরোটি পরিষ্কার করার পর একখানা সাদা কাপড় দ্বারা মুড়িয়ে দিলেন। এরপর শ্রদ্ধাভরে উঁচু একটি তাকে রাখলেন। পানি পান করার সময় এই ভাঙ্গা পাত্রটি তিনি বহুদিন ব্যবহার করেছেন। একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবি আওয়াজ শুনলেন, "হে আহমদ! তুমি যেভাবে আমার নামকে শ্রদ্ধা করলে আমিও সেভাবে তোমার নামকে দুনিয়া-আখিরাতে বুলন্দ করে দিলাম।"

[47] আওয়ারুল আরিফীন, খ. ২, পৃ. ১৬০।

ইমামে রব্বানি রাহিমুহুল্লাহর খলিফাবৃন্দ

হযরতের নিকট থেকে ইযাজতপ্রাপ্ত ঠিক কতোজন খলিফা ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে বিভিন্ন সুত্র থেকে প্রাপ্ত ৬৩ জন প্রসিদ্ধ খলিফার নাম নিচে লিপিবদ্ধ করছি।

১. খাজা মুহাম্মদ ফারুক সাদিক্ব ফারুকি সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০২৫ হি. মাত্র ২৫ বছর বয়সে]। তিনি ছিলেন হযরতের প্রথম পুত্র।

২. খাজা মুহাম্মদ সাঈদ ফারুকি সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৭০ হি.]। হযরতের দ্বিতীয় পুত্র।

৩. খাজা মুহাম্মদ মাসুম ফারুকি সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৭৯ হি.]। হযরতের তৃতীয় পুত্র।

৪. সাইয়্যিদ মীর মুহাম্মদ নু'মান ওরফে মীর বুলবুল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১০৫৮ হি.]

৫. শায়খ মুহাম্মদ তাহির লাহোরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৪০ হি.]

৬. শায়খ বদিউদ্দিন সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৭. শায়খ নূর মুহাম্মদ পাঠনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৮. শায়খ হামিদ বাঙ্গালি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৯. শায়খ মুজাম্মিল সুরাটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১০. শায়খ মুহাম্মদ তাহির বাদাখশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১১. শায়খ মাওলানা ইউসুফ সমরকন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১২. শায়খ মাওলানা আহমদ বারকী আফগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৩. শায়খ হাসান বারকী আফগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৪. শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৫১]।

১৫. শায়খ আবদুল হাই সাদমানী হিসারী পাঠনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৭০]।

১৬. শায়খ মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ ক্বাদিম তালিক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৭. শায়খ মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ জাদিদ তালিক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৮ শায়খ মাওলানা আবদুল হাদি ফারুকী বাদাইউনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৪১ হি.]।

১৯. শায়খ হাজী খিজির খান আফগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৩৫ হি.]।

২০. শায়খ আহমদ দিবানী সাহারানপুরী বাঙ্গালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২১. শায়খ করিমুদ্দিন ওরফে আবদুল করিম বাবা হাসান-আবদালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৫০ হি.]।

২২. শায়খ মাওলানা আমানুল্লাহ লাহোরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৩. শায়খ সাইয়্যিদ আদম বিন্নৌরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৪. শায়খ সালিম খান সিপাহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৫. শায়খ মাওলানা হামিদুদ্দিন আহমদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৬. শায়খ মাওলানা ফররুখ হুসাইন লাহোরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৭. শায়খ মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ লাহোরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৮. শায়খ সাইয়্যিদ মুহিবুল্লাহ মানিকপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৯. শায়খ জাইনুদ্দিন তাবরিযী শাফিঈ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩০. শায়খ আলী তাবরিযী শাফিঈ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৩১. শায়খ সুফি কুরবান আরকাঞ্জী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩২. শায়খ মাওলানা কাসিম আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৩. শায়খ ইউসুফ বারকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৩৪ হি.]।

৩৪. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে হাজর হাইসামী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৫. শায়খ মাওলানা সফর আহমদ রুমী সামাওয়াতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৪০]

৩৬. শায়খ মাওলানা গাজি গুজরাটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৭. শায়খ আবদুর রহমান বারকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৮. শায়খ খাজা মুহাম্মদ আশরাফ কাবুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৯. শায়খ খাজা মুহাম্মদ সালিহ নিশাপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪০. শায়খ বদরুদ্দিন সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪১. শায়খ মাওলানা আবদুল হাকিম শিয়ালকোটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪২. শায়খ খিজির বাহলুল সুরাটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪৩. শায়খ সাইয়্যিদ শাহ মুহাম্মদ সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪৪. শায়খ খাজা মুহাম্মদ সাদিক্ব কাবুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০১৮ হি.]

৪৫. শায়খ সাইয়্যিদ হাজী শাহ হুসেইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৪৬. শায়খ খাজা উবাইদুল্লাহ ইবনে খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৭৩]।
৪৭. শায়খ খাজা আবদুল্লাহ ইবনে খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ.১০৭৪]।
৪৮. শায়খ হাফিজ মাহমুদ লাহোরী গুজরাটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৪৯. শায়খ খাজা মুহাম্মদ হাশিম কিশমী বুরহানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫০. শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ সালিহ কুলাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৩৮]। ‘বিদিয়াতুত তালিবীন’ গ্রন্থের লেখক।
৫১. শায়খ সালিম বিন্নৌরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫২. শায়খ সালিম খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫৩. শায়খ মুহাম্মদ চিতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫৪. শায়খ দাউদ সালিকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫৫. শায়খ মুহাম্মদ তিহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫৬. শায়খ হামিদ তিহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫৭. শায়খ সুফি কুরবান কাদিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫৮. শায়খ সুফি কুরবান জাদিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫৯. শায়খ মাওলানা হাশিম কাদিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৬০ শায়খ সাইয়্যিদ বাকির সারংপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৬১. শায়খ মাওলানা ফারুক হুসাইন হারউই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৬৮]।
৬২. শায়খ মাওলানা হাজী মুহাম্মদ জাকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৬৩. শায়খ মাওলানা আবদুল গফুর সমরকন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

সন্তানাদি

হযরত ইমামে রব্বানি রাহিমাহুল্লাহর মোট ১০ জন সন্তানাদি ছিলেন। নিচে তাঁদের নাম ও তথ্যাদি উল্লেখিত হলো।

১. হযরত খাজা মুহাম্মদ সাদিক ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০০-১০২৫ হি.]। তিনি ইমামে রব্বানির প্রথম পুত্র ছিলেন। অল্প বয়সে মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সিরহিন্দে সমাহিত হয়েছেন।

২. হযরত খাজা মুহাম্মদ সাইয়্যিদ ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১০০৫-১০৭০ হি.]। হযরত ইমামে রব্বানির দ্বিতীয় পুত্র। তিনি সিরহিন্দে সমাহিত আছেন।
৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সুম ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১০০৭-১০৭৯ হি.]। তিনি ছিলেন হযরত সিরহিন্দীর তৃতীয় পুত্র। স্বীয় পিতার খলিফা ছিলেন। সিরহিন্দে সমাহিত আছেন।
৪. হযরত মুহাম্মদ ঈসা ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। অল্প বয়সে মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন [১০২৪]। তিনিও সিরহিন্দে সমাহিত আছেন।
৫. হযরত মুহাম্মদ ফারুক ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনিও ছোটবেলায় মহামারির কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন [১০২৪ হি.]। সিরহিন্দে সমাহিত আছেন।
৬. হযরত মুহাম্মদ আশরাফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। শিশু থাকতেই মারা যান।
৭. হযরত খাজা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৮. হযরত রুক্বিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহা। শিশুকালে মৃত্যুবরণ করেন।
৯. হযরত উম্মে খলসুম রাহমাতুল্লাহি আলাইহা। তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ, ১০২৫ হি. ইন্তিকাল করেন। তিনি মহামারিতে আক্রন্ত হয়েছিলেন। হযরতের এই মেয়ের হৃদয়ে জিকরুল্লাহ স্থায়ী ছিলো। মৃত্যকালেও তাঁর মুখ থেকে আল্লাহর জিকির থামে নি। শিশু থাকাবস্থায়ই তাঁর মধ্যে কাশফ-কারামত প্রকাশ পেয়েছিল।
১০. হযরত খাদিজা ভানু রাহমাতুল্লাহি আলাইহা। তিনি শায়খ আবদুল কাদির ফারুকী (ইমামে রব্বানির ভাতিজা) রাহিমাহুল্লাহর স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের তিনজন পুত্র ও সাতজন কন্যাসন্তান ছিলেন। তাঁর পুত্রদের নাম ছিলো শায়খ গোলাম মুহাম্মদ, শায়খ আবদুল লতিফ ও শায়খ ফজলুল্লাহ।

ইমামে রব্বানির ইন্তিকাল

হিজরি ১০৩৩ সনের জিলহজ্জ মাসের মাঝামাঝি তিনি অসুস্থ হয়ে পাড়েন। প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হন। প্রত্যহ শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। একদিন বললেন, "আমি হযরত পিরানে পীরকে [খাজা বাক্বি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ] স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমার প্রতি খুব মেহেরবান ছিলেন।"

মুহাররম মাসের ১২ তারিখ তিনি বললেন, "আমি এই অস্থায়ী দুনিয়া থেকে ৪০ থেকে ৫০ দিনের ভেতর বিদায় গ্রহণ করবো।" সুতরাং তাই হলো। যুগের শ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ, মুজাদ্দিদে আলফে সানি, ইমামে রব্বানি, বাতিলের আতঙ্ক, দ্বীনে ইলাহীর নির্মূলকারক, ইলমে শরীয়ত ও তাসাওউফের সাগর, দ্বীন ও শরীয়তের সংস্কারক হযরত আহমদ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন তাঁর লক্ষ-লক্ষ ভক্ত-মুরিদান, খলিফাবৃন্দ ও মুসলিম জনতাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে এ মায়াবী ধরা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। সে দিনটি ছিলো ২৮শে সফর, ১০৩৪ হিজরি। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি রাসূলের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সুন্নাত মুতাবিক ৬৩ বছর এ পৃথিবীর জমিনে জীবিত ছিলেন। তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন দ্বিতীয় সাহেবজাদা খাজা মুহাম্মদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি নিজ জন্মস্থান পাঞ্জাবের সিরহিন্দে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরতের গোপন রহস্যাবলী সংরক্ষণ করুন। আমীন।

নূর আসে নূরান্বিত ব্যক্তির নিকট থেকে;
হৃদয় প্রাপ্ত হয় এক ধরনের হর্ষ।
মূসার [আ.] সংকল্প প্রথমেই প্রয়োজন;
তাহলেই তুমি যাবে ও পাবে সিনাই পর্বত।
যে কেউ ভয় না করে পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার;
অবশ্যই পৌঁছুয়ে যাবে সৈকতে।
তাহলে, কী হবে যদি আমি ভুলে যাই স্বগৃহে যেতে?
একটি চোরও হৃদয়ের আয়নার অধিকারী হয়।
'আনিস যাকিছু পেয়েছে দুনিয়াদারের সুহবতে থেকে;
তা শুধু শুধু অহমিকা ও ঔদ্ধত্য ছাড়া কিছু আর নয়।[48]

[48] আলহাজ্জ আনিস পুকাশবী ইলাহাবাদীর সৌজন্যে- মাশাইখে নকশবন্দ, ইংরেজি অনুবাদ থেকে, পৃ. ১০৮।

হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পরবর্তী নকশবন্দী কয়েকজন মাশাইখের জীবন ও সাধনা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহে আমরা নকশবন্দি তরিকার মূল সিলসিলার সকল শাইখুল মাশাইখের জীবনালোচনা ইতোমধ্যে সমাপ্ত করেছি। আধুনিক যুগ পর্যন্ত আগত ভারত উপমহাদেশসহ পুরো বিশ্বব্যাপী প্রায় সকল নকশবন্দি শায়খের সিলসিলা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহ ও তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। আমাদের প্রাথমিক ইচ্ছে ছিলো সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর জীবনালোচনার মাধ্যমেই এ গ্রন্থের সমাপ্তি হবে। কিন্তু ১০৩৪ থেকে ১৪৪০ হিজরি একটি দীর্ঘকাল। এ চার শতাব্দিরও অধিক সময়ের মধ্যে অনেক যুগশ্রেষ্ঠ নকশবন্দি ওলির জন্ম হয়েছে, ঠিক যেরূপ একই কথা সত্য অন্যান্য তরিকার ক্ষেত্রেও। সুতরাং কলেবর বিরাটাকারে বৃদ্ধি পাবে, সেটা উপেক্ষা করেও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ-পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ নকশবন্দি মাশাইখের জীবন ও কর্মের ওপর যেটুকু সম্ভব আলোচনা করবো। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

খাজা মুহাম্মদ মা'সুম ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ - ১০৭৯ হিজরি, সমাধি- সিরহিন্দ, পাঞ্জাব, ভারত।

তিনি ছিলেন ইমামে রব্বানি হযরত শায়খ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর তৃতীয় পুত্র ও তরিকতের খলিফা। হযরত মুহাম্মদ মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয় ১০০৭ হিজরি সনে ভারতের সিরহিন্দে। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি স্বীয় পিতার মুরিদ হন।

খাজা মুহাম্মদ মা'সুম রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "আমার সকল উপাসনা, তা ফরয কিংবা নফল হোক, আরশে আজিমের নিকটে হয়ে থাকে।"

খলিফা ও বংশধর

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়, খাজা মুহাম্মদ মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর নয়জন সন্তানাদি ছিলেন। মুরিদদের সংখ্যা ছিলো লক্ষাধিক। এদের মধ্যে অনেক খলিফাও ছিলেন। বিভিন্ন লেখায় তাঁর খলিফাদের বড়ো তালিকা প্রকাশ হয়েছে। স্বীয় ছয় পুত্রকেও তিনি খিলাফত দান করেন।

হযরতের অসংখ্য খলিফাদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও উচ্চ পর্যায়ের মাশাইখ। নিচে আমরা তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করছি।

১. হযরত খাজা মুহাম্মদ সিবগাতুল্লাহ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১১২২ হি.)। হযরতের বড়ো পুত্র।
২. হযরত খাজা মুহাম্মদ নকশবন্দ ওরফে হুজ্জাতুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১১১৫ হি.)। হযরতের দ্বিতীয় পুত্র।
৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১০৮৩ হি.)। হযরতের তৃতীয় পুত্র।

৪. হযরত খাজা মুহাম্মদ আশরাফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১১১৮ হি.)। হযরতের চতুর্থ পুত্র।

৫. হযরত খাজা মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১০৯৬ হি.)। হযরতের পঞ্চম পুত্র।

৬. হযরত খাজা মুহাম্মদ সিদ্দীক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১১৩১ হি.)। হযরতের ষষ্ঠ পুত্র।

৭. হযরত হাফিজ মুহাম্মদ মুহসিন দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১১৪৭ হি. [আনুমানিক])।

৮. হযরত মাখদুম আদম তাত্তাবী সিন্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১১ শতক হি.)

৯. হযরত শাহ ফাতহুল্লাহ নকশবন্দী মুজাদ্দিদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১১ শতক হি.)।

১০. হযরত শায়খ মুহাম্মদ মুরাদ কাশ্মীরী শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১১২৫ হি.)।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব [১০২৭-১১১৮ হি.] ও খাজা মুহাম্মদ মা’সুম

তখন ভারতে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামল। অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, ধর্মিক, পরহেজগার সম্রাট ছিলেন আওরঙ্গজেব। শাহজাদা থাকাবস্থায়ই তিনি হযরত খাজা মা’সুম রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ হন। হিজরি ১০৭৯ সনে খাজা সাহেবের ইন্তিকালের পরও সম্রাট আওরঙ্গজেব ইমামে রব্বানি সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর পরিবারের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। খাজা মা’সুম রাহিমাহুল্লাহর সুফি-দরবেশ সন্তানাদির প্রতিও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ-অনুরাগ ছিলো।

ইমাম মা’সুম রাহিমাহুল্লাহ আওরঙ্গজেবকে শুধুমাত্র মুজাদ্দিদী তরিকায় দীক্ষা দেন নি, সম্রাটের একজন শরীয়াহ উপদেষ্টা হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ কারণেই মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সমগ্র সম্রাজ্যব্যাপী শরীয়াহ শাসন কায়েম করেছিলেন। হযরতের পুত্র খাজা সাইফুদ্দিনকে দিল্লীতে শরীয়াহ বোর্ডের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ শুধুমাত্র সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন না, বরং সে যুগের মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ মুসলিম সুলতান ও শাসকগণ তাঁর মুরিদ হয়েছিলেন। সবাই তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন বিনাবাক্যে।

লেখালেখি

হযরত খাজা মা'সুম রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হয়েছে। হযরতের 'মাকতুবাত' তিন খণ্ডে ফার্সি ভাষায় সংকলিত হয়েছে। এর বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি অনুবাদও হয়েছে পরবর্তীতে। 'রিসালা মা'সুমিয়াহ' নামক একটি গ্রন্থে হযরতের দৈনিক সুন্নাহ ও দুআ সংকলিত হয়েছে। এটি ফার্সি ভাষায় রচিত। 'হাসানাতুল হারামাইন' নামক আরেকটি কিতাব ফার্সি ভাষায় রচিত হয়েছিল। এতে হারামাইন শরীফাইনে ভ্রমণকালীন হযরতের মুশাহিদাত বা আধ্যাত্মিক কাশফসমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটির লেখক তাঁর পুত্র খাজা মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ। গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ ইকবাল মুজাদ্দিদী।

হযরত মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

মহান আল্লাহর সৃষ্ট এ অস্থায়ী দুনিয়া থেকে একদিন সবাইকে পাড়ি জমাতে হয় অনন্ত জীবনের দিকে। যুগের শ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ হযরত শায়খ মুহাম্মদ মা'সুম সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহও একদিন তাঁর অসংখ্য মুরিদ, খলিফা ও ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে দুনিয়ার মায়া ছেড়ে চলে যান চিরতরে তাঁর মাহবুবের সান্নিধ্যে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ৯ রবিউল আউয়াল, ১০৭৯ হিজরি সনে বিদায়গ্রহণ করেন। ইন্তিকালের পূর্বের রাতে সিরহিন্দের প্রত্যেক ঘরে ঘরে এক গায়েবি আওয়াজ শুনা যায়: "আগামীকাল ভোরো এ জগতের 'ক্বাইউম' এ মায়াবী ধরা থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে চলে যাবেন চিরন্তন জগতে।"

শায়খ মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন সিরহিন্দী ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
ওফাৎ- ১০৯৬ হিজরি, সমাধি- সিরহিন্দ, পাঞ্জাব, ভারত।

তিনি ছিলেন খাজা মুহাম্মদ মা'সুম সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর ৫মে পুত্র। যদিও তাঁর অন্যান্য পুত্রগণও নকশবন্দী-মুজাদ্দিদী তরিকার উচ্চ পর্যায়ের শায়খ ছিলেন, তথাপি শায়খ সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর সিলসিলাই হচ্ছে সর্বাধিক প্রশস্ত ও অনুসরণীয় নকশবন্দী তরিকা। আজকের নকশবন্দী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সংযোগ তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

হযরত খাজা সাইফুদ্দিন ফারুকী সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ ১০৪৯ হিজরি সনে সিরহিন্দে জন্মগ্রহণ করেন।

স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেবকে তিনি মুরিদ করেন। তাঁর 'মাকতুবাত'-এ ১৮টি পত্র লিপিবদ্ধ আছে। এগুলো তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি লিখেছিলেন। ভারতে ইসলামী শরীয়াহ আইন প্রবর্তনে তিনি সম্রাটকে সহযোগিতা দান করেন।

একটি ঘটনা

হযরত মির্জা মাজহার জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, একদিন শায়খ সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে গভীর রাতে জেগে ওঠলেন। এ সময় বাইরে কোথাও থেকে বাঁশির সুর তাঁর কানে ভেসে আসলো। তিনি এতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর হাতে ব্যথা পেলেন। এরপর বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলো। তিনি বললেন, "মানুষ আমাকে দুস্তর বলে অভিযোগ করে থাকে। বাস্তাবে তারাই হচ্ছে দুস্তর, কারণ তারা সুরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে আত্মহারা হয় না।"

তিনি সিরহিন্দের খানকায় তাঁর পিতা হযরত খাজা মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর জন্মদিন একাকী পালন করতেন। তিনি তাঁর কবরকে জাঁকজমকপূর্ণ সমাধিস্থলে পরিণত করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের বোন শাহজাদী রওশনারা বেগম [মৃ. ১০৮২ হি.] এ প্রজেক্টে আর্থিক

সহায়তা ও পৃষ্ঠাপোষকতা করেছিলেন। শাহজাদী রওশনারা বেগম হযরত সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর একজন মুরীদাও ছিলেন। তিনি হযরতের সুদৃষ্টি হেতু উচ্চতর আধ্যাত্মিক মাক্বামের অধিকারী হন। অন্যান্য মহিলাদের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে হযরত তাঁকে অনুমতিও দান করেন।

হযরত সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা ও দাদাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। প্রায়ই তিনি ইমামে রব্বানি হযরত আহমদ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর সমাধিস্থলে যেয়ে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করতেন খুব ভক্তভরে:

من کیستم که با تو دم بندگی زنم
چندین سگان کوئی تو یک کمترین منم

আমি কে, যে তোমার দাসত্বের দাবিদার হতে পারি?
আমি তো তোমার এখানকার নিকৃষ্ট কুকুর থেকেও অধম।

বংশধর

হযরতের আটজন পুত্রসন্তান ও ৬ জন কন্যাসন্তান ছিলেন। তাঁর বড়ো পুত্রের নাম ছিলো শায়খ মুহাম্মদ আজম রাহিমাহুল্লাহ। তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এছাড়া আরো তিনজন পুত্র সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণ করে নকশবন্দী শায়খ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। নিচে তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম।

১. শায়খ মুহাম্মদ আজম সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১১৪ হি.]। তিনি ‘ফাইযুল বারী শরাহ সহীহ বুখারী’ [এখন আর পাওয়া যায় নি] এবং অন্যান্য গ্রন্থের লেখক।
২. শায়খ মুহাম্মদ হুসাইন সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১১৬ হি.]।
৩. শায়খ মুহাম্মদ শুআইব সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১২১ হি.]।
৪. শায়খ মুহাম্মদ ঈসা সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫. শায়খ মুহাম্মদ মূসা সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৬. শায়খ কালিমাতুল্লাহ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৭. শাহ মুহাম্মদ উসমান সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৮. শাহ আবদুর রহমান সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত শায়খ মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর বেশ কয়েকজন খলিফা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্বীয় তিনজন পুত্র ছাড়াও প্রসিদ্ধ আরো ১১ জনের নামের তালিকা নিচে তুলে ধরছি।
১. সাইয়্যিদ নূর মুহাম্মদ বাদাইউনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১৩৫ হি.]।
২. মাখদুম ইব্রাহিম তাত্তাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাত্তা, সিন্ধু প্রদেশ।
৩. মাখুদম আবুল ক্বাসিম তাত্তাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১৩৮ হি.], তাত্তা, সিন্ধু প্রদেশ।
৪. মাখদুম মুহাম্মদ আশরাফ তাত্তাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাত্তা, সিন্ধু প্রদেশ।
৫. শাহ সিকান্ধর কাবুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৬. সুফি সদরুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৭. শায়খ আবুল ক্বাসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৮. শায়খ আব্বাস বাসতী কাবুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৯. শায়খ মাওলানা নাজমুদ্দিন সুলতানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর খলিফা মাওলানা বদরুদ্দিন সুলতানপুরী রাহিমাহুল্লাহর পুত্র।
১০. শায়খ আলী ইবনে আবদুল্লাহ আইদারুস ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনিই ইয়ামনে নকশবন্দী তরিকার প্রসার ঘটান।
১১. মোগাল শাহজাদী শায়খা রওশনারা বেগম রাহমাতুল্লাহি আলাইহা [মৃ. ১০৮২ হি.]।

হযরতের মাকতুবাত [পত্রাদি]

খাজা শায়খ সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ অনেকের নিকট পত্র লিখেছিলেন। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সভাসদগণের নিকটও তিনি নিয়মিত পত্র লিখতেন। এছাড়া সকল খলিফা এবং বিশিষ্ট মুরিদদের সাথেও পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন। হযরতের সুযোগ্য পুত্র শায়খ মুহাম্মদ আজম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ১৯০টি পত্র সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। এ সংকলনটি বিভিন্ন ভাষায় এখনো প্রকাশ হচ্ছে।

ইন্তিকাল

সবাইকে যে একদিন মায়াবী এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে, তা আমরা কেউই অনবগত নই। তবে গাফিলতির কারণে এ কথাটি অনেকেই ভুলে যাই। আল্লাহর ওলিদের ব্যাপার কিন্তু ভিন্ন। তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যই মৃত্যুর কথা ভুলেন না। কীভাবে ভুলবেন? আল্লাহর জিকির ও প্রেমে যাঁরা প্রতি মুহূর্ত আত্মহারা তাঁরা তো দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে মুক্ত। আখিরাতের চিরন্তন জিন্দেগীর দিকে পাড়ি জমাতে সদাউদগ্রীব। আল্লাহর বিশিষ্ট ওলি খাজা মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও একদিন পৃথিবীর মায়া ছেড়ে তাঁর চিরন্তন বাসস্থানের দিকে পাড়ি জমালেন। তারিখটি ছিলো ১৯ বা ২৬ জমাদিউল আউয়াল, ১০৯৬ হিজরি। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে স্মরণ করছি। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাক্বামাতকে উন্নীত করুন।

শায়খ সায়্যিদ নূর মুহাম্মদ বাদাইউনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ- ১১৩৫ হিজরি, সমাধি- দিল্লী [খাজা নিযামুদ্দিন আউলিয়া রাহিমাহুল্লাহর সমাধিপাশে], ভারত।

তিনি ছিলেন নকশবন্দি তরিকার একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান। আওলাদে রাসূল হিসেবে পরিচিত এই শায়খ মাত্র আঠারো বছর বয়সের মধ্যেই ইলমে শরীয়াহ তথা বাহ্যিক ইসলামী জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন মুহাম্মদ শরীফ [মৃ. ১১২৪]।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধানে

বাহ্যিক জ্ঞান ও আত্মিক জ্ঞান দুটি ভিন্ন বিষয়। প্রথমটিকে বলা হয় কিতাবী জ্ঞান ও দ্বিতীয়টি তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জ্ঞান। দ্বিতীয়টিকে জ্ঞান না বলে মা'রিফাত লাভের স্তরসমূহ বলাই হবে অধিক সঠিক। হযরত সায়্যিদ নূর মুহাম্মদ বাদাইউনী রাহিমাহুল্লাহ শরীয়তের জ্ঞান ও বাহ্যিক আমল দ্বারাই আধ্যাত্মিকভাবে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি সুলুকের পথে পাড়ি জমাতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। তাঁর সময় সিরহিন্দের শায়খ মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ যুগশ্রেষ্ঠ নকশবন্দি ওলিআল্লাহ ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁরই সুহবত লাভের আশায় সিরহিন্দে চলে যান।

শায়খ সাইফুদ্দিন সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর মুরীদ হয়ে নূর মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ তরিকতের প্রাথমিক সবক সমাপ্ত করেন। এরপর রিয়াজত-মুজাহাদা-মুরাক্বাবার স্তর অতিক্রম করে উন্নত মাক্বামে অধিষ্ঠিত হন। শায়খ সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে নকশবন্দি তরিকার খিলাফত প্রদান করেন। তবে তাঁর মুর্শিদ এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার ফলে অপর কারোর সুহবতে যেতে তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন। সুতরাং নকশবন্দি তরিকার তখনকার আরেক শায়খ হাফিজ মুহাম্মদ মুহসিন দেহলভী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে চলে গেলেন। হাফিজ সাহেব ছিলেন শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতি। এখানে থাকাবস্থায় তিনি কঠোর রিয়াজত-মুরাক্বাবায় নিমগ্ন হন। কথিত আছে, অধিক বেশি মুরাক্বাবা হেতু হযরতের পিঠ বাঁকা হেয়ে গিয়েছিল।

কাশফওয়ালা ওলি

কাশফ, কারামত ও ইলহাম অধিকাংশ ওলিআল্লাহর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যদিও এগুলো প্রকাশ পাওয়া বেলায়েতের কোনো শর্ত নয়। তবে আল্লাহ তা'আলা সময় সময় ওলিদের মাধ্যমে এগুলোর প্রকাশ-বিকাশ ঘটান। কেনো? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব আমাদের কাছে নেই। অসীম জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাবান মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলাই তা ভালো জানেন। তবে দেখা গেছে, অনেক সময় কাশফ, কারামত ও ইলহামী জ্ঞানকে ওলিরা মানুষের ইসলাহের ওয়াসিলা হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। আর এটা অবশ্যই আল্লাহর হুকুমে হয়ে থাকে।

যাক, হযরত সাইয়্যিদ নূর মুহাম্মদ বাদাইউনী রাহিমাহুল্লাহ একজন কাশফওয়ালা ওলিআল্লাহ ছিলেন। তিনি অতি সহজে তাঁর মুরিদানের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুধাবন করতে পারতেন। আধ্যাত্মিক রাস্তার ভ্রমণপথে সালিকের হৃদয় পাপ হেতু অন্ধকার হয়ে যায়। আবার পাপমুক্ত থাকলে আলোকিত হয়ে ওঠে। কাশফের মাধ্যমে নূর মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ জানতে পারতেন তাঁর মুরিদ কোন্ আমল করেছে। কয়েকটি ঘটনা দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

একদিন তাঁর এক মুরিদ বাদিউনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে এক সুন্দরী নারীর প্রতি তার চোখ পড়লো। মহিলার সৌন্দর্যে তিনি মোহিত হয়ে প্রথম দৃষ্টির পরও পুনরায় তাকালেন। এরপর মুর্শিদের সুহবতে আসলেন। হযরত বাদাইউনী রাহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, "ওহে! তুমি তো জিনার অন্ধকার দ্বারা পর্দাবৃত হয়ে পড়েছো! তুমি একজন নন-মাহরাম মহিলার দিকে স্বেচ্ছায় তাকিয়েছো।" মুরিদ তাঁর অপরাধ অকপটে স্বীকার করে তাওবাহ করে নিলেন।

একদিন তাঁর একজন খাদিম বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। সেখানে সাক্ষাৎ ঘটলো একজন মদপানে নেশাগ্রস্থ লোকের সঙ্গে। খাদিম ফিরে আসার পর শায়খ তাঁকে বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে এলকাহলের অন্ধকার! তুমি কী কোনো মদ্যপায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছো?" খাদিম হ্যাঁসূচক জবাব দিলেন। এরপর তিনি বললেন, "মনে রেখো, ফাসিক লোকজন নিসবতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।"

বিখ্যাত সুফি-দরবেশ শায়খ মির্জা মাজহার জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ হযরত নূর মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর একজন খলিফা ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "হযরত সাইয়্যিদ সাহেবের কাশফ এতোই শক্তিশালী ছিলো যে, কোনো কোনো সময় আমরা যা স্বচক্ষে দেখতে পারতাম না, তিনি তা তাঁর আধ্যাত্মিক চোখে দেখে ফেলতেন।"

ধর্মানুরাগ ও খোদাভীতি

পরহেজগারী ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে হযরত নূর মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর মতো অপর কেউ সে যুগে জীবিত ছিলেন কী না সন্দেহ আছে। তিনি কোনো সময়ই ধনীদের পরিবেশিত খাবার গ্রহণ করেন নি। কারোর নিকট থেকে কোনো বই-পুস্তক ধার করে আনার পর তিনদিন যাবৎ অপেক্ষা শেষে পাঠ করা শুরু করতেন। এর কারণ হিসেবে বলতেন, বই-পুস্তকও তিনদিন পর্যন্ত অপবিত্র থাকতে পারে।

ফয়েজ ও বরকত

হযরত খাজা নূর মুহাম্মদ বাদাইউনী রাহিমাহুল্লাহর ফয়েজ ও বরকত থেকে আজো লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। বর্ণিত আছে, তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ ইলইয়াস কান্ধলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই নূর মুহাম্মদ বাদাইউনী রাহিমাহুল্লাহর কবরপাশে যেয়ে ধ্যান-মুরাক্বাবা করতেন। এতে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হন।

ইন্তিকাল

খাজা নূর মুহাম্মদ বাদাইউনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরিদান ও আশিকীনদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে ১১ জিলকদ ১১৩৫ হিজরি সনে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি দিল্লীতে চিশতি শাইখুল মাশাইখ হযরত খাজা নিযামুদ্দিন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমাধির নিকটে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই মহান ওলির রহস্যাবলী সংরক্ষণ করুন এবং তাঁর মাক্বামাত আরো উন্নীত করুন।

খাজা মাখদুম আদম তাত্তাবী সিন্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ- ১১৩৫ হিজরি, প্রথম দিকে, সমাধি- মাকলি, তাত্তা, সিন্ধু প্রদেশ।

হযরত খাজা মাখদুম আদম তাত্তাবী সিন্ধী নকশবন্দী মুজাদ্দিদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন প্রথম নকশবন্দী মুজাদ্দিদী সুফি শায়খ যাঁর মাধ্যমে সিন্ধু প্রদেশে এ তরিকার বিকাশ ঘটে। তাঁর পূর্বে উল্লেখযোগ্য কোনো নকশবন্দী শায়খ সেখানে যান নি। তবে ইতোমধ্যে সেখানে উপমহাদেশের অপর তিনটি প্রসিদ্ধ তরিকা তথা চিশতি, কাদিরী ও সুহরাওয়ার্দি তরিকার প্রসার ঘটেছিল। সিন্ধু প্রদেশে 'মাখদুম' শব্দটি উপনিবেশিক সময়ের পূর্ব থেকেই মুসলিম আলিমদের ক্ষেত্রে সম্মানের উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিলো। ঠিক যেরূপ আজো 'মাওলানা', 'আল্লামা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাখদুম আদম রাহিমাহুল্লাহ সিন্ধুর তাত্তা নামক জনপদে একজন মুসলিম আলিম হিসেবে বসবাস করতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

পারিবারিক নসবনামা

হযরত তাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহর পূর্বপুরুষদের তালিকা [নসবনামা] নিম্নে তুলে ধরা হলো। মাখদুম আদম, পিতা মাখদুম আবদুল আহাদ, পিতা আবদুর রাহমান, পিতা আবদুল বাক্বি, পিতা মুহাম্মদ, পিতা আহমদ, পিতা আদম, পিতা আবদুল হাদি, পিতা মুহসিন, পিতা আলী, পিতা মুহাম্মদ, পিতা আবদুল খালিক্ব, পিতা মুহাম্মদ, পিতা আবদুল হাদি।

ইমাম মা'সুম ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে

হযরত মাখদুম আদম রাহিমাহুল্লাহ একজন সুলেখক ছিলেন। তিনি তাত্তায় উস্তাদ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি একবার শুনলেন, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর মুসলিম আলিমদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করেন ও তাঁদের দ্বারা দ্বীনি খিদমাত আঞ্জাম দিতে আগ্রহী। এ খবর জেনে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লীর পথে পাড়ি জমান। যাত্রাপথে সিরহিন্দে যাত্রাবিরতি করলেন।

সিরহিন্দে তখন অবস্থান করছিলেন হযরত ইমাম মুহাম্মদ মা'সুম ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ। ইমাম সাহেব আদম সাহেবের ইলম ও প্রজ্ঞায় অনুপ্রাণিত হন। তিনি তাঁকে অনুরোধ জানালেন, "এখানে অবস্থান করে আপনি আমার পুত্রদের লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।" তিনি এ অনুরোধ রক্ষা করলেন। সুতরাং দিল্লীতে না যেয়ে হযরত আদম তাত্তাবী সিরহিন্দেই হযরত মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থেকে গেলেন। এটা ছিলো ১০৭০ হিজরি সনের কথা। দিল্লীর সিংহাসনে আওরঙ্গজেব আরোহণ করেন এর এক বছর পূর্বে তথা ১০৬৯ হিজরি।

বেশ কিছুদিন চলে গেলো। আদম তাত্তাবী সাহেব লক্ষ করলেন, বেশ কিছু আলিম ও সাধারণ মানুষ হযরত মা'সুম ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে এসে আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল করে যাচ্ছেন। তিনি প্রাথমিক দিনগুলোতে এদিকে তেমন খিয়াল করেন নি। কারণ, তিনি ভাবতেন, নিজেই তো উচ্চ পর্যায়ের একজন আলিম। কুরআন, ইলমে হাদিস, ইলমে ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী। সুতরাং তাসাওউফের রাস্তায় পাড়ি জমানোর প্রয়োজন কী?

একদিন হযরত আদম রাহিমাহুল্লাহ স্বয়ং মা'সুম রাহিমাহুল্লাহকে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত সম্পর্কে ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। আয়াতগুলো হচ্ছে:

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا * فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا

-কসম ঝঞ্ঝাবায়ুর। অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের। অতঃপর মৃদু চলমান জলযানের, অতঃপর কর্ম বর্নণাকারী ফেরেশতাগণের। [৫১:১-৪]

ইমাম মা'সুম রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতমালার সঙ্গে আধ্যাত্মিক গোপন রহস্যাবলীর ব্যাখ্যা শুরু করলেন। একই সময় তিনি প্রশ্নকারীর হৃদয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক তাওয়াজ্জুহ দিতে থাকেন। হযরত তাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। হুঁশ ফিরে আসার পর তিনি হযরত মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "হযরত! আমি তো আসল জ্ঞান থেকে এতোকাল যাবৎ গাফিল ছিলাম। অনুগ্রহ করে এ অধমকে মুরিদ করে আপনার খাদিম হওয়ার সুযোগ দিন।"

খিলাফত লাভ

মুরিদ হয়ে হযরত মা'সুমের খিদমাতে আদম তাত্তাবী সাহেব দীর্ঘ ৭ বছর কাটিয়ে দেন। এসময় তিনি জিকির-মুরাক্বাবা ধ্যান-ফিকির ইত্যাদি আমলের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। তাত্তা থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা মাঝে মধ্যে পত্রাদি লিখতেন। কিন্তু আদম সাহেব ওগুলো খাম থেকেই খুলতেন না। তিনি ভীত ছিলেন যে, পত্রের মধ্যে যা আছে তা পাঠের ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় বাঁধার সৃষ্টি হবে।

সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর একদিন হযরত মা'সুম সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ হযরত তাত্তাবীকে ডেকে এনে বললেন, "হে আদম! তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা আধ্যাত্মিক উচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করেছেন। তুমি এখন থেকে খিলাফতের দায়িত্ব পেলে।" এরপর তিনি বললেন, "তোমার দেশে ফিরে যেয়ে তাসওউফের খিদমতে লেগে যাও।" প্রথমে মাখদুম আদম অনুরোধ জানালেন, "হযরত! সিন্ধুতে তরিকতের পীর-মুর্শিদ অনেক আছেন। আমার কাছ থেকে মানুষের আর কী শেখার আছে? আমি বরং আপনার খিদমতে থাকতেই অধিক আগ্রহী।" ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, "যদিও সেখানে অন্যান্য তরিকায় পীর-মুরিদীর চর্চা পরিপূর্ণ থেকে থাকে, তথাপি আমাদের নকশবন্দি তরিকার প্রসার ওখানে ঘটাতে হবে। মানুষকে এ তরিকার ফয়েজ-বরকত থেকে বঞ্চিত রাখা উচিৎ হবে না।" সুতরাং মুর্শিদের নির্দেশে আদম তাত্তাবী সাহেব সিন্ধুতে ফিরে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে একটি খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করে নকশবন্দী তরিকায় ইলমে তাসাওউফের খিদমতে লেগে যান।

হযরত তাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ ১০৭৭ হিজরি সনের দিকে সিন্ধুতে এসে খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খুব শীঘ্রই লোকজন দূর-দূরান্ত ও আশপাশ এলাকা থেকে তাঁর খানক্বায় এসে জড়োত হতে লাগলেন। ধনী, গরীব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত ইত্যাদি সব স্তর ও পেশার লোকজন এসে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। মানুষ তাঁকে খুব বেশি শ্রদ্ধা করতো। রাস্তায় হাঁটার সময় লোকজন তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতো। এমনকি অনেকে নিজের গায়ের চাদর তাঁর পদতলে বিছিয়ে দিতো।

আদম থেকে আদু

তাত্তায় বাস করতেন আরেক সুফি দরবেশ যার নাম ছিলো মাখদুম আদম ইবনে ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ। একদিন হযরত মাখদুম আদম নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, "আমার নাম পরিবর্তন করে 'আদু' রাখলে কেমন হয়? মানুষ তখন কোন শায়খকে সম্বোধন করছে তা স্পষ্ট হবে।" এর পর থেকেই তিনি 'মাখদুম আদু' নামে পরিচিত হন।

মাকতুবাতে পত্র সংকলন

সে যুগে পত্রযোগাযোগ ছিলো সর্বাধিক উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা। হযরত আদম তাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ প্রায়ই তাঁর মুর্শিদ হযরত মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর নিকট পত্র লিখতেন। মুর্শিদও তাঁর এ প্রিয় শাগরিদ ও খলিফার নিকট পত্রের উত্তর প্রেরণ করতেন। পরবর্তীতে হযরত মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর বিখ্যাত 'মাকতুবাত' গ্রন্থে তাঁর খলিফা তাত্তাবী সাহেবের প্রতি লিখিত চারখানা পত্র স্থান পেয়েছে।

মুর্শিদের ইন্তিকালের পর খাজা সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে

হিজরি ১০৭৯ সনে খাজা মুহাম্মদ মা'সুম সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। এ সংবাদে স্বভাবতই হযরত তাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ ভীষণভাবে মর্মাহত হন। তিনি সিরহিন্দে যেয়ে ভক্তিভরে স্বীয় পীরের কবর জিয়ারত করেন। এরপর মা'সুম রাহিমাহুল্লাহর পুত্র ও খলিফা শায়খ সাইফুদ্দিন সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর খিদমতে প্রায় চার বছর অতিবাহিত করেন। তিনি জিকির-মুরাক্বাবার মাধ্যমে আরও উন্নত আধ্যাত্মিক স্তরে উপনিত হন। হযরত সাইফুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহও অবশেষে তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন। এরপর হযরত তাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় জন্মস্থান সিন্ধু প্রদেশের তাত্তায় ফিরে এসে বাকি জীবন খানক্বায় অবস্থায় করেছেন। নকশবন্দি তরিকায় তিনি অসংখ্য মানুষকে সুলুকের রাস্তায় ধাবিত করে দ্বীনের খিদমত করেন।

একটি কারামত

একদা তাত্তার শাসক ও কাজি উভয়ে মিলে অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বিরাট মাত্রার গম মওজুদ করে রাখেন। ক্রমে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। আর গরীবরা গমের দাম অত্যধিক হওয়ায় ক্রয় করে খাবার গ্রহণে হিমশিম খেতে লাগলো। স্ত্রী-পুত্রাদি অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছিলো। সবাই মিলে শাসকের নিকট যেয়ে অভিযোগ তুললো। কিন্তু তিনি তাদের কথায় কান দিলেন না- কারণ, এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে তিনি নিজেও জড়িত ছিলেন।

অবশেষে মানুষ নিরুপায় হয়ে চলে আসলো হযরত মাখদুম আদম তাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায়। তাঁরা হযরতের নিকট সবকিছু খুলে বললো। হযরত মাখদুম আদম রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে আশু সমাধানের অনুরোধ জানিয়ে সাথে সাথে শাসকের নিকট পত্র লিখলেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না। হযরত তাত্তাবী মর্মাহত হলেন। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, “লোকসকল! আপনারা আজ রাতটি কোনোমতে কাটিয়ে দেন। আগামীকাল সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ!”

সবাই ভাবলো, তা কী করে সম্ভব? তবে তারা হযরত মাখদুম সাহেবের আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে অবগত ছিলো। রাতের বেলা শাসক ও কাজি উভয়ের প্রস্রাব পায়খানা বন্ধ হয়ে গেলো! পেট ফুলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো। ডাক্তারকে আনা হলো। কিন্তু শহরের কোনো ডাক্তারই রোগ ধরতে পারলো না। সুতরাং সারারাত তারা উভয়ে পেটের ব্যথায় চিৎকার দিলো। ভোরে ওঠেই উভয়ে ছুটে গেলো হযরত মাখদুম আদম সাহেবের দরবারে। তিনি বললেন, “তোমরা মানুষের জন্য গোদাম খুলে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।” তারা তা-ই করলো। সবাই ছুটে গিয়ে যার যতটুকু গমের প্রয়োজন নিয়ে আসলো। এদিকে শাসক ও কাজির প্রসাব-পায়খানা পুনরায় স্বাভাবিক হলো।

আরেকটি কারামত

হযরত মাখদুম আদম তাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকালের বেশ পরের ঘটনা। সিন্ধুর একজন নকশবন্দী শায়খ ছিলেন হযরত মাখদুম মুহাম্মদ জামান রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর একজন মুরিদের নাম ছিলো হাফিজ রহিম দিনু। তিনি বর্ণনা করেন, আফগান সেনাপতি মাদাদ খান পাঠান যখন সিন্ধু আক্রমণ করে ধ্বংসলীলা ঘটালেন, তখন সমগ্র প্রদেশব্যাপী ভীষণ অরাজকতা ও মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার্থে আমি ছুটে যাই হযরত মাখদুম আদম রাহিমাহুল্লাহর খানক্বাহ শরীফে। আমি সেখানে দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত ছিলাম। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি কিছুই ভক্ষণ করি নি! আমার পেটে কখনও ক্ষিদেই লাগে নি। প্রত্যহ বাদ-ইশা কয়েকটি ঢেকুর আসতো। এতেই বুঝতে পারতাম, আমার পেট খাদ্যে পরিপূর্ণ।

হযরত মাখদুম আদম রাহিমাহুল্লাহর সন্তানাদি

তাঁর চারজন পুত্রসন্তান ছিলেন। এদের মধ্যে দুজন পরিণত বয়সে তাঁদের সময়ের সুফি শায়খ হয়েছিলেন। এ দুজন হচ্ছেন:

১. হযরত শায়খ ফায়জুল্লাহ তাত্তাবী নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহ।

২. হযরত শায়খ মুহাম্মদ আশরাফ তাত্তাবী নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর পুত্র হযরত শায়খ মুহাম্মদ ওরফে আবদুল মাসাকিন তাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহও সিন্ধু প্রদেশের একজন উচ্চ পর্যায়ের সুফি ছিলেন।

খুলাফাবৃন্দ

হযরতের বেশ কয়েকজন খলিফা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ৫ জনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. হযরত মাখদুম আবুল ক্বাসিম নকশবন্দী তাত্তাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১৩৮ হি.]

২. হযরত মাখদুম শায়খ ইব্রাহিম রোহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩. হযরত শায়খ আনাস নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪. হযরত শায়খ ফতেহ মুহাম্মদ নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৫. হযরত শায়খ মাখদুম সাবির উইলহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরতের ইন্তিকাল

সবার মতো একদা এই মহাত্মন আধ্যাত্মিক সাধকও এ মায়াবী ধরা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি তাত্তার নিকটস্থ মালকি নামক স্থানে সমাহিত আছেন। হযরত মাখদুম আদম তাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর সঠিক দিন-তারিখ-সন জানা যায় নি। তবে অধিকাংশের মতে ১১৩৫ হিজরি সনের কোনো এক তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একদিন বললেন, ‘‘আমার কবরটি বেহেশতের একটি স্থান হবে।’’ আল্লাহ তা’আলা তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করুন।

শায়খ মির্জা মাজহার জানে জানান শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
ওফাৎ- ১১৯৫ হিজরি, সমাধি- খানক্বায়ে মাজহারিয়া, দিল্লী, ভারত।

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো, হযরত শাহ শামসুদ্দিন মাহবুব হাবিবুল্লাহ মির্জা মীর মাজহার জানে জানান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তবে তিনি মির্জা মাজহার জানে জানান নামেই সর্বাধিক সুপরচিতি। তিনি ছিলেন দিল্লীর নকশবন্দী সুফিদের অন্যতম। উর্দু ভাষার চারজন বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়।[49] তাঁর একটি উপাধি ছিলো 'সুন্নি তারাশ' [সুন্নাতের অনুসারী সৃষ্টিকারী]। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে তিনি কী পর্যায়ের সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে 'নকশবন্দিয়া মাজহারিয়া শামসিয়া' উপশাখার আবির্ভাব ঘটে।

জন্ম, শিক্ষা ও প্রাথমিক জীবন

হযরত মির্জা মাজহার জানে জানান শহীদ রাহিমাহুল্লাহ ১১ রামাদ্বান ১১১১ হিজরি [মতান্তরে: ১১১৩ হি. ১৬৯৯/১৭০১ ঈ.] সনে পাঞ্জাবের মালওয়ার কালাবাগ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁর পিতার নাম ছিলো মির্জা জান। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ সদস্য ছিলেন। সে যুগে একটি ঐতিহ্য ছিলো, সৈন্য-সামন্তের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সান্তানাদির নাম রাখতেন স্বয়ং সম্রাট। তাই জন্মের পর আওরঙ্গজেবের নিকট মির্জা জান তাঁর সুদর্শন পুত্রকে নিয়ে আসলেন। আওরঙ্গজেব বললেন:

"একটি পুত্রসন্তান হচ্ছে তার পিতার আত্মা। যেহেতু তার পিতার নাম হচ্ছে মির্জা জান, তাই তার নাম হবে জান-ই-জানান।"

হযরত মির্জা জানে জানানের প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন হাজী আফজল শিয়ালকোটি [হাদিস] ও হাফিজ আবদুর রশীদ দেহলবী [কুরআন]। ইলমে শরীয়তের শিক্ষা সমাপ্তি করেই তিনি ইলমে তাসাওউফ তথা সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

[49] অন্য তিনজন হচ্ছেন সাওদা, মীর তাক্বি মীর ও খাজা মীর দারদ।

তিনি প্রথমে নকশবন্দী শায়খ হযরত সাইয়্যিদ নূর মুহাম্মদ বাদাইউনী রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। চার বছর তাঁর পীরের সুহবতে থাকার পর তিনি খিলাফত লাভ করেন। পীর সাহেবের মৃত্যুর পরও তিনি দীর্ঘ ছয় বছর বাদাইউনে থেকে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভে নিমগ্ন থাকেন। অবশেষে একদিন তাঁর শায়খকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, কোনো জীবিত শায়খের সুহবতে যেতে।

সুতরাং তিনি বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত সে যুগের নকশবন্দী শায়খদের সুহবত লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয়ে গেলেন। যে কজন প্রসিদ্ধ শায়খের সুহবতে থেকে আধ্যাত্মিক সুফল লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে নিচে উল্লেখিত তিন জনের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

১. হাজি মুহাম্মদ আফজল শিয়ালকোটী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১১৪৬ হি. তিনি তাঁর হাদিসের উস্তাদও ছিলেন]। তিনি খাজা মুহাম্মদ সিরহিন্দী ও শায়খ আবদুল আহাদ ওয়াহদাত সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার খলিফা ছিলেন।

২. হযরত শায়খ সাদুল্লাহ [মৃ. ১১৫২] রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর খলিফা।

৩. শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সুন্নামী [মৃ. ১১৬০ হি.] রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন হযরত শায়খ আবদুল আহাদ ওয়াহদাত সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর খলিফা।

হযরত জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ চিশতি, কাদিরী ও সুহরাওয়ার্দি শায়খদের সুহবতে থেকেও আধ্যাত্মিক ফায়দা হসিল করেন।

উর্দু কবিতা রচনা

ছোট থেকেই হযরত মাজহার জানে জানানের মধ্যে কবিতা রচনার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পায়। তখনকার দিনে উর্দু ভাষার চর্চা শুরু হয় সমগ্র ভারতব্যাপী। সুতরাং তিনি উর্দুতে কবিতা রচনা করেন। কবিতার পাশাপাশি তিনি অনেক পত্রাদি ও প্রবন্ধ রচনা করেন সুফিতত্ত্বের ওপর।

নিচে তাঁর রচিত কয়েকটি দ্বিপদী উর্দু কবিতা তুলে ধরছি:

গেই আখির জ্বালাকি গুল কি হাছুন আশিয়ান আপনা
না চোদা হায় বুল বুল নে ছামান মে কুচ নিশান আপনা।

ইয়ে হাসরাত রেহগায়ি কিয়া কিয়া মাজুন ছে জিন্দেগি করতি
আগর হুতা চামান আপনা গুল আপনা ভগবান আপনা।

কৈ আজুরদা করতা হায় সজন আপনে কো হায় জালিম
ইয়ে দাওলাত খাহ্ আপনা মাজহার আপনা জানে জান আপনা।

বাহার আনেছে বুল বুল নে বিগাদা হায় মিযাজ আপনা
সামাতি নাহি হায় ফুলন মে মাগার পায় হায় রাজ আপনা।

গুলন কি ফার্শ পার মাত বাইত চোদে কো ফুলা বুল বুল
খুজান কি আওনে কি হায় খাবার রাখ সার সে তাজ আপনা।

শায়খদের সুহবতে ২০ বছর

উপরে বর্ণিত শায়খদের সুহবতে মির্জা জানে জানান রাহিমহুল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর কাটিয়েছিলেন। তিনি তরিকতের মাক্বামাত একটার পর আরেকটা পাড়ি দিতে থাকেন। অবশেষে স্বীয় নফস ও ক্বলব তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তিনি কুতুবের মাক্বামে আরোহণ করেন। যুগের একজন বিশিষ্ট ওলি হযরত মুহাম্মদ আফজল শিয়ালকোটি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘‘শায়খ মাজহার হাবিবুল্লাহকে কুতুবের স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। তিনি এখন এ তরিকার মূল খুঁটি।’’

খুব দ্রুত মির্জা জানে জানান রাহিমাহুল্লাহর আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদা ও আকর্ষণ সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে যায়। মানুষ দলে দলে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে বরকত লাভ করতে থাকে। যে যার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হযরতের সুহবতে এসেছে সে তাই পেয়েছে।

কুতুবের স্তরে উন্নীত

আগেই বলেছি উপমহাদেশ তথা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া চারটি সুফি তরিকার প্রতিটিই মির্জা সাহেবের মধ্যে একত্রিত হয়েছিল। সুতরাং চার তরিকার ফয়েজ বরকত তাঁর মাধ্যমে মানুষের অন্তরাত্মায় বিস্তার লাভ করে। হযরতের সুহবতে থেকে অসংখ্য মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হয়। তিনি প্রায়ই বলতেন: “আমি এসব তরিকার জ্ঞান ও রহস্যাবলী আয়ত্ব করেছি আমার শায়খ সাইয়্যিদ নূরা মুহাম্মদ বাদাইউনী রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে। তিনি আমাকে ইব্রাহিমী (আ.) স্তর থেকে মুহাম্মদী (সা.) স্তরে উন্নীত করেছেন। ফলে আমি আল্লাহর রাসূলকে ধ্যানের মধ্যে বসে দেখতে পাই।” বলাই বাহুল্য, হযরতের আধ্যাত্মিক স্তর তখন কুতুব পর্যায়ে ছিলো।

তাসাওউফের ব্যাখ্যা

শায়খ ও মুরিদ সম্পর্ক: শায়খ মাজহার জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দুনিয়াবী কাজে জড়িত থেকেও আভ্যন্তরীণ ভ্রমণ তথা সুলুকের রাস্তায় অব্যাহতভাবে যাত্রা সম্ভব। এর জন্য শর্ত হলো পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ। মুর্শিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকলে তিনি যেখানেই থাকুন না কোনো নিসবত ও যুক্ততা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। মুর্শিদের প্রতি নির্ভরশীলতা ও আদব শুধু বাহ্যিক আচরণের নাম নয়- বরং এটা একটা বিশ্বাস যে, মুর্শিদের খিয়াল সর্বদা সালিকের ওপর বিদ্ধমান থাকে। সুতরাং দূরে থাকলেও তাঁর প্রতি আদব ও সম্মান রাখতে হবে ঠিক যেভাবে উপস্থিত থাকলে রাখা হয়ে থাকে। সালিককে শুধু জিকির করলেই চলবে না, তাকে স্বীয় পীরের সঙ্গে সর্বদা আভ্যন্তরীণভাবে যুক্ত থাকতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন মুরিদ তার শায়খের প্রতি আদব, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অক্ষুণ্ন ও শক্ত করে ধরে রাখবে। এ স্তরে উন্নীত সালিকের ভ্রমণপথ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

বিভিন্ন ঘটনাবলী ও কারামত

হযরত মির্জা জানে জানান রাহিমাহুল্লাহর জীবনে অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা ও কারামত প্রকাশ হয়েছে। সবগুলোর কথা এ প্রসঙ্গে বর্ণনা মোটেই সম্ভব নয়। তবে পাঠকদের খোরাক যোগাতে আমরা কয়েকটি বর্ণনা নিচে তুলে ধরছি।

১. গায়েবি খাবার: একদা হযরত জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ কিছু মুরিদানকে নিয়ে ভ্রমণে বের হন। তাঁরা সবাই পায়দল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন। সঙ্গে যেটুকু খাবার ছিলো তা শেষ হয়ে গেলো। মুরিদরা ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হলেন। শায়খ বললেন, "এসো সবাই। কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া যাক।" সকলে একটি বড়ো বৃক্ষের ছায়ায় বসে পড়লেন। শায়খ বললেন, তোমরা দস্তারখান বিছিয়ে দাও। মুরিদরা মুর্শিদের নির্দেশ পালন করলো। তিনি বললেন, "এবার সবাই চোখ বন্ধ করো।" কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে সবাই দেখলো দস্তারখানে মাজদার বেশ খাবার সাজানো আছে।

২. দুআর বরকত: উক্ত ভ্রমণকালে সবাই একটি মরুভূমিতে হাঁটছিলেন। হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেলো। শুরু হলো প্রচণ্ড বেগে ঝড়, তুফান ও বৃষ্টিপাত। শীতের মৌসুম হওয়ায় ভীষণ ঠাণ্ডা ও ঝড়-তুফানে কাফেলার সবাই কাঁপতে শুরু করলেন। সবাই বুঝতে পারলেন, আর বাঁচা যাবে না। মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে। হযরত জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "এসো আমরা দু'আ করি।" সবাই হযরতের সঙ্গে হাত উত্তোলন করলো। তিনি দুআর মধ্যে বললেন, "হে আমাদের প্রভু! এটিকে আমাদের চতুর্দিকে সরিয়ে নাও কিন্তু আমাদের উপরে নয়।" কী আশ্চর্য! দুআ শেষ হতেই দেখা গেলো কাফেলার উপরস্থ মেঘমালা মাইল খানের দূরে সরে গেছে। চতুর্দিকে ঝড়-বৃষ্টি অব্যাহত থাকলেও কাফেলা সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় যাত্রাপথে এগুচ্ছে। এমনকি তাপমাত্রাও সহনীয় মাত্রায় এসে গেলো।

৩. কবর কাশফ: হযরত জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেন: "আমি একদিন শায়খ মুহাম্মদ হাফিজ মুহসিন রাহিমাহুল্লাহর কবরের পাশে যাই। জিয়ারত করে মুরাক্বাবায় বসলাম। ধ্যানস্থ অবস্থায় পরিষ্কার দেখলাম, শায়খের দেহখানা সম্পূর্ণ অক্ষত ও তাজা আছে। এমনকি তাঁর কাফনও পরিষ্কার উজ্জ্বল সাদা দেখাচ্ছে। তবে পায়ের দিকে একটি কালো দাগ পরিলক্ষিত হলো। হযরত শায়খ চোখ খুললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়া

শায়খী! এই কালো দাগটি থাকার কারণ কী?" তিনি জবাব দিলেন, "হে আমার পুত্র! আমি তোমাকে একটি ঘটনার কথা বলছি। একদিন আমার এক প্রতিবেশীর বাগান থেকে একটি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আমার বাগানের একটি গর্তের মুখ বন্ধ করি। আমি অবশ্য এ নিয়তও করেছিলাম, 'আগামীকালই এটা প্রতিবেশীর বাগানে স্বস্থানে রেখে আসবো'। কিন্তু আমি ভুলে যাই। এ কারণেই আমার কাফনের মধ্যে দাগটি পড়ে গেছে।"

৪. জালিম ব্যক্তির মৃত্যু: হযরত জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ একজন দুষ্ট জালিম ব্যক্তির প্রতি খুব বেশি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তার দৌরাত্ম্যে মানুষ ভীষণভাবে পীড়িত ও নির্যাতিত হচ্ছিলো। অনেক চেষ্টা করেও লোকটিকে সংশোধনের পথে আনতে পারেন নি। তিনি বলেন, "একদিন আমার মধ্যে একটি কাশফ হলো। দেখলাম অতীতের সকল শায়খ উপস্থিত হয়েছেন। সবাই জালিম লোকটির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।" পরের দিনই ঐ জালিম লোকটি মৃত্যুবরণ করলো।

৫. আটক ব্যক্তির সংবাদ: একদিন হযরতের একজন মুরিদ এসে আবদার জানালো, "হযরত! আমার পাশের গ্রামের লোকজন অন্যায়ভাবে আমার ভাইকে ধরে নিয়ে বন্দী করে রেখেছে। আপনি তার জন্য দু'আ করুন, সে যেনো মুক্তি পায়।" তিনি বললেন, "হে আমার পুত্র! কিছুই ভাববে না। বাস্তবে তোমার ভাই বন্দী হয় নি। তবে সে কিছু অন্যায় কাজ করেছে। আগামীকাল তার নিকট থেকে একটি পত্র তোমার নিকট আসবে।" সত্যিই পরের দিন ঐ ব্যক্তির নিকট তার ভাইয়ের প্রেরিত একটি চিঠি আসলো।

৬. একটি আশ্চর্য কারামত: একদিন হযরত মির্জা জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সকল মুরিদকে একত্রিক করে ঘোষণা দিলেন, "তোমাদের জন্য সুসংবাদ আছে।" উপস্থিত লোকদের মধ্যে কিছু হিংসুক লোকও ছিলো। তারা হযরতের কথা শুনে বললো, "আপনি যা বলছেন তার কী প্রমাণ আছে? আমরা মনে করি না আপনার এ ঘোষণার মধ্যে কোনো সত্যতা আছে।" তিনি প্রস্তাব দিলেন, "ঠিক আছে। এসো, আমারা একজন বিচারক ডেকে নিয়ে আসি। আমার কথা ও তোমাদের কথা তাঁর সম্মুখে বলবো। তিনি যেটা ফায়সালা করেন সেটাই আমরা মেনে নেবো।" তারা বললো, "এর কোনো প্রয়োজন নেই। রোজ কিয়ামতেই আমরা বুঝতে পারবো আপনার ঘোষণা সঠিক কী না। তখন আল্লাহর রাসূলই হবেন বিচারক। আমরা আর কাউকে বিচারক মানি না" তিনি বললেন, "রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর রাসূলের নিকট এখনই আমরা আবদার

জানাবো ফায়সালা দিতে!" সবাই একথা শুনে অবাক হয়ে গেলো। তিনি গভীর মুরাক্বাবায় বসে গেলেন। হৃদয়ে একটি নির্দেশ অনুভব করলেন, সূরা ফাতিহা পাঠ করো! তিনি তাই করলেন। এরপর দেখা গেলো রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসের মধ্যে উপস্থিত হয়ে গেছেন! তিনি ঘোষণা দিলেন, "মাজহার হাবিবুল্লাহ যা বলেছে তা-ই সঠিক, তোমরা সবাই ভুল করেছো।"

মূল্যবান বাণী

১. তিনি বলেন, আমি একদিন শায়খ মুহাম্মদ আবিদ রাহিমাহুল্লাহর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন, "দু প্রান্তের দুটি সূর্য একত্রিত হয়েছে। তাদের আলো যদি এখন একত্রিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সবকিছু জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!"

২. শায়খ মুহাম্মদ আফজল রাহিমাহুল্লাহ আমার থেকে বেশ বয়স্ক ছিলেন। এরপরও আমি যখনই তাঁর নিকট যেতাম তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, "আমি এ জন্য সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে যাই যে, তোমার মাধ্যে তরিকতের উঁচু একটি সিলসিলার বিকাশ ঘটেছে।"

৩. তিনি বলেন, "সমগ্র পৃথিবী ও বিশ্বজগত আমার হাতে আছে। আমি এতে যাকিছু আছে সবই দেখতে পাই, ঠিক সেরূপ স্পষ্টভাবে যেরূপ আমি আমার হাতকে দেখতে পাচ্ছি।"

৪. তিনি বলেন, "তুমি যদি পরহেজগারিতে উপরের দিকে আরোহণ করতে থাকো তাহলে একদিন বেলায়েতের দরোজায় পৌঁছুয়ে যাবে।"

৫. তিনি বলেন, "অস্তিত্ব হচ্ছে একটি গুণ যার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এ জগতটি মূলত ঐশি উপস্থিতির ছায়া মাত্র। সকল সম্ভাব্য সৃষ্টির হাক্বিক্বাত [হাক্বিক্বুল মুমকিনাত] হচ্ছে ঐশি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্রিয়া।"

শায়খ জানে জানান রাহিমাহুল্লাহর জীবনের শেষ অধ্যায়

মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই হযরত মাজহার জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ খুব বেশি খোদাপ্রেমে বিভোর হয়ে পড়েন। জগতে দীর্ঘদিন জীবিত থেকে সময় নষ্ট করার চিন্তায় তিনি ভেঙ্গে পড়েন মানসিকভাবে। তিনি লোকজন থেকে দূরে থেকে গভীর ধ্যান-মুরাক্বাবায় নিমগ্ন হন। তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "আমি ফানাফিল্লায় ও

বাক্বাবিল্লায় অস্তিত্বহীন হয়েছি।” তিনি জিকিরের মাত্রাও খুব বেশি বাড়িয়ে দেন। এসময় দলে দলে লোকজন এসে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করতে থাকে। কথিত আছে, প্রত্যেক দিন অন্তত তিন হাজার মানুষ তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। এতে তিনি অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে নির্দেশ দিলেন, দৈনিক দুবার মাত্র জনসমক্ষে আসবেন।

একদিন শায়খ মুল্লা নাজিম নামক তাঁর এক বিশিষ্ট মুরিদ নিজের মাকে দেখার জন্য বাড়িতে যেতে হযরতের নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, “আমার পুত্র! যদি চাও তো যাও। তবে যখন ফিরে আসবে তখন আমি এ পৃথিবীতে না-ও থাকতে পারি।” লোকজন যখন হযরতের এ কথাটি শ্রবণ করলো তখন সবাই ভীষণভাবে মর্মাহত হলো। পাঞ্জাব প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ তাঁর হায়াতে তায়্যিবাহর জন্য অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে দুআ করতে লাগলো। এছাড়া হযরতের গৃহে শত শত লোক এসে তাঁকে একনজর দেখতে থাকে। তারা কল্পনাই করতে পারে নি যে, তাদের প্রিয় শায়খ তাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন। এরপর একদিন তিনি তাঁর খলিফা মুল্লা আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহর নিকট পত্র লিখলেন, “হে আমার পুত্র! আমার বয়স আশির উপরে। আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। তোমার দুআর সময় আমাকে স্মরণ করবে।” একই ধরনের চিঠি তিনি তাঁর অন্যান্য খলিফাদের নিকটও প্রেরণ করলেন।

হযরতের খুলাফাবৃন্দ

হযরত মির্জা মাজহার জানে জানান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনী লেখকগণ তাঁর মোট ৪৮ জন খলিফার নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি লেখক ও গ্রন্থ পাঠকদের মধ্যে বরকত লাভের আশায় আমরা নিচে এই ৪৮ জনের নাম লিপিবদ্ধ করছি।

১. হযরত শাহ আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম আলী দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১১৫৬-১২৪০ হি.]।

২. হযরত সাইয়্যিদ মীর মুসলমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩. হযরত কাজি সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৭৩১-১৮১০ ঈ.]। তাফসিরে মাজাহরীর লেখক। স্বীয় পীর সাহেবের সম্মানে তাঁরই নামানুসারে তাফসির গ্রন্থের নামকরণ করেন।

৪. হযরত মাওলানা ফাজলুল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন হযরত সানাউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর জ্যেষ্ঠ ভাই।

৫. মাওলানা আহমাদুল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন হযরত সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহর পুত্র। মাত্র ৩০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

৬. শায়খ মুহাম্মদ মুরাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৭. শায়খ আবদুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।।

৮. মীর আলিমুল্লাহ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৯. শায়খ মুরাদুল্লাহ ওরফে গোলাম কাকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১০. হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইহসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর।

১১. শায়খ গোলাম হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১২. শায়খ মুহাম্মদ মুনির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ চিশতি শায়খ হযরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর।

১৩. খাজা ইবাদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর।

১৪. মাওলানা কলন্দর বখশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৫. মীর সাইয়্যিদ নাঈমুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৬. হযরত মাওলানা সানাউল্লাহ সাম্বালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর একজন ছাত্র।

১৭. হযরত মীর আবদুল বাক্বি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৮. খলিফা মুহাম্মদ জামিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৯. হযরত শাহ ভীক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন ইমামে রব্বানি শায়খ আহমদ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন বংশধর।

২০. মাওরানা আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২১. শাহ মুহাম্মদ সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২২. শাহ রাহমাতুল্লাহ সিন্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৩. হযরত মুহাম্মদ শাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৪. মীর সাইয়্যিদ মুবিন খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৫. মীর মুহাম্মদ মঈন খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৬. মীর আলী আসগর ওরফে মীর মাকু রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৭. মুহাম্মদ হাসান আরব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৮. হযরত মুহাম্মদ ক্বা'ইম কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৯. হযরত হাফিজ মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩০. মাওলানা কুতুবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩১. মাওলানা গোলাম ইয়াহইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩২. মাওলানা সাইয়্যিদ গোলাম মহিউদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৩. মাওলানা নাঈমুল্লাহ বিহারিচী [জ. ১১৫৩ হিজরি] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থের লেখক। তিনি হযরত মির্জা জানে জানান রাহিমাহুল্লাহর একটি জীবনী বইও লিখেছিলেন।

৩৪. মাওলানা মুহাম্মদ কালীম বাঙ্গালি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৫. মীর রুহুল আমীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৬. শাহ মুহাম্মদ শাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৭. হযরত মুহাম্মদ হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৮. শায়খ গোলাম হুসাইন থানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৯. মাওলানা আবদুল করিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বুরদানের বাসিন্দা।

৪০. মাওলানা আবদুল হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনিও ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বুরদানের বাসিন্দা।

৪১. নওয়াব ইরশাদ খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১৭৬ হি.]।

৪২. গোলাম মুস্তফা খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪৩. আখুন নূর মুহাম্মদ কান্ধাহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪৪. হযরত আখন্দ মুল্লা নাসীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৩১ হি.]। তিনি পাকিস্তানের উচ্ শরীফের বাসিন্দা ছিলেন।

৪৫. হযরত মুল্লা আবদুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪৬. হযরত মুল্লা জলীল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৪৭. হযরত মুল্লা আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৪৮. হযরত মুল্লা তাইমুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

শহীদী দরোজা লাভ

একদিন তিনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বললেন, "আমার হৃদয়ে কিছুই অবশিষ্ট নেই যার জন্য আমি প্রভুর দরবারে আবদার করবো। আমি মহাপ্রভুর নিকট যাকিছুই চেয়েছি তা-ই পেয়েছি। তবে এখন আমার অন্তরে একটি মাত্র ইচ্ছা বাকি আছে। তাহলো, এ দুনিয়া ছেড়ে তাঁর সান্নিধ্যে চলে যাওয়া চিরদিনের জন্য। তিনি সবকিছু দান করেছেন, তবে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি এখনও দেন নি। আমি আবদার জানাচ্ছি, হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে আজই নিয়ে যান- কাল নয়। তবে আমি তো তাঁর দরবারে সাধারণ অবস্থায় যেতে শঙ্কিত। আমি চাচ্ছি তাঁর নিকট জীবিতাবস্থায় চলে যেতে, যা তিনি কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আর সেটা হচ্ছে শাহাদাতের দরোজা। হে আল্লাহ! আমাকে শহীদের মর্যাদা দান করুন। একজন শহীদ হিসেবে তোমার নিকট নিয়ে যাও।"

দিনটি ছিলো বুধবার ৭ই মুহাররম ১১৯৬ হিজরি [১৭৮০ ঈ.]। শায়খ মাজহার রাহিমাহুল্লাহর একজন খাদিম তাঁর কাছে এসে বললো, "আপনার দরোজায় তিন ব্যক্তি এসেছেন। তাঁরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।" তিনি বললেন, "তাদের আসতে দাও।"

ঘরের ভেতর ঢুকার পর হযরত জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসলেন। একজন প্রশ্ন করলো, "আপনি কী মির্জা মাজহার জানে জানান হাবিবুল্লাহ?" তিনি জবাব দিলেন, "হাঁ।" দুজন একসাথে তৃতীয় জনকে বললো, "হাঁ, তিনিই হচ্ছেন জানে জানান।" একব্যক্তি সাথে সাথে নিজের পকেট থেকে একটি ছুরি বের করে হযরতের পিঠে আঘাত করলো। এতে তাঁর একটি বৃক্ক (কিডনি) ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলো। বয়স্ক হওয়ার কারণে হযরত জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ ছুরিকাঘাতটি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তখন ফযরের নামাযের আযান পড়ে গেলো। ঘাতক ব্যক্তিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পাঞ্জাবের শাসক

তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার প্রেরণ করলেন। হযরত ডাক্তারকে দেখে বললেন, "আমার কোনো ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। যে লোকটি আমাকে আঘাত করেছে আমি তাকে মাফ করে দিলাম। আমি তো এভাবে মৃত্যুর কামনা করেছিলাম মহান আল্লাহর দরবারে। তিনি আমার আবদার কবুল করেছেন।" কোনো কোনো মতে তাঁকে ছুরিকাঘাত নয় বন্দুকের গুলিতে একজন শিয়া হত্যা করেছিল। তিনি এই আঘাত থেকেই দুনিয়ার মায়া ছেড়ে শাহাদাতবরণ করে প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি পবিত্র শুক্রবার দিন ইন্তিকাল করেন।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

বুধবার রাতে ছুরিকাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর পরদিন বৃহস্পতিবার ভোরে তিনি সূরা ফাতিহা ও ইয়াসীন পাঠ করেন। এরপর আছরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকেন। যুহরের সময় উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "মাগরিবের কেমন সময় বাকি আছে?" একজন বললেন, "চার ঘন্টা।" তিনি বললেন, "এখনও আমার প্রভুর দরবারে উপস্থিত হবার কয়েক ঘন্টা বাকি আছে। আমার মোট দশ রাকাআত নামায কাযা হয়ে গেলো। দেহের মধ্যে রক্ত। মাথা তুলতে পারছি না।" একজন খাদিম জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার অবস্থায় কোনো ব্যক্তি কীভাবে নামায আদায় করবে?" তিনি বললেন, "ইশারায় নামায আদায় করবে কিংবা কাযা করবে।" তিনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত খুব ধৈর্যসহ অপেক্ষা করলেন। সূর্যাস্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পরই তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। ইসলামী নিয়মানুযায়ী মাগরিবের সময় উপস্থিত হয়ে যাওয়ায় শুক্রবার দিন এসে গেলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দাহ এবং ওলির মাক্বামাতকে আরো বুলন্দ করুন।

শায়খ শাহ আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম আলী দেহলবী নকশবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ- ১২৪০ হিজরি, সমাধি- খানক্বায়ে মাজহারিয়া, দিল্লী, ভারত।

অনেকের মতে তিনি ছিলেন হিজরি তেরো শতকের মুজাদ্দিদ। মুজাদ্দিদ হচ্ছেন তিনি যিনি একজন ওলিআল্লাহ ও শতকের শুরুতে ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণের দায়িত্ব নেন। সুতরাং মুজাদ্দিদদের আগমন ঘটে প্রত্যেক ইসলামী শতকের শুরুতে।

হযরত শাহ আবদুল্লাহ মুজাদ্দিদী নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহকে মানুষ 'শাহ গোলাম আলী দেহলবী' নামেই বেশি চিনতো। হিজরি তেরো শতকের শুরুর দিকে তিনিই ছিলেন ভাতবর্ষের একজন সুপরিচিত সুফি শায়খ। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন হযরত মির্জা মাজহার জানে জানান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

সুফি শায়খ হওয়া ছাড়াও তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ একজন পণ্ডিত ছিলেন। অনেকে তাঁকে যুগের কুতুব ও ক্বাইউম মনে করতেন।

জন্ম ও শিক্ষা

হযরত গোলাম আলী দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ ১১৫৬ হিজরি সনে ভারতের পাঞ্জাবের পাতিয়ালা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইয়্যিদ আবদুল লতিফ বাতালভী রাহিমাহুল্লাহ কাদিরিয়া তরিকার একজন উচ্চ পর্যায়ের সুফি-শায়খ ছিলেন। তিনি হযরত নাসিরুদ্দিন কাদিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন।

জন্মের কিছুদিন পূর্বে শায়খ আবদুল লতিফ স্বপ্নে দেখলেন, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হাসিমুখে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বললেন, "হে আবদুল লতিফ! তোমার যে সন্তানটি জন্ম লাভ করবে তার নাম রেখো 'আলী'"। সুতরাং জন্মের পরই তাঁর নামা রাখা হয় আলী। তবে পরবর্তীতে তিনি গোলাম আলী [আলীর খাদিম] হিসেবে

পরিচিত হন। অরপদিকে তাঁর এক চাচা জন্মের পূর্বে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বলছেন, “তার নাম রাখবে আবদুল্লাহ।” সুতরাং তার অপর নাম রাখা হলো ‘আবদুল্লাহ’।

তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র এক মাসে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। হযরতের পিতা তাঁকে নিজের শায়খ হযরত নাসিরুদ্দিন কাদিরী রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ হতে চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে দিল্লীতে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে পৌছার সাথে সাথেই শায়খ নাসিরুদ্দিন ইন্তিকাল করেন। সুতরাং শায়খ আবদুল লতিফ বললেন, বাবা গোলাম আলী! এখন তুমি যাকে ইচ্ছে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করতে পারো।

তিনি দিল্লীতে বসবাসরত বিভিন্ন শায়খের সুহবতে যেতে লাগলেন। এসময় তিনি কুরআন, হাদিস, ফেকাহ ইত্যাদি শাস্ত্রে লেখাপড়াও করছিলেন। দীর্ঘ দু বছর পর অবশেষে হযরত মির্জা মাজহার জানে জানান রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ২২ বছর। তবে হযরত জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে কাদিরী তরিকায় মুরিদ করেন। একই সময় নকশবন্দী তরিকার জিকির-আজকার ও শুগল-মুরাক্বাবায় নিমগ্ন থাকারও নির্দেশ দেন। এর ফলে হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর মনে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, “নকশবন্দি তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ করায় আমি কিছুটা বিভ্রান্ত হলাম। আমার মধ্যে সন্দেহ জাগলো যে, না জানি শাইখুত তরিকা হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রূহানী আমার ওপর নারাজ হন কী না? একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহ একটি কক্ষে উপবিষ্ট আছেন এবং পাশের আরেকটি কক্ষে উপবিষ্ট আছেন হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ। আমি হযরত গউসুল আজম রাহিমাহুল্লাহকে বললাম, হযরত! আমি পাশের কক্ষে যেতে ইচ্ছুক। আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। বললেন, হে গোলাম আলী! উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ তা’আলা। [কোন্ তরিকায় তা অর্জন করা হবে সেটা বড়ো কথা নয়।]”

সুতরাং নিঃসন্দেহে শায়খ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ পনেরো বছর শায়খ মির্জা মাজহার জানে জানান রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থেকে তরিকতের সর্বোচ্চ মাক্বামে আরোহণ করলেন। তিনি খিলাফত লাভে ধন্য হলেন। পরবর্তীতে তিনিই মির্জা জানে জানান সাহেবের প্রধান খলিফা হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন।

বিভিন্ন তরিকার শায়খ

হযরত আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ শুধুমাত্র নকশবন্দী তরিকার শায়খ ছিলেন না। কাদিরিয়া ও চিশতিয়া তরিকায়ও তিনি খিলাফতপ্রাপ্ত শায়খ ছিলেন। সুতরাং সে যুগের ভারবর্ষের অনেক শায়খুল মাশাইখ হযরতের সুহবত গ্রহণ করতেন ও বিভিন্ন বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরামর্শ নিতেন।

কাদিরী ও চিশতি তরিকায় তাঁর শায়খ ছিলেন মির্জা মাজহার জানে জানান, তিনি ইযাজত লাভ করেন চিশতি খায়খ খাজা মুহাম্মদ আবিদ সানামী রাহিমাহুল্লাহ হতে, তিনি খিলাফত লাভ করেন শায়খ আবদুল আহাদ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ থেকে।

তাঁর উত্তম চরিত্র মাধুর্য

তিনি অত্যন্ত নরম-দিল, বিনয়ী ব্যক্তি ছিলেন। একদিন রাস্তার একটি কুকুর তাঁর গৃহে প্রবেশ করে। শায়খ আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করলেন, “আমি কে গো প্রভু, যে আপনার বন্ধুদের কর্তৃক সুপারিশ লাভের জন্য আপনার পবিত্র দরবারে আবদার জানাবো? হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন আপনার সৃষ্ট প্রাণীদের ওসিলায়। [তিনি কুকুরটিকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছিলেন।]”

কিছু লোক তাঁর খানক্বাহ থেকে বই-পত্র চুরি করে নিয়ে যেতো। এরপর কিছুদিন পর এসে ঐগুলো আবার তাঁরই নিকট বিক্রি করতো! তিনি [সবকিছু জেনেও] বইগুলো টাকার বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে ক্রয় করে নিতেন। মানুষ তাঁকে বলতো, “হুজুর! এ বইগুলো তো আপনারই! এগুলোতে আপনার লাইব্রেরির নামও লেখা আছে?” তিনি এসব কথায় কান দিতেন না। বাস্তবে তিনি তো ঐ চোরদের সাহায্য করছিলেন।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমদ খান [১৮১৭-১৮৯৮ ঈ.] তাঁর প্রাথমিক জীবনে হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর ভক্ত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমার পিতা ও বড়ো ভাই তাঁর মুরিদ ছিলেন। শায়খ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহ আমাদের পরিবারের সবাইকে ভালোবাসতেন। আমার পিতাকে 'আমার পুত্র' বলে সম্বোধন করতেন।" তিনি আরো বলেন, "হযরতের খানক্বায় ৫০০ জন পর্যন্ত মানুষ অবস্থান করতেন। তিনি সবার খাবার-দাবার জোগাড় করে দিতেন। যদিও হযরতের কোনো নির্দিষ্ট আয় ছিলো না। মনে হতো আল্লাহ যেনো গায়েব থেকে সব যোগান দিচ্ছেন। শায়খ এতোই দয়ালু ও উদার ছিলেন যে, তিনি কখনও কাউকে প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানান নি। তারা যা-ই চাইতো তিনি তা-ই দিয়ে দিতেন। হাদিয়া হিসেবে প্রাপ্ত মূল্যবান বস্তুও তিনি বিক্রি করে ফকিরদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। তিনি ফকিরদের মতোই বস্ত্রাদি পরিধান করতেন এবং তাদের মতোই খাবার খেতেন।"

স্যার সৈয়দ আহমদ খান আরো লিখেছেন, "প্রত্যেকদিন ফযর বাদে তিনি কুরআন শরীফের ত্রিশ নং পারা পাঠ করতেন। এরপর তাঁর মুরিদদের সঙ্গে বসে মুরাক্বাবায় নিমগ্ন হতেন। ইশারাকের পর শুরু করতেন হাদিস ও তাফসিরের ওপর দারস। যখনই তিনি রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক উচ্চারণ করতেন, তখনই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটতো। উপস্থিত সবাই তা উপলব্ধি করতেন ও উপকৃত হতেন। তিনি রাতের বেলা ঘুমোতেন না- শুধুমাত্র কিছুক্ষণ ছাড়া। তিনি মুসাল্লায়ই শুয়ে যেতেন- কখনও বিছানায় যেয়ে শুতেন না। তাঁর কক্ষে একখানা পুরাতন গালিচা [কার্পেট] ছিলো। এর ওপর একখানা নলখাগড়ার তৈরি মুসাল্লা। তিনি সারা জীবন নামায-ইবাদতে এটি ব্যবহার করেছেন। জিকিরের সময় তাঁর মুরিদগণ তাঁকে হালকায় ঘিরে বসতেন। তাঁর তাওয়াক্কুল এতো উচ্চ পর্যায়ের ছিলো যে, তিনি কখনও ধনীদের কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করেন নি। যুগের অনেক ধনী ব্যক্তি খানক্বায় অর্থদানে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা গ্রহণ করেন নি।"[50]

---

[50] maktabah.org/blog/?p=25

তাঁর এরূপ সারল্যতা ও স্বাধীনতার মাঝেও কখনও তিনি সুন্নাতের অনুসরণ থেকে একবিন্দুও পিছিয়ে যান নি। বরং তিনি সারা জীবন খুব সতর্কতাসহ শরীয়ত ও সুন্নাহের অনুসরণ করেছেন। সুন্নাহবিরোধী কাউকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

তাঁর শিক্ষা

তিনি বলতেন, "যারা জওক্ব ও শওক্ব [আধ্যাত্মিক পরমানন্দ বোধ] এর প্রতি আগ্রহী এবং কাশফ ও কারামতের প্রতি লালায়িত, তারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষী নয়।[51] সালিককে একমাত্র আল্লাহপ্রাপ্তির নেশায় নিমগ্ন থাকা চাই। পথের মধ্যে কিছু আত্মপ্রকাশ করলে তা উপেক্ষা করে যেতে হবে। তাকে নির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করতে হবে যে, আমার প্রভুপ্রাপ্তি বৈ অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।"

তিনি বলেন, "আমার তরিকায় কোনো ধরনের কাঠিন্যতা নেই। তবে আছে 'উকুফ ক্বালবি', যার মা'না হলো, 'সর্বদা হৃদয়কে মহামহিমের স্মরণের মাঝে ডুবন্ত রাখা'। হৃদয়কে সবসময় অতীত ও বর্তমান সকল ধরনের বিপদ থেকে মুক্ত রাখা।" অর্থাৎ অন্তরে যাতে ক্ষতিকর ও মূল্যহীন চিন্তা-চেতনা না ঢুকে সেটা নিশ্চিত করা।

হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যাকাত ফরয কী না, তা বছর শেষে কী পরিমাণ সম্পদ আছে তার ওপর নির্ভরশীল। তবে আমি তা আদায় করে দেই যখনই আমার হাতে অর্থ আসে।"

তাঁর কারামত ও কাশফ

গযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টি [কাশফ] ও কারামত বর্ণিত আছে। এছাড়া তিনি ছিলেন মুজিবুদ দাওয়াত- অর্থাৎ, তাঁর দুআ কবুল হয়ে

[51] কাশফ, কারামত, জওক্ব, শওক্ব, ইলহাম ইত্যাদি হচ্ছে সালিকের ভ্রমণপথের উপাদান মাত্র। এগুলোর প্রকাশ ঘটলে কিংবা না ঘটলেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হওয়া। সুতরাং এগুলো অর্জন কোনো সালিকের জন্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। হযরত এ কথাটিই বুঝাতে চেয়েছেন।

যেতো। তাঁর প্রার্থনা দ্বারা রোগিরা আরোগ্য লাভ করতো এবং তাঁর কথা শ্রবণ করলে রোগাক্রান্ত হৃদয় উপকৃত হতো। তিনি শ্রোতাদের মনের কথা উপলব্ধি করতেন। আর সেভাবেই কথা বলতেন। তাঁর সর্বাধিক বড়ো কারামত ছিলো, আধ্যাত্মিকভাবে তিনি রুগ্ন রূহকে আরোগ্য করে দিতে সক্ষম ছিলেন। আমরা এখানে তাঁর কিছু কাশফ ও কারামতের বর্ণনা তুলে ধরছি।

১. তিনি বলেন, "আমি একদিন 'হে আল্লাহর রাসূল!' বলে আকুলভাবে ডাক দিলাম। সাথে সাথে শুনতে পেলাম, 'লাব্বাইক ইয়া আবদুস সালেহ' [হে সাধু গোলাম! আমি হাজির]।
২. "এক রাতে ইশার পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, "হে গোলাম আলী! আর কখনও ইশার নামায আদায় না করে ঘুমাবে না!'"
৩. তাঁর একজন মুরিদ জুলফ্ শাহ বলেন, "আমি শায়খের হাতে বাইআত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে দিল্লীর পথে যাত্রা করি। একটি মরুভূমিতে এসে পথ হারিয়ে ফেললাম। এরপর দেখলাম একজন ওলি এসে আমাকে বললেন, "হে জুলফ্! তুমি এদিকে চলো!" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কে?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি হচ্ছি সে ব্যক্তি যার নিকট তুমি যাচ্ছো!" সেদিন দুবার এরূপ ঘটনা ঘটে।"
৪. বুখারা থেকে একব্যক্তি কাবুল হয়ে তাঁর দরবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তার বাহন উটটি আত্তক নামক এক নদী পার হওয়ার সময় পানিতে নিমজ্জিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো। উটের পিঠে তার সকল ভ্রমণের রসদপত্রও ছিলো। সেগুলোও হারিয়ে যায়। তিনি মনে মনে নিয়ত করলেন, আমার উট ও রসদপত্র যদি ফিরে পাই তাহলে আমি শায়খের নামে কিছু নিয়াজ দেবো। [নিয়াজ হচ্ছে এক ধরনের অনুদান যার প্রতিদান অপর কাউকে রেসানী করে দেওয়া হয়। সাধারণত কোনো নবী-রাসূল বা ওলির নামে নিয়াজ করা হয়ে থাকে।] মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এভাবে নিয়ত করার পরই তলিয়ে যাওয়া উটটি তার বোঝাসহ ভেসে ওঠলো। নদীর পারে এসে থামলো। এরপর তিনি উটের ওপর আরোহণ করে হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। পুরো ঘটনাটি তিনি শায়খের নিকট খুলে বললেন। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী নিয়াজটি আদায় করে দিয়েছো? তিনি বললেন, "জী হুজুর! আদায় করেছি।"

৫. তিনি একবার বলেন, ‘‘আমার ফয়েজ দূরদেশে পৌঁছুয়েছে। আমাদের হালকা [তাঁর তরিকার অনুসারীদের একত্রিত হওয়া] মক্কা শরীফ, মদীনা মুনুওয়ারাহ, বাগদাদ, রুম ও মাগরিব (মরক্কো) পর্যন্ত বিস্তৃত।’’ এরপর মৃদু হেসে বললেন, ‘‘তবে আমাদের পূর্বপুরুষদের বাড়ি হচ্ছে বুখারা [এখানে তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর প্রতি ইঙ্গিত করেন।]।’’

হযরতের উপরোক্ত কথাগুলোর হাকিক্বাত আজকের যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ নকশবন্দী শায়খদের সিলসিলা তাঁরই মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছে। তুর্কিস্থান ও ইরাকের শায়খদের সিলিসিলার সূত্র হচ্ছেন মালানা খালিদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ। পারস্য ও ভারত উপমহাদেশের শায়খদের সিলসিলা বিস্তার লাভ করেছে হযরত হাফিজ আবু সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর মাধ্যমে।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম আলী নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহর অনেক খলিফা ছিলেন। এদের অধিকাংশ পরবর্তীতে নকশবন্দী শায়খ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইলমে তাসাওউফের খিদমাত আঞ্জাম দেন। মোট ৩৮ জন খলিফার নাম বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। নিচে আমরা প্রসিদ্ধ ১২ জন খলিফার নাম ও তাঁদের পরিচিতি লিপিবদ্ধ করছি।

১. হযরত হাফিজ শাহ আবু সাঈদ ফারুকী মুজাদ্দিদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁকে দিল্লীর খানক্বায় প্রধান খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর ৯ বছর বাদে ১২৫০ হিজরি সনে তিনি দিল্লীতেই ইন্তিকাল করেন। তাঁকে খানক্বায়ে মাজহারিয়ার কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে।
২. হযরত শাহ আহমদ সাঈদ ফারুকী মুজাদ্দিদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন উপরোক্ত শাহ আবু সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর পুত্র। তিনিও শায়খ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লার খলিফা ছিলেন। স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর তিনি খানক্বায়ে মাজহারিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনের একজন নেতা হওয়ায় তাঁকে বৃটিশরা

গ্রেফতার করতে চেয়েছিলো। তিনি মদীনা মুনুওয়ারায় হিজরত করেন এবং সেখানেই ১২৭৭ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেছেন। জান্নাতুল বাক্বিতে তিনি সমাহিত আছেন।

৩. হযরত মাওলানা খালিদ বাগদাদী কুর্দী শাহরাজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনিই মধ্যপ্রাচ্য ও তুর্কীস্থানে নকশবন্দী তরিকার প্রসার ঘটান। হিজরি ১২৪২ [১৮২৭ ঈ.] সনে তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

৪. হযরত শাহ রউফ আহমদ রাফত্ ফারুকী মুজাদ্দিদী রামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বুপালের অধিবাসী ছিলেন এবং সেখানেই ১২৫৩ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

৫. মাওলানা বাশারাত উল্লাহ বেহরা'ইচী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৬. হযরত মাওলানা গোলাম মুহিউদ্দীন ক্বুসূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি পাকিস্তানের ক্বুসূর নামক স্থানে ১২৭০ হি. ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তিনি সমাহিত আছেন।

৭. মাওলানা সাঈদ ইসমাঈল মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৮. মাওলানা শাহ গুল মুহাম্মদ গযনবী বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৯. মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১০. মাওলানা পীর মুহাম্মদ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১১. মাওলানা জান মুহাম্মদ হিরাতী আফগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১২. শায়খুল হারাম মাওলানা মুহাম্মদ জান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৬৬ হি.]।

লেখালেখি

শায়খ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর পনেরোটি লেখা সনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া দুটি বাণী [মালফুজাত] সংকলনও আছে। এ দুটোর লেখক ছিলেন তাঁর বিভিন্ন খলিফাবৃন্দ। তাঁর নিজের লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে প্রসিদ্ধ কটি হচ্ছে:

১. মাক্বামাত-ই-মাজহারি (مقامات مظهري)। তাঁর শায়খ মির্জা মাজহার জানে জানান রাহিমাহুল্লাহর সর্বোত্তম জীবনীগ্রন্থ। এটি ফার্সি ভাষায় ১২১১ হিজরিতে লিখিত হয়।

২. ঈদ্বাহাত তারিক্বা (ايضاح الطريقة)। ১২১২ হিজরি সনে সমাপ্ত। নকশবন্দি তরিকার জিকির-আজকার ও নিয়ম-কানুন এতে বর্ণিত হয়েছে। ফার্সি ভাষায় রচিত এ কিতাবের উর্দু অনুবাদ হয়েছে।

৩. আহওয়ালে বুজুর্গান (احوال بزرگان)। এটাও ফার্সি ভাষায় রচিত বিভিন্ন নকশবন্দী তরিকার শায়খের জীবনালেখ্য। ১২২৫ হিজরি সনে সমাপ্ত।

৪. মাক্বামাতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (مقامات مجدد الف ثاني)। লেখক এতে লিপিবদ্ধ করেছেন ইমামে রব্বানি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহিমাহুল্লাহর আধ্যাত্মিক উচ্চ মাক্বামাতের বর্ণনা।

হযরতের দুটি মালফুজাত তাঁর দুজন খলিফা সংকলন করেন। প্রথমটির নাম হলো, ‘‘দুররুল মা’আরিফ’’ [১২৩১ হি. প্রকাশিত]। এটার সংকলক ছিলেন হযরত শাহ রউফ আহমদ রাফত্ রাহামতুল্লাহি আলাইহি। দ্বিতীয়টির সংকলন করেন হযরত খাজা গোলাম মুহিউদ্দীন কুসূরী রাহিমাহুল্লাহ। এতে চল্লিশ দিনের বাণী সংকলিত হয়েছে।

হযরতের ইন্তিকাল

স্বীয় পীরের মতো তিনিও শাহাদাতবরণ লাভ করার সৌভাগ্য পেতে ইচ্ছাপোষণ করতেন। তবে তিনি এরজন্য আল্লাহর দরবারে আবদার জানান নি। এর কারণ হলো, তাঁর পীর সাহেবের শাহাদাতবরণের ফলে অনেক লোককে কঠোর নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। [এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের অসন্তুষ্টির নিদর্শন হতে পারে।]

যাক, স্বভাবিকভাবেই এই মহান ওলি ও কুতুব দুনিয়ার মায়া ছেড়ে একদিন বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি ২২ সফর, ১২৪০ হিজরি সনে [অক্টোবর, ১৮২৪ ঈ.] ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে হযরতের বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তাঁকে স্বীয় শায়খ হযরত মির্জা জানে জানান রাহিমাহুল্লাহর পাশেই দিল্লীর খানক্বায়ে মাজহারিয়ায় সমাহিত করা হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন হদিসের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘জামি আত-তিরমিযী’ শরীফ। দিল্লীর বিখ্যাত জামে মসজিদে হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রধান খলিফা হযরত হাফিজ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ জানাযায় ইমামতি করেন। তাঁর জানাযায় শরীক হন হাজার হাজার ভক্ত-মুরিদান, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাধারণ মুসলমান।

আল্লাহ তা’আলা হযরতের ফায়েজ বরকত দ্বারা আমাদেরকে মালামাল করুন। আমাদের তাঁর নেক আমলের অনুসরণে তাওফিক দিন।

মাওলানা খালিদ বাগদাদী কুর্দী নকশবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ- ১২৪২, সমাধি- দামেস্ক, সিরিয়া।

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো হযরত মাওলানা খালিদ বাগদাদী উসমানী কুর্দী শাফিঈ নকশবন্দী মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ। একজন প্রসিদ্ধ নকশবন্দী শায়খ যার মাধ্যমে নকশবন্দী সুফি তরিকা মধ্যপ্রাচ্য, তুর্কী ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সুফি শায়খ আবদুল্লাহ গোলাম আলী দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা। মাত্র ৫২ বছর তিনি এ মায়াবী ধরার কোলো জীবিত ছিলেন। তবে এরই মধ্যে হযরতকে আল্লাহ তা'আলা অনেককিছু অর্জনে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ইলমে শরীয়ত ও তরিকতে উচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত হন। ইলমে তাসাওউফের বিরাট খিদমাত আঞ্জাম দেন।

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা খালিদের জন্ম হয় আনুমানিক ১১৯০ হিজরি সনে ইরাকের সুলাইমানিয়া নামক স্থানে। পরিণত বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন মাদরাসায় ইলমে শরীয়তের ওপর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তাসাওউফের দিকে তাঁর মন ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়।

সুন্নি মুসলমানদের রক্ষক

মাওলানা খালিদ রাহিমাহুল্লাহ একজন উচ্চ পর্যায়ের সুফি দরবেশ এবং সুন্নি আলিম ছিলেন। তাঁর যুগের পথভ্রষ্ট গোষ্ঠিদের তিনি ছিলেন আতঙ্ক। মুনাজারা করে তাদের বাতিল ঈমান-আকিদা প্রমাণ করতেন। তাঁর ছাত্রগণ বলেছেন, তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন তার্কিক ছিলেন। অতি সহজেই প্রতিপক্ষদেরকে পরাজিত করতে পারতেন। তাঁর সময় বারো ইমাম শিয়া ফিরক্বা শক্তিশালী ছিলো। কিন্তু যতোবারই তিনি তাদের সাথে মুনাজারা করেছেন ততোবারই বিজয়ী হয়েছেন।

তাঁর জীবদ্দশায় আরব ভূখণ্ডে আরেক মারাত্মক ফিরক্বার আবির্ভাব হয়। এদেরকে বলে ওয়াহাবী। এরা ছিলো আবদুল ওয়াহহাব নজদির [১৭০৩-১৭৯২ ঈ.] অনুসারী। এদের

পেছনে শক্তি যোগান দেয় ইউরোপীয় বিভিন্ন উপনিবেশবাদীরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো ৭ শতাধিক বছরের পুরাতন উসমানী খিলাফতকে [১২৯৯-১৯২৩ ঈ.] ধ্বংস করে দেওয়া। এই খিলাফত ছিলো উম্মাহর ঐক্যের সর্বশেষ ভরসাস্থল। ইউরোপীয়দের 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির শিকার হয় উসমানী খিলাফত। তবে কোনো জনপদই বাইরের চক্রান্ত দ্বারা সেখানকার বে-ঈমান-মুনাফিকদের সহযোগিতা ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। পশ্চিমা উপনিবেশবাদীরা 'আরব জাতীয়বাদ' এর বিষবৃক্ষ রোপন করে দেয় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী। সহযোগী হিসেবে বিভ্রান্ত ও বাতিল ওয়াহাবীদের ব্যবহার করে। ওয়াহাবীরা পবিত্র মক্কা ও মদীনায় আক্রমণ করে অসংখ্য নির্দোষ মুসলমানকে হত্যা করে। তারা সেখানকার আলিম-উলামা-সুফি-মাশায়িখদেরও রেহাই দেয় নি। তারা বারো তেরো শত বছরের প্রতিষ্ঠিত সাহাবায়ে কিরাম ও ওলিআল্লাহদের কবরগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয় তথাকথিত ইসলামের নামে। মাওলানা খালিদ তাঁর অনুসারীদেরকে এই 'সন্ত্রাসী' ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে হারামাইন শরীফাইন রক্ষার্থে রুখে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন। দুর্ভাগ্যবশত এ যুদ্ধে ওয়াহাবীরাই বিজয়ী হয়। ফলস্বরূপ, ইসলামের কেন্দ্রস্থলে হক্কানি আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখের উপস্থিতি ও আবির্ভাব এখন নেই বললেই চলে। ওয়াহবীদের [এখন তারা নিজেদেরকে 'আহলে হাদিস' 'সালাফি' ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে থাকে] দৌরাত্ম্যে আজ বিশ্বব্যাপী ঈমান-আকিদা ও স্বয়ং ইসলামের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে।

হযরতের খুলাফাবৃন্দ

মাওলানা খালিদ রাহিমাহুল্লাহ অসংখ্য মানুষকে নকশবন্দী তরিকায় মুরিদ করেছিলেন। এদেরকে সুলুকের পথের দিশা দিয়েছেন। বেশ কয়েকজন সফল হয়েছেনও এবং হযরতের কাছ থেকে খিলাফত লাভে ধন্য হন। তাঁদের চেষ্টা-সাধনায় পরবর্তীতে দূরদেশ পর্যন্ত ইসলামের আত্মা নামে খ্যাত তাসাওউফ চর্চা বিস্তৃত হয়েছে। নিচে কয়েকজন বিশিষ্ট খলিফার নাম লিপিবদ্ধ করছি।

১. মাওলানা আব্বাস কুয়েতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
২. মাওলানা আবদুল্লাহ হিরাতী আফগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৪০ হি.]।
৩. শায়খ আবদুল্লাহ মক্কী আরজিনযানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৪০ হি.]

৪. শায়খ আবদুর রহমান কুর্দী শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৫. শায়খ হুসাইন ইবনে আহমদ দুসারী বসরী শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৫০ হি.]।

৬. শায়খ ইসমাইল আনারানী কুর্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৪২ হি.]

৭. ইমাম মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবিদীন শামী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৫২ হি.]।

৮. মাওলানা মুস্তফা ইবনে জালালুদ্দিন কালামবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৯. সাঈদ তাহা হাক্কারী জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১০. শায়খ আশিক মিসরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন হযরত খালিদ রাহিমাহুল্লাহর সর্বশেষ খলিফা।

ইন্তিকাল

মাত্র ৫২ বছর বয়সে হযরত মাওলানা খালিদ বাগদাদী কুর্দী রাহিমাহুল্লাহ ১১ই জিলকদ ১২৪২ হিজরি সনে সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন।

শাহ আবু সাঈদ ফারুকী মুজাদ্দিদী দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

ওফাৎ- ১২৫০ হিজরি, সমাধি- খানক্বায়ে মাজহারিয়া, দিল্লী, ভারত।

হাফিজ আবু সাঈদ ফারুকী মুজাদ্দিদী দেহলবী নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন দিল্লীর একজন উচ্চ পর্যায়ের নকশবন্দী শায়খ। তবে তাঁকে অনেকেই চিনতেন না। নিজেকে গোপন রাখতে ভালোবাসতেন। তাঁর পীর সাহেব ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম আলী দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

জন্ম ও শিক্ষা

ভারতের রামপুরে ২ জিলকদ ১১৯৬ হিজরি সনে [১৭৮২ ঈ.] তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় তাঁর নামকরণ করা হয় জাকি ক্বদর। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আবু সাঈদ হিসেবেই পরিচিত হন। বিখ্যাত নকশবন্দী শায়খ ইমামে রব্বানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর বংশধর ছিলেন হযরত আবু সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের তালিকা হচ্ছে:

১. তিনি ছিলেন হযরত শফি ক্বদর মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহর পুত্র,

২. তিনি ছিলেন হযরত শায়খ আজিজ ক্বদর মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহর পুত্র,

৩. তিনি ছিলেন হযরত শায়খ মুহাম্মদ ঈসা মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহর পুত্র,

৪. তিনি ছিলেন হযরত শায়খ সাইফুদ্দিন সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর পুত্র,

৫. তিনি ছিলেন হযরত ইমাম মুহাম্মদ মা'সুম ফারুকী সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর পুত্র,

৬. এবং তিনি ছিলেন ইমামে রব্বানি হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহর পুত্র।

হযরত আবু সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর মাতাও এই মুজাদ্দিদী বংশের মহিলা ছিলেন। যেমন:

ফাইয জাহান বেগম, যিনি ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ মুর্শিদ মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহর কন্যাসন্তান, যিনি ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ আরশাদ সাহেবের পুত্র, যিনি ছিলেন মাওলানা

মুহাম্মদ ফররুখ সাহেবের পুত্র, যিনি ছিলেন খাজা মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবের পুত্র, যিনি ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহর পুত্র।

জন্ম থেকেই হযরত আবু সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর মধ্যে বেলায়েতের নিদর্শনসমূহ পরিলক্ষিত হয়। তিনি অন্যান্য ছোট্ট শিশুদের মতো খেলাধূলায় তেমন আগ্রহী ছিলেন না। এগারো বছর বয়সে পবিত্র কুরআনের হাফিজ হন। একই বয়সে তিনি স্বীয় পিতার হাতে নকশবন্দী তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ শুরু করেন।

অল্প বয়সের সময় সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ একবার মাওলানা জিয়াউন নবী নামক তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে লৌখনো শহরে বেড়াতে যান। স্থানীয় একটি মসজিদে যাওয়ার সময় তিনি একজন দরবেশকে দেখতেন যিনি সাধারণত উলঙ্গ থাকতেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে কখনও ঐ দরবেশ উলঙ্গ হয়ে থাকতেন না- নিজের সতর ঢেকে নিতেন। কেউ একজন দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে দরবেশ! এই ছেলেটিকে দেখলেই তুমি নিজেকে ঢেকে নাও কেনো?” দরবেশ জবাব দিলেন, “তিনি [অর্থাৎ সায়খ আবু সাঈদ] একদিন মা’রিফাতের উচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁর সম্মুখে উলঙ্গ থাকা লজ্জার ব্যাপার!”

ক্বারী নাসিম নামক একজন উস্তাদের কাছে তিনি তাজবিদ শিক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত আবু সাঈদের গলার আওয়াজ সুমধুর ছিলো। তিনি খুব সুন্দর সুর ও তাজবিদের সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ইলমে শরীয়তের শিক্ষা তিনি উনিশ বছর বয়সে সমাপ্ত করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন, মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন মুহাদ্দিস [শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর পুত্র], মুফতি শরফুদ্দিন, শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা সিরাজ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মুর্শিদ এবং তাঁর নিজের শায়খ শাহ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহ।

সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণ

শিক্ষার্থী থাকাবস্থায়ই তাঁর মধ্যে সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণের আগ্রহ জেগে ওঠেছিল। তাঁর সুযোগ্য পিতা নকশবন্দী শায়খ শাহ শফি ক্বদর [মৃ. ২৯ শা’বান ১২৩৬ হি.] সর্বপ্রথম তাঁকে

তাসাওউফের ওপর শিক্ষাদান করেন। তবে বাহ্যিক শিক্ষাজীবন শেষে পিতার অনুমতিক্রমে তিনি চলে গেলেন শায়খ শাহ দরগাহী [১১৬২-১২২৬ হি.] রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে। বাইআত গ্রহণ করে নকশবন্দী তরিকার প্রাথমিক ছবকগুলোর ওপর আমল করতে থাকেন।

হযরত শাহ দরগাহী রাহিমাহুল্লাহ একজন জন্মগত মযজূব ওলি ছিলেন। নামাযের সময় ছাড়া সর্বদাই আল্লাহর গভীর ধ্যান-মুরাক্বাবায় পাগলের বেশে থাকতেন। তিনি খাজা মুহাম্মদ জুবাইর রাহিমাহুল্লাহর আধ্যাত্মিক শিষ্য ছিলেন। এছাড়া তিনি ক্বাদিরিয়া তরিকার শায়খ হাফিজ জামালুল্লাহ [মৃ. ১২০৯ হি. - রামপুর] রাহিমাহুল্লাহর খলিফা ছিলেন। হযরত শাহ দরগাহী এক আশ্চর্য ধরনের কারামাতওয়ালা ওলি ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবে মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো। সময় সময় তিনি প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় এখানে সেখানে পড়ে থাকতেন।

খুব বেশিদিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই শাহ দরগাহী রাহিমাহুল্লাহ হযরত সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহকে খিলাফত প্রদান করেন। পীরের মতো তাঁর মধ্যেও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁর মুরিদদের মধ্যে এ প্রভাব সহজেই বিস্তার লাভ করতে থাকে। অনেকেই তাঁর সুহবতে থাকাকালে সময় সময় অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ খিলাফতপ্রাপ্ত একজন শায়খ হয়েও কিন্তু আরো উচ্চতর মাক্বামে আরোহণের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হন নি। তিনি অপর কোনো শায়খের সন্ধানে ছিলেন যার নিকট থেকে এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

অনেক ভেবেচিন্তে বিখ্যাত তাফসিরবিদ কাজি সানাউল্লাহ পানিপথী [মৃ. ১২২৫ হি.] রাহিমাহুল্লাহর নিকট তিনি একখানা পত্র লিখলেন। এতে আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রদানের জন্য পানিপথী সাহেবের নিকট আবদার জানান। হযরত সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ উত্তরে লিখলেন, “এ যুগের সবচেয়ে উচ্চস্তরের নকশবন্দী শায়খ হচ্ছেন হযরত মির্জা মাজহার জানে জানান রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা হযরত আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম

আলী রাহিমাহুল্লাহ। সুতরাং আপনি তাঁরই সুহবতে গেলে সর্বাধিক উপকৃত হবেন বলে মনে করি।”

এ উপদেশ মুতাবিক হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে এসে হাজির হলেন। ১২২৫ হিজরি সনের মুহাররমের ৭ তারিখ তিনি শায়খ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করে মুরিদ হন।[52] মুর্শিদের সুহবতে বেশ কিছুদিন থাকার পর তিনি বেলায়েতের স্তরে উন্নীত হয়ে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করেন। হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ বিশিষ্ট মুরিদকে খুব ভালোবাসতেন। বিশেষ করে নিজেই একজন শায়খ হয়ে তাঁর সুহবতে এসেছেন আল্লাহ তা'আলার আরো বেশি নৈকট্য হাসিল করতে, এ ব্যাপারটি তাঁকে আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট করে তুলেছিলো। সুতরাং শাহ গোলাম আলী সাহেবও তাঁকে নকশবন্দী তরিকায় পূর্ণ খিলাফত প্রদান করেন।

হযরত শাহ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর অনুসারীরা একদিন তাঁকে অনুরোধ জানালো, “ইয়া শাইখ! তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর অনুগ্রহ করে একখানা কিতাব রচনা করুন, যাতেকরে আমরা এবং ভবিষ্যৎ সালিকগণ এ থেকে উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা পেতে পারেন।” তিনি তাঁদের এ আবদার রক্ষা করেছেন। “হিদায়াতুত তালিবীন” নামক ফার্সি ভাষায় একটি উচু মানের তাসাওউফ গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লেখক এতে সুলুকের খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি এখনও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ হচ্ছে। নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদীয়া তরিকার শায়খ ও শাগরিদগণ এটি পাঠ করে বিশেষ উপকার লাভ করে থাকেন।

আরবি চারুলিপিকার

হযরত শাহ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ একজন বিশিষ্ট চারুলিপিকারও ছিলেন। নিজের হাতে তিনি পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ একটি কপি ১২৪৪ হিজরি সনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এতে ৮৮৮ পৃষ্ঠা ছিলো। মদীনা মুনুওয়ারায় ‘রুবাত মাজহারিতে’ এটি সংরক্ষিত আছে।

[52] হিদায়াতুত তালিবীন।

কাশফ ও কারামত

তিনি একজন কাশফ-কারামতওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। নিচে এর কয়েকটির বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

১. মাঝি ছাড়া নৌকা চলার ঘটনা: হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ একদিন একাকী ভ্রমণকালে রামপুর থেকে সাম্বালে রাতের বেলা যাচ্ছিলেন। একটি নদীর পারে এসে দেখলেন মুশরিক এক ব্যক্তির মালিকানাধীন একখানা নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে। তবে মাঝি নেই। আর মুশরিক ব্যক্তিটিও নৌকা চালাতে জানে না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, আপনি শুধু পাল তুলে বসে পড়েন।" মুশরিক বললেন, "কিন্তু আমি যে নৌকা চালাতে পারি না!" তিনি বললেন, "অসুবিধা নেই। আল্লাহ নৌকা চালাবেন। আপনি নৌকা ছেড়ে দিন।" এরপর সত্যিই পাল তুলে দুজন নৌকায় বসে গেলেন। কী আশ্চর্য! নৌকাখানা সুন্দরভাবে চলতে চলতে নদীর ওপারে গন্তব্যস্থানে যেয়ে ভীড়ে গেলো। মনে হলো অদৃশ্য কেনো মাঝি এটি চালিয়েছে। মুশরিক ব্যক্তি এই কারামতটি দেখে হযরতের নিকট ইসলাম গ্রহণ করে নিলো।

২. তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত করার ডিউটি: তাঁর এক মুরিদের নাম ছিলো মুহাম্মদ আসগর। তিনি একদিন বললেন, "হযরত! কী যে করি, আমি প্রায়ই তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জেগে ওঠতে পারি না।" তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তোমাকে আমি তাহাজ্জুদের সময় সজাগ করবো, তবে নামায পড়া না পড়া তোমার কাজ।" মুহাম্মদ আসগর বলেন, "এরপর থেকে কেউ একজন তাঁকে প্রত্যেক দিন তাহাজ্জুদের সময় সজাগ করতো। কে করতো তিনি দেখতেন না।"

৩. ক্বিবলামুখী করার উপায়: হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর একজন মযজূব মুরিদ ছিলেন। তিনি একাকী নামাযে দাঁড়িয়ে ক্বিবলা ঠিক করতে পারতেন না। তিনি একদিন বললেন, "ইয়া শাইখী! আপনি আমাকে বলুন কী করি? আমি যে ক্বিবলা ঠিক করতে পারি না।" তিনি বললেন, "তুমি তাকবিরে তাহরিমার পূর্বে আমার দিকে খিয়াল করবে। আমি তোমাকে ক্বিবলামুখী করবো।" সত্যিই এরপর থেকে মযজূব নামাযে দাঁড়িয়ে হযরতের

দিকে খিয়াল করতেন- এতে তিনি ক্বিবলার দিশা পেয়ে যেতেন। তিনি চোখ বুঝে দেখতেন হযরত তাকে ক্বিবলা কোনদিকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

৪. হজ্জে যাত্রার জাহাজ পরিবর্তন: হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ একদল সাথীদের নিয়ে পবিত্র হজ্জে গমনের জন্য মুম্বাই যেয়ে একটি জাহাজের টিকিট ক্রয় করেন। সবাই জাহাজে আরোহণের পর তিনি হঠাৎ বললেন, “চলো, আমরা এই জাহাজে ভ্রমণ করবো না!” সবাই নেমে গেলেন। টিকিটের টাকা ফেরত নিয়ে অপর একটি জাহাজে যাত্রা করলেন। ঠিক সময়মতো জাহাজখানা হজ্জযাত্রীদের নিয়ে জিদ্দা পৌঁছুল। শান্তিমতো সবাই হজ্জ পালন করলেন মক্কা শরীফ যেয়ে। এদিকে প্রথমে যে জাহাজ ছেড়ে এসেছিলো সেটি কোনো কারণে দেরি করে জিদ্দায় পৌঁছায়, ফলে যাত্রীরা কেউই হজ্জ পালন করতে পারলেন না।

শায়খ কর্তৃক স্থলাভিষিক্ত

হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় মুর্শিদ শায়খ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হযরত আবু সাঈদকেই খানক্বায়ে মাজহারিয়ার আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করেন। ১২৩১ হিজরির ১১ জমাদিউল আউয়াল তিনি হযরত আবু সাঈদকে কাছে ডেকে বললেন, “হে আবু সাঈদ! আমার পরে তুমিই আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। খানক্বায় অনুষ্ঠিত হালাক্বা জিকির পরিচালনা করবে এবং তাফসির ও হাদিসের দারস নিয়মিত দেবে।” এটা শ্রবণ করে অনেকে ভাবলো, হযরত আবু সাঈদ কোন কারণে এতো বেশি যোগ্যতা লাভ করলেন? হযরত একথা জেনে বললেন, “তারা কী দেখে নি, আবু সাঈদ আরেকজনের খিলাফতপ্রাপ্ত শায়খ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এখানে এসে অবস্থান করছেন?”

১২৩৩ হিজরি সনের জুমাদিউল আউয়াল হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহ হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহকে সুসংবাদ জানালেন যে, তাঁকে ‘ক্বাইউম’ এর মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। হযরত বলেন, “আমি কাশফের মাধ্যমে দেখেছি যে, তুমিই আমার ক্বাইউমিয়াতের আসনে উপবিষ্ট আছো।”

স্বীয় পীর যখন শেষ রোগে আক্রান্ত হন, তখন শাহ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ লৌখনোতে অবস্থান করছিলেন। শায়খ তাঁর খলিফার নিকট বার বার পত্র লিখলেন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দিল্লীতে ফিরে আসতে। এরূপ একটি পত্রে হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আমি অত্যন্ত রোগাক্রান্ত ও দুর্বল। এখন বসতেই পারছি না। আমি তোমাকে এক নজর দেখেতে চাই। অদৃশ্য জগত থেকে আমার নিকট নির্দেশ এসেছে যে, তোমাকে ডেকে আনতে হবে। হযরত মুজাদ্দিদের পবিত্র রূহও একই ইচ্ছা পোষণ করছেন। এ পবিত্র খানক্বার দায়িত্ব তোমার নিকট সমজিয়ে দিতেই হবে। তাড়াতাড়ি এসে পড়ো। খানক্বার সবাই এবং শহরের অধিকাংশ লোক তোমাকেই চাচ্ছে। এদের মধ্যে আছেন শায়খ আহমদ ইয়ার, ইব্রাহিম বেগ, মীর খুর্দ, মৌলভী আজিম, মৌলভী শের মুহাম্মদ প্রমুখ। দিল্লী শহরের সকল গুণিজন বলছেন যে, খানক্বার দায়িত্ব পাওয়ার অধিকার আবু সাঈদেরই বেশি। শাহ আবদুল আজিজসহ অন্যান্য সবাই চান না যে, তুমি ছাড়া আর কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। এছাড়া আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে যে, একমাত্র তুমিই এ দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে।”[53]

সুতরাং হযরত শাহ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ সর্বসম্মতিক্রমে দিল্লীর নকশবন্দী আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বীয় মুর্শিদের ইন্তিকালের পর। দীর্ঘ ৯ বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তাঁর হাতে হাজার হাজার লোক বাইআত গ্রহণ করে উপকৃত হয়। এরপর তিনি ১২৪৯ হিজরি সনে মক্কা মুকাররমায় যেয়ে হজ্জ পালনের নিয়ত করলেন।

হজ্জে গমন ও ইন্তিকাল

তখনকার দিনে মুম্বাই থেকে জাহাজে হজ্জে যেতে হতো। মক্কা মুকাররমায় যেয়ে হজ্জ পালন। মদীনা মুনুওয়ারায় যেয়ে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবাকর জিয়ারত। এরপর জিদ্দায় এসে আবার জাহাজে আরোহণ করে মুম্বাই ফিরে আসতে, তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতো। সুতরাং দিল্লীর ভক্ত-মুরিদান যখন জানতে পারলেন হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ হজ্জে গমন করবেন, তখন তারা কিছুটা

[53] মাকাতিব শরীফার পত্র নং ১২৫ থেকে।

মর্মাহত হয়ে পড়লো। তারা তাঁদের প্রিয় শায়খকে দীর্ঘদিন আর দেখতে পাবে না। হযরত ভ্রমণে যাত্রার প্রক্কালে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আহমদ সাঈদকে তাঁর অনুপস্থিতিতে খানক্কার দায়িত্ব সমজিয়ে দিলেন।

ভ্রমণপথে হযরতকে তাঁর ভক্ত-মুরিদানগণ প্রত্যেক শহর ও গঞ্জে অত্যন্ত ভাব-গম্ভীরভাবে বিদায় জানায়। পবিত্র রমজান শরীফে তিনি মুম্বাই পৌঁছান। শাওয়াল মাসের প্রথমেই তিনি একটি জাহাজে সাথীদের নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। জিলহজ্জ মাসের শুরুতেই পবিত্র মক্কা শহরে যেয়ে উপিস্থিত হন।

হযরত শাহ আবু সাঈদকে মক্কা মুকাররমায় অবস্থানরত শাইখুল হারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জান উষ্ণ স্বাগত জানান। তিনি ছিলেন হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট খলিফা। মক্কা শরীফে বসবাসরত তখনকার সকল উচ্চ পর্যায়ের আলিম-উলামা ও মাশাইয়ে আজম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন শায়খ আবদুল্লাহ সিরাজ, শায়খ মুফতি উমর শাফিঈ, মুফতি সাঈদ আবদুল্লাহ, মীর গনি হানাফি, হযরত ইয়াসিন হানাফি ও শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সিন্ধী প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

পবিত্র হজ্জ পালন করে ঐ মাসেই [জিলহজ্ব মাসে] হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ডাইরিয়া ও জ্বরে আক্রান্ত হন। তবে মদীনা মুনুওয়ারার প্রতি মুহাব্বাত হেতু তিনি সেখানে যেতে ভীষণভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিছুটা সুস্থ হয়েই রাসূলের শহরের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছুয়ে ভক্তিভরে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতহারে যেয়ে সালাম জানান। এরপর পুরো রবিউল আওয়াল মাস নূরের শহরে অবস্থান করেন।

সাথীর স্বপ্ন

হযরত আবু সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর একজন সাথী একরাত স্বপ্নে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরতের কক্ষের দিকে আরোহী অবস্থায় এগিয়ে চলছেন। তাঁর পেছনে একদল লোক পায়ে হেঁটে এগুচ্ছেন। তবে একব্যক্তি ঘোড়া চড়ে যাচ্ছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় একজন

বললেন, "হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঘোড়ায় আরোহিত থাকার অর্থ হচ্ছে, হযরত আবু সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ যে তাঁরই বংশধর সেটার ইঙ্গিত।"

হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ মদীনা শরীফ থাকাকালে নিয়মিত জিকিরের হালাক্বার আয়োজন করেন। অনেক লোক এতে অংশগ্রহণ করে উপকৃত হন। মদীনার হারাম শরীফের শায়খ তাঁকে 'রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে' আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মদীনা শরীফ কিছুদিন অবস্থানের পর হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। তিনি প্রত্যহ এক মাইলের পথ সহজেই হাঁটতে শুরু করেন। কিন্তু নূরের শহর ছেড়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ভ্রমণে থাকাবস্থায় পবিত্র রমজান শরীফ শুরু হওয়ার পর প্রথম দিনই অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখলেন। কিন্তু তাঁর বেশ অসুবিধা হলো। রোযা রাখা সম্ভব হলো না। তিনি ফিদইয়া প্রদানের নির্দেশ দিলেন। বললেন, "আমার জন্য ফিদইয়া দেওয়া ওয়াজিব নয় কারণ, আমি অসুস্থ। তাছাড়া আমি ভ্রমণকারীও। এরপরও আমি ঐচ্ছিক ফিদইয়া দিচ্ছি।" ২২ রমজান তিনি ভারতের টংক শহরে এসে উপনীত হন। টংকের নবাব তাঁকে উষ্ণ স্বাগত জানান। ঈদুল ফিতরের দিন তিনি খাদিমদের বললেন, "আজ নবাবকে আমার এখানে আসার অনুমতি দেবে না। যখনই কোনো দুনিয়াদার ধনী ব্যক্তির আগমন ঘটে তখন আমি নিজেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখতে পাই।" তিনি তাঁর পুত্র শাহ আবদুল গনিকে উপদেশ দিলেন, "দুনিয়াদারদের অনুসরণ থেকে নিজেকে রক্ষার্থে রাসূলের সুন্নাত অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।" এরপর স্বীয় পুত্রকে বললেন, "আমি তোমাকে ও [তাঁর তৃতীয় পুত্র] আবদুল মুগনিকে অনুমতি দিচ্ছি যে, সব ধরনের আমল ও তিলাওয়াত [আশগাল ও আওরাদ] যা আমি করে থাকি তা পালন করতে।" যুহরের নামাযের পর তিনি একজন হাফিজকে বললেন, "সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করো।" হাফিজ সাহেব তিনবার সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করার পর বললেন, "এবার তিলাওয়াত বন্ধ করো। আর বেশি সময় বাকি নেই।"

এর কিছুক্ষণ পরই যুহর ও আছর ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ে হযরত আবু সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরিদান-খলিফা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে মায়াবী এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইন্তিকালের তারিখটি ছিলো শানিবার ঈদুল ফিতর, ১ম শাওয়াল ১২৫০ হিজরি [৩১ জানুয়ারী ১৮৩৫ ঈ.)। হে আল্লাহ! তোমার এই মহান ওলির দারাজাত বুলন্দ করে দিন।

জানাযা

শহরের শাসক নবাব ওয়াজিরুদ-দৌলাসহ অসংখ্য মানুষ তাঁর জানাযার নামাযে শরীক হন। ইমামতি করেন কাজি মাওলানা খলিলুর রহমান। সবার ইচ্ছায় তাঁর মরদেহ দিল্লীতে নিয়ে আসা হয়। প্রায় চল্লিশ দিন পর তাঁর কফিন খোলার পর দেখা গেলো, দেহখানা সম্পূর্ণ তরতাজা রয়েছে। মনে হচ্ছিলো এইমাত্র গোসল দেওয়া হয়েছে। কফিন থেকে বেরিয়ে আসছিলো মনোমুগ্ধকর আতরের সুঘ্রাণ। অবশেষে তাঁকে স্বীয় মুর্শিদের পাশেই দিল্লীর খানক্বায়ে মাজহারিয়ার কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত শাহ আহমদ সাঈদ খানক্বায়ে মাজহারিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন, হযরত শাহ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর খলিফা।

একটি স্বপ্ন

শায়খ আহমদ বখশ নামক একব্যক্তি হযরত শাহ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর একজন মুরিদ ছিলেন। তিনি একদিন দিল্লীতে এসে হযরতের কবর জিয়ারত করলেন। খানক্বায় অবস্থানকালে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, হযরত শাহ আবু সাঈদ তাঁকে নির্দেশের সুরে বলছেন, "হে আহমদ! বৃটিশদের কাছ থেকে তুমি যে সনদপত্র গ্রহণ করেছিলে তা এখনও তোমার থলের মধ্যে আছে। এটি বের করে ছিড়ে ফেলো! এটা রাখা ইসলামের জন্য শুভ নয় [অর্থাৎ, কোনো মুসলিমকে অমুসলিমের কর্তৃক বাহবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মোটেই কাম্য নয়]।" হযরত আহমদ বলেন, আমি জানতামই না ঐ সনদপত্রটি আমার সঙ্গে ছিলো। আমি আমার থলের ভেতর ভালো করে অনুসন্ধান করে ঠিকই সেটি পেলাম। হযরতের নির্দেশ মুতাবিক ছিড়ে ফেলাম। বুঝতে পারলাম অমুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা আমার অন্তর থেকে মুছে গেলো।

হযরত শাহ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর বংশধর ও খুলাফাবৃন্দ

তাঁর তিনজন পুত্রসন্তান ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন: ১. হযরত শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দিদী ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৭৭ হি., সমাধি- জান্নাতুল বাক্বি, মদীনা মুনুওয়ারাহ]। ২. হযরত শাহ আবদুল গনি ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ। ৩. হযরত শাহ আবদুল মুগনি ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ।

হযরতের জীবনীগ্রন্থসমূহে ১২ জন খলিফার নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। বরকতের জন্য আমরা এসব মুবারক নাম নিচে তালিকাভুক্ত করছি।

১. হযরত শাহ রউফ আহমদ রাফত মুজাদ্দিদী [মৃ. ১২৫৩ হি.] রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন হযরতের চাচাতো ভাই। প্রথমে শাহ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন। এরপর হযরত শাহ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহও তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন।
২. হযরত শাহ খাতিব আহমদ মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৬৬ হি.]। হযরত শাহ রউফ আহমদ রাহিমাহুল্লাহর পুত্র।
৩. হযরত শাহ আবদুল গানি মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৯৬ হি.]। শাহ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র।
৪. হযরত শাহ আবদুল মুগনি ফারুকী মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৯২ হি.] হযরত শাহ আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর তৃতীয় পুত্র।
৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৬০ হি.]।
৬. হযরত মুল্লা খোদা বুরদি তুর্কিস্থানী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি পূর্ব ইউরোপের বুলগেরিয়ায় যেয়ে ইলমে তাসাওউফের খিদমাত আঞ্জাম দেন।
৭. হযরত মুল্লা আলাউদ্দিন পেশওয়ারী রাহিমাহুল্লাহ।
৮. হযরত শায়খ সাদুল্লাহ তাজিক হায়দরাবাদী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৭০ হি.]।
৯. হযরত মাওলানা আবদুল করিম তুর্কিস্থানী রাহিমাহুল্লাহ।
১০. হযরত মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ আত্তকী রাহিমাহুল্লাহ।
১১. হযরত মিয়ান আসগর রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৫৫, সমাধি- খানক্বায়ে মাজহারিয়া, দিল্লী, ভারত]।
১২. শায়খ ইসমাঈল সিন্নারী হুসাইনী মালিকী সুদানী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৬৪ হি. পরে]।

শায়খ শরীফ ইসমাঈল সিন্নারী হুসাইনী মালিকী সুদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ- ১২৬৪ হিজরির পর [সঠিক তারিখ জানা নেই], সমাধি- অজানা।

হযরত শরীফ সাঈদ ইসমাঈল তাক্বাদিম জাফরী সিন্নারী হুসাইনী মালিকী নকশবন্দী মুজাদ্দিদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন প্রথম নকশবন্দী শায়খ যার মাধ্যমে সুদান ও পরবর্তীতে মিশরে এই তরিকার প্রসার ঘটে।

জন্ম ও তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণ

তাঁর জন্ম হয় ১২১৬ হিজরি সনে দক্ষিণ সুদানের বাহরুল গাজাল নামক জনপদে। পরিণত বয়সে তিনি জেরুজালেমে ভ্রমণ করেন। সেখানে ১২৪৬ হিজরি সনে সাক্ষাৎ লাভ করেন সাঈদ আহমদ মুল্লা কুর্দী রাহিমাহুল্লাহর সাথে। তিনি ছিলেন শায়খ গোলাম আলী নকশবন্দী দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর খলিফা। শরীফ ইসমাঈল সাহেব হযরত শরীফ সাঈদকে নকশবন্দী তরিকায় মুরিদ করেন। তিনি তাঁকে লাতা'ইফসমূহের পরিচিতি ও এর দ্বারা জিকির-আজকারের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

কিছুদিন মুর্শিদের সুহবতে থেকে নিয়মিত জিকির-শুগল আদায় করে চলে যান মক্কা মুকাররমায়। সেখানে সাক্ষাৎ ঘটে শাইখুল হারাম মাওলানা মুহাম্মদ জান সুলাইমানী রাহিমাহুল্লাহর সাথে। তিনিও ছিলেন হযরত গোলাম আলী দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর একজন খলিফা। তাঁর কাছ থেকে হযরত শরীফ ইসমাঈল সাহেব নকশবন্দী-মুজাদ্দিদী তরিকার ওপর আরো গভীর জ্ঞানার্জন করেন। তিনি মাওলানা মুহাম্মদ জান রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মক্কা মুকাররমায় দুই বছর অবস্থান করেন। এরপর শাইখুল হারাম সাহেব তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন ও অপরদের মুরিদ করার অনুমতি দেন। এরপর তিনি নূরের শহর মদীনা শরীফে ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি সাক্ষাৎ পান হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা হযরত শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দিদী ফারুকী হেদলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে। তিনি হযরতের সুহবতে থেকে আধ্যাত্মিক মাক্বামাতের বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য জরুরী তাওয়াজ্জুহাত লাভ করেন। এরপর হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে খিলাফতের খিরক্বা পরিয়ে দেন।

শায়খ ইসমাঈল রাহিমাহুল্লাহ মালিকী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি শায়খ আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালাম শাস্ত্রও অনুসরণ করতেন। হারামাইন শরীফাইন থেকে তিনি মিশরে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। লোকজন দলে দলে তাঁর সুহবতে এসে বাইআত গ্রহণ করে মুরিদ হন। বেশ কিছুদিন থাকার পর মিশর থেকে নিজের দেশ সুদানে ফিরে আসেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে একটি খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করে ইলমে তাসাওউফের খিদমতে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর খানক্বাহ ছিলো সুদানের ডুঙ্গুলা নামক স্থানে।

জিহাদে অংশগ্রহণ

তাঁর যুগে বৃটিশ উপনিবেশ বিরোধী জিহাদ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হয়েছিল। সুতরাং তিনি আদেন ও ইয়ামনে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে 'ক্বসিদায়ে আদানিয়্যাহ' নামকরণে একটি ক্বাসিদা রচনা করেছিলেন। ২ থেকে ৩ হাজার সৈন্য ও ৫ শত বন্দুকসহ তিনি জিহাদে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন।

প্রধান খলিফা

হযরত শরীফ ইসমাঈল সিন্নারী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা ছিলেন হযরত সাঈদ মূসা ইবনে মুওয়াওআদ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি সুদানের কাজির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে জীবনের শেষের দিকে তিনি মিসরের আসওয়ানে বসবাস করেন। সেখানে থেকে নকশবন্দী তরিকার প্রসার ঘটান দক্ষিণ মিসরে। সাঈদ মূসা রাহিমাহুল্লাহ ঈসায়ী ১৮৮৮ সালে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত সিন্নারী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

হযরত সিন্নারী রাহিমাহুল্লাহ ১২৬৪ হিজরি সনের পরে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক সন-তারিখ জানা যায় নি। তিনি কোথায় সমাহিত আছেন তা-ও অজানা। আজো হযরতের অনুসারীরা সুদানের বিভিন্ন অঞ্চলে ইলমে তাসাওউফের খিদমাত করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন।

হযরত শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দিদী ফারুকী মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ- ১২৭৭ হিজরি, সমাধি- জান্নাতুল বাক্বি, মদীনা মুনুওয়ারাহ।

তিনি ছিলেন বিখ্যাত নকশবন্দী শায়খ আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম আলী রাহামতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলিফা।

জন্ম ও শিশুকাল

শাহ আহমদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ ১২১৭ হিজরি সনে ভারতের রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দিদী দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর একজন খলিফা ছিলেন। তবে প্রথমদিকে আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ বাইআত গ্রহণ করেছিলেন হযরত শাহ দরগাহী রাহিমাহুল্লার নিকট। প্রিয় পুত্র আহমদ সাঈদকে শিশু বয়সে দরগাহী রাহিমাহুল্লাহর নিকট নিয়ে আসেন। এরপর তিনি যখন গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে যেয়ে বেলায়েত লাভ করেন তখনও তিনি স্বীয় পুত্র আহমদকে নিয়ে যান। সুতরাং এভাবেই তিনি অল্প বয়সে শাহ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর সুহবত লাভ করেন।

অল্প বয়স হেতু শাহ আহমদ সাঈদ বাহ্যিক ইসলামী শিক্ষার জরুরত অনুভব করেন। শাহ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, “হাল [আধ্যাত্মিকতা] ও ক্বাল [বাহ্যিক শিক্ষা] উভয়টির প্রয়োজন। সুতরাং তোমাকে প্রথমে বাহ্যিক শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এবং সময় সময় জিকিরের হালক্বায়ও বসতে হবে।” সুতরাং তিনি একই সময় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞানার্জনে ব্রত হলেন। তাঁর হাদিস শাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন শাহ সিরাজ আহমদ মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ।

দীর্ঘদিন হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থেকে নকশবন্দী ও অন্যান্য তরিকার জিকির-মুরাক্বাবায় নিজেকে নিমগ্ন রাখার পর তিনি বেলায়েতের স্তরে উন্নীত হন। তাঁর শায়খ তাঁকে সাতটি সুফি তরিকায় খিলাফত প্রদান করেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ২২ বছর

তখন হযরত গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতা হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ তখন দিল্লীর খানক্বায়ে মাজহারিয়ার দায়িত্ব নেন। দীর্ঘ দশ বছর সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে হযরত আবু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান। মৃত্যুকালে শাহ আহমদ সাঈদকেই খানক্বায়ে মাজহারিয়ার দায়িত্বভার সমজিয়ে দেন।

মদীনায় হিজরত

হযরত শাহ আহমদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর সময় সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ছিলো বৃটিশ শাসন। এদিকে মুসলিম উলামা ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেন। ফলে বৃটিশ বিরোধী জিহাদ শুরু হয়। ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ ঈসায়ী সনের আজাদী আন্দোলন ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে দুর্ভাগ্যবশত এই আন্দোলন সফল হয়নি। বৃটিশরা সব অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে এনে মুসলমানদের ওপর চরম নির্যাতন শুরু করে। বিশেষ করে উলামায়ে কিরামের ওপর চালায় হত্যাযজ্ঞের স্টীম রোলার। যে ফাতওয়ার মাধ্যমে এই আজাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিলো সেটির একজন সদস্য ছিলেন হযরত শাহ আহমদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি এ ফাতওয়ার পক্ষে একজন শীর্ষস্থানীয় স্বাক্ষরদাতা ছিলেন। সুতরাং বৃটিশরা তাঁকে তাদের টার্গেট হিসেবে শীর্ষে রাখে।

দিল্লীতে শাহ সাহেব অবস্থান করছেন সেটা বৃটিশদের অজানা ছিলো না। সুতরাং গ্রেফতার হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষার্থে তিনি দিল্লী ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন আত্মগোপনে থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মদীনা মুনুওয়ারায় হিজরত করবেন। অনুরূপ জিহাদের সিপাহসালার চিশতি শায়খুল মাশাইখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহিজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও সে সময় মক্কা শরীফে হিজরত করেছিলেন।

মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে হযরত শাহ আহমদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানের দিরা ইসমাঈল খান নামক স্থানে তাঁরই খলিফা হাজী দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "খানক্বায়ে মূসা জাই শরীফ' -এ ১৮ দিন অবস্থান করেন। এসময় তিনি হাজী দুস্ত মুহাম্মদকে দিল্লীর খানক্বায়ে মাজহারিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। তিনি বললেন,

“যদি পারো নিজে ওখানে যাবে। অন্যথায় কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ করবে।” হাজী সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর খিলিফা মাওলানা রহিম বকশকে দিল্লীতে প্রেরণ করবেন এবং নিজে মূসা জাই শরীফেই থেকে যাবেন।

এরপর শাহ আহমদ সাঈদ মূসা জাই শরীফ ত্যাগ করে মক্কা মুকাররমায় যেয়ে ১২৭৪ হিজরি সনে পবিত্র হজ্জ পালন করেন। এরপর ১২৭৫ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা মুনুওয়ারায় পৌঁছান। সেখানকার পবিত্র পরিবেশে বাকি জীবন কাটান।

এই দীর্ঘ ভ্রমণকালে হযরত শাহ আহমদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর হাতে অনেক লোক বাইআত গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অনেক আলিম-উলামাও ছিলেন।

সন্তানাদি ও খুলাফাবৃন্দ

হযরত শাহ আহমদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর চারজন পুত্রসন্তান ও একজন কন্যাসন্তান ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন:

১. হযরত শাহ আবদুর রশীদ মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ [১৮২০-১৮৭১ ঈ.]।
২. হযরত শাহ আবদুল হামিদ রাহিমাহুল্লাহ [শিশুকালে মারা যান]।
৩. হযরত শাহ মুহাম্মদ উমর মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ [১৮২৯-১৮৮০ ঈ.]।
৪. হযরত শাহ মুহাম্মদ মাজহার মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৮৮৩ ঈ.]।
৫. রওশান-আরা বেগম রাহিমাহুল্লাহা।

হযরত শাহ আহমদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর ৭২ জন খলিফার নাম বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। নিচে আমরা প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম লিপিবদ্ধ করছি।

১. হযরত শায়খ হাজী দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৮৪ হি.]।
২. হযরত শাহ আবদুর রশীদ ফারুকী মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ [তাঁর পুত্র]।
৩. হযরত শাহ মুহাম্মদ উমর ফারুকী মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ [তাঁর পুত্র]।
৪. হযরত শাহ মুহাম্মদ মাজহার ফারুকী মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ [তাঁর পুত্র]।

৫. হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইরশাদ হুসাইন মুজাদ্দিদী রামপুরী রাহিমাহুল্লাহ [১২৪৮-১৩১১ হি.]।

৬. হযরত মাওলানা ওয়ালিউন্নবী মুজাদ্দিদী রামপুরী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৯০৩ ঈ.]।

৭. হযরত মাওলানা সাঈদ আবদুস সালাম হাসবী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৮৮২ ঈ.]

৮. হযরত মুফতি হাফিজ রাজা আলী ফারুকী হানাফি বানারসী রাহিমাহুল্লাহ [১২৪০-১৩১২ হি.]।

৯. হযরত শায়খ সাঈদ মাহমুদ হুসাইনী আফান্দি মক্কী রাহিমাহুল্লাহ [১২৩৩-১৩০৪ ঈ.]।

লেখালেখি

হযরত শাহ আহমদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ একজন সুলেখক ছিলেন। তিনি নিচের গ্রন্থগুলোর রচয়িতা।

১. সাঈদুল বাইয়ান ফী মাওলিদুল ইনস ওয়াল জান্ [سعيد البيان في مولد الانس والجان]। উর্দু ভাষায় রচিত। এতে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

২. আয-জিকর ফী আতবাতুল মাওলিদুল মুনিব [الذكر الشريف في اثبات المولد المنيب]। মিলাদুন্নবী সা. সম্পর্কে ফার্সি ভাষায় রচিত গ্রন্থ।

৩. আলা ফাওয়ায়িদুদ দাবাতা ফী আতবাতার রাবিতা [الفوائد الضابطه في اثبات الرابطه]। ফার্সি ভাষায় রচিত।

৪. আল আনহারুল আরবা'আ দার বাইয়ান সালাসি-ই-আরবা'আ [الانهار الاربعه در بيان سلاسل اربعه]। ফার্সি ভাষায় রচিত। এতে চার সুফি তরিকার [চিশিতি, কাদিরী, নকশবন্দী ও সুহরাওয়ার্দি] আধ্যাত্মিক সবকসমূহের বর্ণনা এসেছে।

৫. আল-হাক্কুল মুবিন ফী রদ্দে আলাল ওয়াহাবিয়া [الحق المبين في الرد على الوهابيين]। ওয়াহাবী [সালাফি] ফিতনার বিরুদ্ধে রচিত গ্রন্থ।

এছাড়া হযরতের প্রধান খলিফা হযরত হাজী দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত হযরতের মাকতুবাত 'তুহফা জাওয়ারিয়া' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

হযরতের ইন্তিকাল

মাত্র দুটি বছর নূরের শহর মদীনায় থাকার পর ১২৭৭ হিজরি সনের ২য় রবিউল আউয়াল হযরত শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দিদী ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ এ মায়াবী ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবরের নিকট জান্নাতুল বাক্বিতে তিনি সমাহিত আছেন। তাঁর জানাযার নামাযে অসংখ্য মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মদীনাবাসীরা বলেছেন, ইতোমধ্যে কোনো জানাযায় এতো বেশি লোকের সমাগম আমারা কখনও দেখি নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোপন রহস্যাবলী সংরক্ষণ করুন।

হযরত শায়খ সাঈদ জামালুদ্দিন গুমুক্বী হুসাইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ- ১২৮৫ হিজরি, সমাধি- ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।

তিনি ছিলেন শায়খুল মাশাইখ, নূরের ওপর নূর এবং আরিফদের আরিফ। নকশবন্দী তরিকার পথপ্রদর্শক এবং আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা।

জন্ম ও শিক্ষা

হযরত জামালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ ১২০৩ হিজরি সনে দাগেস্তানের গাজিকুমুক প্রদেশের কুবু জিলায় জন্মগ্রহণ করেন।

পরিণত বয়সে তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের আলিম হন। কুরআন ও হাদিসের ওপর তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো। ফিকাহ ও যুক্তিবিদ্যায় তিনি উচ্চতর বিদ্যার্জন করেন। একই সময় বিজ্ঞান ও গণিতের ওপর ডিগ্রি লাভ করেন। একজন ভাষাবিদ হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিলো। আরবি, ফার্সি, উর্দু, ইংরেজি, পাস্তু, হিন্দি, রাশিয়ান, তুর্কি ও দাগেস্তানি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তিনি কুরআনের হাফিজ ছিলেন এবং ৭ লক্ষাধিক হাদিস মুখস্ত করেছিলেন বলে কথিত আছে। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। একজন সুদক্ষ লেখক হিসেবে সুপরিচিত এই জ্ঞানতাপস ইলমে তাসাওউফের ওপর “আদাবুল মুরিদিয়া ফীত তারিক্বাতুন নকশবন্দিয়া” নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনেকের মতে হযরত শায়খ সাঈদ জামালুদ্দিন তাঁর সময়ের কুতুব ছিলেন।

হযরত সাঈদ জামালুদ্দিনের পীর ছিলেন নকশবন্দী সুফি শায়খ ইসমাঈল রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন দাগেস্তানের প্রধান নকশবন্দী শায়খ। একই সময় দাগেস্তানের অপর দুজন শায়খ খাস মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ মুহাম্মদ আফিন্দি ইয়ারাগী রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকেও তিনি খিলাফত লাভ করেন।

অত্যাচারী শাসকের জন্য কাজ করা থেকে ইস্তিফা

পরিণত বয়সে একজন সুশিক্ষিত যুবক হিসেবে হযরত জামালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ গাজিকুমুক প্রদেশের শাসনকর্তার ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কর্মস্থলে যোগ দেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন এ কাজ করেন নি। তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন যার দ্বারা আমি সাত আসমান পর্যন্ত অবলোকন করতে পারি। আমি একজন অত্যাচারী শাসকের সচিব হিসেবে কাজ করতে পারবো না।" কাজ ছেড়ে তিনি ইলমে তাসাওউফের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সময়ে নকশবন্দী শায়খগণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। পরবর্তীতে একজন নকশবন্দী শায়খ হিসেবে হযরত জামালুদ্দিনও শায়খ শামিল নামক একজন জিহাদীর পরামর্শক হিসেবে অবির্ভুত হন।

হযরতের বাণী ও শিক্ষা

১. তিনি বলেন, "তোমাকে তোমার জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে। যদি তা ব্যবহার না করো, তাহলে এ জ্ঞানকেই তোমার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হবে।"

২. "অদ্বিতীয় এককত্বের মাক্বামের দিকে অগ্রসরের প্রথম পদার্পণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটির অনুসরণ: 'এভাবে আল্লাহর ইবাতদ করো, যেনো তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো।'"

৩. "একজন আলিমের ইবাদত বাদশাহদের মুকুট থেকেও উত্তম।"

৪. "আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান সম্পর্কে অবগত করছি তা যদি আমার থেকে হতো, তাহলে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। কিন্তু বাস্তকে এটা তাঁর [আল্লাহ] থেকে। আর তাঁর থেকে হওয়ায় এটা কখনও নিশ্চিহ্ন হবে না।"

৫. "আমলের মধ্যে একটি হচ্ছে যার খবর ফিরিশতারাও রাখেন না, তাহলো [খফি] জিকরুল্লাহ।"

৬. সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক উত্তম মাক্বাম হচ্ছে আল্লাহর এককত্বের মাঝে বিলীন হওয়া।"

৭. "তোমার সময়ের হিসেব রাখো- কারণ এটা চলে যাচ্ছে। এটা কখনও আর ফিরে আসবে না। ধিক্কার অমনোযোগীর ওপর। চেইনের সংযুক্তির মতো তোমার জিকিরকে

একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করো। এ থেকে তুমি উপকৃত হবে। জাগতিক বিষয়ের মধ্যে তোমার হৃদয়কে সম্পৃক্ত রেখে ব্যস্ত করো না। কারণ, এতে করে তোমার অন্তর থেকে আখিরাতের গুরুত্ব হারিয়ে যাবে।”

৮. “ওলিদের জীবনগল্প যেনো আল্লাহর সৈন্যসামন্ত যার দ্বারা মুরিদের মাক্বাম ও মা’রিফাতের গুপ্ত জ্ঞানের পুনর্জাগরণ হয়। এর প্রমাণ মিলে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহ তা’আলা তাঁর রাসূলকে [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: “আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যদ্দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।” [১১:১২০]”

৯. “তোমার হৃদয়ে আল্লাহর সাথে থেকো। তোমার দেহ মানুষের সঙ্গে রাখবে। কারণ যে সুহবতে থাকে সে দলভুক্ত, আর যে দলকে ছেড়েছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। যে কেউ তার গোপন রহস্যাবলী মানুষের নিকট প্রকাশ করবে সে পরীক্ষা ও প্রলোভনের শিকার হবে এবং প্রভু ও তার মাঝখানে পর্দা পড়বে।”

১০. “মানুষের জন্য সর্বাধিক বড় বিপদসংকেত হচ্ছে কিবর [গর্ব]।”

১১. “আল্লাহর এককত্বের জ্ঞান হচ্ছে সুফিদের বৈশিষ্ট্য। এর ফলেই তাঁরা চিরন্তন ও ক্ষণস্থায়ীর মধ্যে পার্থক্যনির্ণয় করতে পারেন।”

কারামত

১. বলা হয়ে থাকে হযরত সাঈদ জামালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর অতিরিক্ত দুটি চোখ ছিলো। এর একটি ছিলো নাভির নিচে ও অপরটি নাভির উপরে। শিশুকালে লোকজন তাঁর এ দুটি চোখসদৃশ স্থান অবলোকন করেছেন।

২. তিনি একদিন মুরিদানের সাথে বসে আপেল খাচ্ছিলেন। একটি আপেল থালা থেকে তুলে উপরের দিকে ছুড়ে মারলেন। হযরতের এ শিশুশূলভ আচরণ দেখে সবাই অবাক হলেন। তিনি মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, “আমার এ কাজের অপব্যাখ্যা তোমরা করো না। মাত্র চার ঘন্টা পরে আমার এরূপ কর্মের মর্ম তোমরা অবগত হবে। তখন দেখবে পাশের গ্রাম থেকে একজন মুরিদ আসবে। তোমরা সবকিছু বুঝতে পারবে।”

হযরতের কথামতো ঠিকই একজন মুরিদ আসলেন। তিনি বললেন, ‘‘ইয়া শাইখী! আমার ভাই মারা গেছেন।’’ শায়খ বললেন, ‘‘ওহ! তাই হয়েছে। এবার বলো ঠিক কখন তার মৃত্যু হয়েছে।’’ মুরিদ বললেন, ‘‘চার ঘন্টা পূর্বে’’। এবার শায়খ সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, ‘‘মৃত ব্যক্তিটি আমার একজন মুরিদ ছিলেন। আমি আজরাইল আলাহিসসালামকে দেখলাম। তিনি আমার মুরিদের দিকে খুব রাগান্বিত হয়ে আসছেন। আমি ঐ আপেলটি উপরের দিকে ছুড়ে মেরে তাঁকে স্থির করে দিলাম। আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহর দরবারে ফিরে যান এবং বলুন, সাঈদ জামালুদ্দিন আবদার জানাচ্ছে এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন ও উত্তম মৃত্যু দিন। আজরাইল আলাইহিসসালাম সুখবর নিয়ে ফিরে আসলেন। আল্লাহ তা’আলা তাকে ক্ষমা করেছেন।’’

৩. একদিন কাদান অঞ্চল থেকে একদল লোক হযরত সাঈদ জামালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তারা সালাহউদ্দিন আয়শা নামক একজন বৃদ্ধার বাড়ির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলা তাদেরকে দেখে বললেন, ‘‘তোমরা যখন শায়খের দরবারে যাবে তখন বলবে, আমাকে মুরিদা করার জন্য। আমি তাঁর নিকট যেতে অপারগ।’’

হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তারা সালাহউদ্দিন আয়শার জন্য জিকির কী হবে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ‘‘তার নিকট এই কাপড়ের গাঁটটি নিয়ে যাও।’’ তারা তা-ই করলেন। আয়শা কাপড়ের গাঁট হাতে তুলে ছড়ালেন ও এতে দৃষ্টিপাত করে বললেন, ‘‘আমি বুঝেছি! আমি বুঝেছি!’’ এরপর তিনি এটি মাথার উপর রাখলেন। তারপর ভেতরবাড়ি চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর এক জগ দুধ নিয়ে ফিরে আসলেন। বললেন, ‘‘আপনারা এই জগটি শায়খের নিকট নিয়ে যান।’’ তারা দুধভর্তি জগ নিয়ে শায়খের দরবারে ফিরে আসলেন। শায়খ তখন ভীষণ যন্ত্রণায় ছিলেন, কারণ শহরের শাসক তাঁকে আক্রমণ করেছিল। তিনি জগের দুধ পান করে বললেন, ‘‘আলহামদুলিল্লাহ! এ দুধের ওয়াসিলায় আমি সুস্থ হয়েছি। ঐ বৃদ্ধা এ দুধ হরিণী থেকে দহন করেছেন। তিনি খুব জ্ঞানবান। তিনি আমাকে সহজেই সনাক্ত করতে পেরেছেন। আমি ঐ কাপড়ের গাঁটের ভেতর জ্বলন্ত একটি কয়লাখণ্ড রেখেছিলাম। সেটি কাপড়কে দগ্ধ করে নি। আয়শা কয়লাখণ্ড তুলে নিয়ে আমাকে দুধ প্রেরণ করেছেন। কারণ

দুগ্ধ হচ্ছে হৃদয়ের পবিত্রতার চিহ্ন। আয়শা তা পাঠিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, "আমি তরিকায় ভ্রমণের কাঠিন্যতাকে গ্রহণ করলাম। আমি আমার হৃদয়ের পবিত্রতাকে আপনার তরে উৎসর্গ করলাম।"

গ্রামের লোকজন সালাহউদ্দিন আয়শার নিকট ফিরে যেয়ে সবকথা খুলে বললেন। বৃদ্ধা এবার বললেন, "শুনুন! আমি যখন জ্বলন্ত কয়লাখণ্ড দেখলাম তখন দুটি হরিণী আমার দরোজার সম্মুখে এসে হাজির হলো। আমি কখনও এদের দেখি নি। আমি বুঝতে পারলাম এদেরকে দহন করে দুগ্ধ বের করতে হবে। এরপর তা পাঠিয়ে দিতে হবে হযরত সাঈদ জামালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর নিকট।"

৪. একদা হযরত সাঈদ জামালুদ্দিন গুমুক্কী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ভক্ত-মুরিদদের নিয়ে শহরের বড় মসজিদে ইশার নামায জামা'আতে আদায় করছিলেন। নামায শেষে সবাই বের হয়ে গেলেন এবং মুয়াজ্জিন দরোজায় তালা লাগালেন। এদিকে সকলের অজান্তে ভেতরে একব্যক্তি আটকা পড়ে যান। তিনি একটি বড় পিলারের নিকটে ছিলেন তাই তাকে কেউ দেখতে পায় নি। তিনি ছিলেন হযরতের একজন বিশিষ্ট মুরিদ, অরকালিসা মুহাম্মদ। মুরিদ নিজে নিজে বলছিলেন, "হে অরকালিসা মুহাম্মদ! এখন তুমি একা, কেউ তোমার সাথে নেই। নিজেকে তুমি রক্ষা করো!" এরপর নিজেই আবার প্রশ্ন করলেন, "কীভাবে আমি আমাকে রক্ষা করবো? আমি তো এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সৃষ্ট সর্বাধিক অধম বান্দাহ। আমি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে কসম খাচ্ছি যে, যদি তা মিথ্যা হয় তাহলে আমার স্ত্রীকে আমি তালাক দেবো!" মুরিদ তখন জানতেন না, তার শায়খও অপর আরেকটি পিলারের পেছনে লুকিয়ে ছিলেন এবং তিনি সবকিছু শ্রবণ করছেন।

শায়খ মুরিদের হৃদয়পানে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখলেন সত্যিই সে বিশ্বাস রাখে, সে-ই হচ্ছে জগতে সর্বাধিক অধম লোক। তিনি তার সামনে যেয়ে হেসে হেসে বললেন, "অরকালিসা! এখানে এসো"। মুরিদ হযরতকে দেখে আশ্চর্যবোধ করলো। সে ভেবেছিলো মসজিদের ভেতর আর কেউ নেই। শায়খ বললেন, "তুমি সঠিক বলেছো। তুমি খুবই আন্তরিক।" এরপর হঠাৎ মুরিদ উপরের দিকে উঠে মসজিদের ছাদে গিয়ে ধাক্কা

খেলো। এরপর নিচে নেমে আসলো। এভাবে ৭ বার উপরে উঠলো ও নিচে নামলো। পরবর্তীতে এই মুরিদ বেলায়াতের দরোজায় উপনিত হয়েছিলেন।

ইস্তাম্বুলে বসবাস ও ইন্তিকাল

শায়খ জামালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ শেষ বয়সে স্বপরিবারে ইস্তাম্বুল শহরে যেয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি সমগ্র তুর্কীস্তানে নকশবন্দি তরিকার বিকাশ ঘটান। একদিন তাঁর আশপাশ অঞ্চলে বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তখনকার দিনে অধিকাংশ বাড়ি ছিলো কাঠের তৈরি। দ্রুত বাড়িঘর জ্বলেপুড়ে ছাই হচ্ছিল। লোকজন ছুটে এলো হযরতের বাড়িতে। অগ্নি থেকে বাঁচার জন্য বললো, “হযরত! বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে উত্তম হবে।” তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন, “আমি কখনও বাড়ি ত্যাগ করবো না। আমার বাড়িটি পুড়বে না- আল্লাহ তা’আলা রক্ষা করবেন। এ বাড়িটি তৈরি হয়েছে নিজের হালাল রুজির টাকা থেকে। আর নিষ্কলুষ হালাল টাকায় তৈরিকৃত বাড়ি পুড়ে যেতে পারে না।” সত্যিই তা-ই হলো। আশপাশ সমগ্র অঞ্চলের সব বাড়িঘর জ্বলে ভষ্মিভুত হলো, কিন্তু হযরতের বাড়িতে আগুন স্পর্শই করলো না। উল্লেখ্য, হযরতের এই বাড়িটি এখনও সংরক্ষিত আছে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে ডেকে বললেন, “আজ আমি বেশ তাকলিফ করেছি। ফলে দুর্বল হয়ে গেছি। তোমরা যখন খবরের কাগজ পড়বে তখন দেখবে একটি বড়ো জাহাজ বসফোরাসে ডুবে গেছে। কেউ মারা যবে না। এক অপরিচিত ব্যক্তি তাদেরকে উদ্ধার করবে। এই অপরিচিত ব্যক্তি হচ্ছি আমি। তোমরা এব্যাপারে জানবে।” এরপর তিনি পৃথিবীর জমিন থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। সত্যিই কদিন পরে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা খবরের কাগজে দেখলেন বসফরাসে একটি বড়ো জাহাজ ডুবে গেছে। এক অজানা ব্যক্তির চেষ্টায় সবাই বেঁচে যান। খবরের কাগজের এই রিপোর্টটি এখনও সংরক্ষিত আছে।

হযরত শায়খ সাঈদ জামালুদ্দিন গুমুক্কী রাহিমাহুল্লাহ ৫ শাওয়াল ১২৮৫ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ইস্তম্বুলের উসকুদারে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর মাক্বামাতকে বুলন্দ করুন।

শায়খ হাজী দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

ওফাৎ- ১২৮৪ হিজরি, সমাধি- মূসা জাই শরীফ, দীরা ইসমাঈল খান, পাকিস্তান।

হযরত শায়খ হাজী দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দিদী ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা। ঈসায়ী উনিশ শতকে তিনি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে বসবাস করেছেন।

আফগানিস্তানের কান্দাহারের নিকটস্থ দুরানী পরিবারের খাজা মুল্লা আলী ছিলেন তাঁর পিতা। তাঁর জন্ম হয় ১২১৬ হিজরি [১৮০১/২ ঈ.] সনে। স্বীয় জন্মস্থানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে চলে যান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে।

মজযূবের ভবিষ্যদ্বাণী

ইলমে শরীয়তের ওপর শিক্ষাকালে তিনি তাসাওউফের প্রতিও আকৃষ্ট হন। কাবুলে বসবাসরত বিভিন্ন আউলিয়ায়ে কিরামের সুহবতে যেতে তিনি বিশেষভাবে ভালোবাসতেন। অনেক সুফি দরবেশের সমাধিও ছিলো আফগানিস্তানে। তিনি প্রায়ই এসব সমাধিতে যেয়ে ধ্যানস্থ হতেন। একদিন তিনি বাবা ওয়ালী রাহিমাহুল্লাহর সমাধিতে যেতে যাত্রা করেন, সাথে ছিলেন সহপাঠী কয়েকজন ছাত্র। যাত্রাকালে পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলো এক মযজূবের সাথে। মযজূব একেক জনকে একেক রকম উপদেশ দিলেন। দুস্ত মুহাম্মদকে কিছু বলার সময় মযজূব বললেন, "এ ছাত্রটি একদিন কামিল ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। তিনি সুফিদের দলভুক্ত। তাঁর কপালে আমি মা'রিফাতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।"

হারাইমানে অবস্থান

শিক্ষা সমাপ্ত করে হযরত দুস্ত মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ মক্কা মুকাররমায় যেয়ে এক নাগাড়ে বহুদিন অবস্থান করেন। সেখানে থাকাবস্থায় প্রতি বছরই পবিত্র হজ্জ পালন করেছেন ও মদীনা মুনুওয়ারায় যেয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে

ভক্তিভরে সালাম জানিয়েছেন। এছাড়া মদীনা শরীফে থেকে মাঝে মধ্যে মসজিদে নববীতে হাদিসের দারসে অংশগ্রহণ করেন।

একদিন তিনি দিল্লীর বিখ্যাত নকশবন্দী শায়খ হযরত শাহ আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর কথা কারো নিকট থেকে শ্রবণ করলেন। তাঁর মন এ শায়খের সাথে সাক্ষাতের জন্য আকুল হয়ে ওঠলো। তিনি কালবিলম্ব না করে ভারতের রাজধানী দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর যাত্রাপথে ছিলো কান্দাহার, গজনি ও কাবুল। এরপর যখন তিনি পেশওয়ারে এসে যাত্রাবিরতি করেন তখন সংবাদ পেলেন যে, শাহ আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহ ইন্তিকাল করেছেন। এ খবর পেয়ে তিনি ভীষণভাবে মর্মাহত হলেন। অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কান্দাহার হয়ে কাবুলে ফিরে আসলেন। পুনরায় ইলমে শরীয়তের প্রতি মনোযোগ দিলেন।

হযরত হাজী দুস্ত মুহাম্মদের হৃদয় এ সময় অনেকটা আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। এর মূল কারণ হলো পবিত্র হজ্জ পালন ও মদীনা মুনুওয়ারায় অবস্থান। তিনি সময় সময় আল্লাহর মুহাব্বতে এতোই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন যে, কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেতেন। এমনও হয়েছে যে, কোনো কোনো সময় একাধারে কয়েকদিন যাবৎ তিনি প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতেন। তাঁর হৃদয়ে শুরু হয়েছিলো ভীষণ উচাটন ও জ্বালা-যন্ত্রণা। এই আত্মিক অসহ যন্ত্রণা ও হতাশা থেকে মুক্তি পেতে তিনি ভ্রমণ করলেন বাগদাদে।

গাউসুল আজমের সমাধিতে

হযরত হাজী দুস্ত মুহাম্মদ আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও খোরাক যোগান দিতে বাগদাদে এসে গাউসুল আজম হযত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী [৪৭০-৫৬১ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমাধিতে এসে উপস্থিত হলেন। কিছুদিন এখানে অবস্থান করে চলে গেলেন হিরাতে। সেখানে অবস্থান করছিলেন শায়খ আবদুল্লাহ হিরাতী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন শাহ গোলাম আলী হেদলবী রাহিমাহুল্লাহর একজন বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা খালিদ বাগদাদী কুর্দী রাহিমাহুল্লাহর খলিফা। হযরত হিরাতী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে তিন মাস পর্যন্ত অবস্থানের পর পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসলেন। এখানে মাওলানা খালিদ সাহেবের আরেকজন খলিফা ছিলেন যার নাম শায়খ মুহাম্মদ জাদিদ রাহিমাহুল্লাহ। হযরত দুস্ত

মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁরই সুহবতে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু তখনও তাঁর অন্তরের অস্থিরতা দূর হয় নি। সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কামিল মুর্শিদের মুরিদ হওয়া। তিনি কার কাছে মুরিদ হবেন তার কোনো ইঙ্গিতও পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তিনি জানতে পারলেন যে, শাহ গোলাম আলী রাহিমাহুল্লাহর সর্বপ্রধান খলিফা শাহ আবু সাঈদ দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ দিল্লীর খানক্বায়ে মাজহারিয়ায় অবস্থান করছেন। তাঁর মন চাইলে সেখানে যেয়ে হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করবেন।

পীরের সুহবতে

হযরত দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহিমাহুল্লাহ ঈসায়ী ১৮৩৪ সালে মুম্বাই পৌঁছান। সেখানেই তিনি সাক্ষাৎ পেলেন হযরত আবু সাঈদ দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর। তিনি পবিত্র হজ্জে গমনের উদ্দেশ্যে সাথীদেরসহ মুম্বাই অবস্থান করছিলেন। হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণের অনুরোধ জানালে, তিনি জবাব দিলেন, “তুমি আমার পুত্র শাহ আহমদ সাঈদের নিকট চলে যাও। তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করো। তোমার আশা আল্লাহ তা’আলা পূরণ করবেন।” সুতরাং অবশেষে তিনি দিল্লীতে এসে হযরত শাহ আহমদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহর সুহবত লাভে ধন্য হলেন। প্রথম সাক্ষাতেই শায়খের উজ্জ্বল নূরান্বিত চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করে হযরত দুস্ত মুহাম্মদের অন্তরের জ্বালাতন পশমিত হয়ে গেলো। হঠাৎ যেতো তিনি অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করলেন। তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা অবশেষে শায়খের অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তিনি শায়খ আহমদ সাঈদ ফারুকী মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহর নিকট সবিনয়ে আবদার করলেন, “ইয়া শায়খ! এই অধম দুস্ত মুহাম্মদকে আপনার মুরিদ ও খাদিম হিসেবে গ্রহণ করুন।”

খিলাফত লাভ

হযরত শায়খ হাজী দুস্ত মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ এক নাগাড়ে ১৪ মাস খানক্বায়ে মাজহারিয়ায় স্বীয় পীরের সুহবত ও খিদমাতে অবস্থান করেন। তিনি খুব দ্রুত ‘মানাযিলে মা’রিফাত’ একটার পর আরেকটা পার হয়ে গেলেন। নকশবন্দী তরিকা মুতাবিক জিকির-শুগল-মুরাক্বাবার সবক নিয়মিত আদায় করে করে আরোহণ করলেন সুলুকের উচ্চতর মাক্বাম ‘ফানা’ ও ‘বাকা’র স্তরে। অবশেষে একদিন [১৮৩৬ ঈ.] শায়খ শাহ আবু সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে কাছে ডেকে এনে বললেন, “হে দুস্ত মুহাম্মদ! তোমাকে আল্লাহর

নির্দেশে খিলাফতের দায়িত্ব প্রধান করলাম।” খিলাফত প্রধানের সময় তিনি এটাও বললেন, “শুধু নকশবন্দী নয়, আরো ৭টি তরিকায় তুমি খিলাফতের দায়িত্ব নিলো। এগুলো হলো চিশতি, কাদিরী, সুহরাওয়ার্দি, ক্বলন্দরি, কুবরাবি, মাদ্দারি ও শাত্তারি।”

হযরত দুস্ত মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর জীবনীগ্রন্থসমূহে উক্ত ৮টি তরিকার সিলসিলা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা নিচে নকশবন্দী স্বর্ণালী সিলসিলাটি লিপিবদ্ধ করলাম।

* হযরত খাজা দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহিমাহুল্লাহ।
* হযরত শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দিদী ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ।
* হযরত শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দিদী ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ।
* হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ।
* হযরত মীর্জা মাজহার জানে জানান রাহিমাহুল্লাহ।
* হযরত সাঈদ নূর মুহাম্মদ বাদাইউনী রাহিমাহুল্লাহ।
* হযরত হাফিজ মুহাম্মদ মুহসিন দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ।
* হযরত খাজা সাঈফুদ্দিন সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ।
* হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সুম সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ।
* হযরত ইমামে রব্বানি মুজাদ্দিদী আলফে সানি শায়খ আহমদ সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহ।

কান্দাহারে প্রত্যাবর্তন

শায়খ আহমদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ একদিন হযরত দুস্ত মুহাম্মদকে বললেন, “হে দুস্ত মুহাম্মদ! এবার তোমাকে স্বীয় জন্মস্থানে ফিরে যেতে হবে। আফগানিস্তানের মানুষকে ইলমে তাসাওউফের দিকে আহ্বান জানাবে। তাঁদেরকে শরীয়ত ও তরিকতের শিক্ষা দেবে।” সুতরাং তিনি এ নির্দেশ পেয়ে আফগানিস্তানের কান্দাহারে ফিরে আসলেন।

তিনি মূসা জাই শরীফের খানক্বায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অতি দ্রুত সমগ্র এলাকাব্যাপী তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমিয়ে উপকৃত হন। অনেক আলিম ও সুফি শায়খরা পর্যন্ত তাঁর সুহবতে এসে আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভ করেন। তিনি মোট তিনটি খানক্বাহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে শেষমেষ প্রধান খানক্বাহ পাকিস্তানের দেরা ইসমাঈল খানে মূসা জাই শরীফেই শেষ জীবন অতিক্রম করেন।

হযরতের খুলাফাবৃন্দ

একদা তাঁর শায়খ বললেন, "হাজী দুস্ত মুহাম্মদ আমার নিকট ঠিক তেমন, যেমন ছিলেন মাওলানা খালিদ বাগদাদী আমার শায়খের নিকট।" হাজী সাহেবের খলিফাদের সংখ্যা অনেক। এরা বর্তমান আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ইলমে তাসাওউফের খিদমাত করে গেছেন। তাঁর প্রধান খলিফা ছিলেন হযরত খাজা মুহাম্মদ উসমান দামানী রাহিমাহুল্লাহ। নিচে আমরা তাঁর ৮ জন খলিফার নাম লিপিবদ্ধ করছি।

১. হযরত খাজা মুহাম্মদ উসমান দামানী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৮৯৭ ঈ.]।

২. হযরত মাওলানা আমানুল্লাহ হিরাতী রাহিমাহুল্লাহ।

৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আদিল জব বেলুচিস্তানী রাহিমাহুল্লাহ।

৪. হযরত মাওলানা রহিম বকশ আজমিরী রাহিমাহুল্লাহ।

৫. হযরত মাওলানা গোলাম হাসান দিরা ইসমাঈল খান রাহিমাহুল্লাহ।

৬. হযরত মাওলানা শের মুহাম্মদ কুলাচী রাহিমাহুল্লাহ।

৭. হযরত শায়খ মুল্লা ক্বিতার আখুন্দজাদা রাহিমাহুল্লাহ।

৮. পীর সাঈদ মুহাম্মদ শাহ জিলানী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন গউসুল আজম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর।

মূল্যবান বাণী

১. তিনি বলেন, "একটুকু উত্তম আমল হাজারটি জ্ঞান থেকেও উত্তম। আর একটুকু হাক্ব ইখলাস [আন্তরিকতা] হলো হাজারটি আমল থেকেও উত্তম। অল্প একটু আল্লাহপ্রেম হাজারটি ইখলাস থেকেও উত্তম। আর একটুকু খোদাপ্রেমের অশ্রু হাজারটি প্রেম ও অনুরাগ থেকেও উত্তম।"

২. হযরত বলেন, "কৃষিকাজের ধরন দুটি: (১) বাহ্যিক চাষাবাদ যার মাধ্যমে উৎপাদিত হয় দেহের পুষ্টির জন্য জরুরী খাবার ও এনার্জি। (২) অভ্যন্তরীণ চাষাবাদ যা হচ্ছে আখিরাতের জন্য খোরাক। আর এটা উৎপাদিত হয় জিকরুল্লাহ, আধ্যাত্মিক সাধনা ও আত্মশুদ্ধির সংগ্রামের মাধ্যমে।"

৩. হযরত দুস্ত মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ একদা বললেন, "একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিকে এই রাস্তায় পাড়ি জমানো অনেকটা সহজ। এর কারণ হলো, সে তাঁর পীরের নির্দেশনা

বিনাবাক্যে মেনে নেবে। যৌক্তিক কারণ সে খুঁজবে না। অপরদিকে একজন আলিম যিনি সর্বদাই সন্দেহ ও সমালোচনামূখর থাকেন।”

৪. তিনি বলেন, “আমি নিজেকে সর্বাদিক গোনাহগার মনে করি এবং আমার শায়খকে সবার চেয়ে উত্তম ভাবি।”

৫. একদিন তিনি হযরত আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহর ‘মাকতুবাত’ এর ৭০ নং পত্রটি পাঠ করছিলেন। এক পর্যায়ে মন্তব্য করলেন, “মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ একক। সুতরাং শায়খও একজন থাকা চাই। এক শায়খ থেকে বেশি হলে তরিকতের ব্যাপারটি চতুর্দিকে ছিটকে পড়বে। তরিকতের ইমাম খাজা সাইয়্যিদ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নকশবন্দ মুশকিল-কুশা বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, তুমি যখন আমার হাতে তোমার হাতকে সোপর্দ করেছো জিকির শিখতে এবং আমাকে বানিয়েছো তোমার শায়খ, তাহলে প্রত্যেক দরোজায় যাবে না- একটিমাত্র দরোজার সম্মুখেই অনড় থেকো।”

ইন্তিকাল

অস্থায়ী এ পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে জীবিত থাকার জন্য কাউকেই আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টি করেন নি। তবে আল্লাহ যা চান তা-ই করতে পারেন। হযরত খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকের মতে এখনও জীবিত আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। হয়তো বা আরো কেউ এভাবে থাকলে থাকতেও পারেন- আমাদের জানা নেই। তবে সবার মতো যুগের এক উচ্চ পর্যায়ের ওলি হাজী শায়খ দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহিমাহুল্লাহও একদিন তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরিদান-খলিফা-শুভাকাঙ্ক্ষীদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে আলমে বরযখের দিকে পাড়ি জমান। তাঁর ইন্তিকালের দিনটি ছিলো ২২ শাওয়াল ১২৮৪ হি. মুতাবিক ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮ ঈসায়ী। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি পাকিস্তানের দেরা ইসমাঈল খানে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত খানক্বাহ মূসা জাই শরীফেই সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন।

হযরতের মাকতুবাত [পত্রাদি] পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে। এটির উর্দু অনুবাদ ‘তুহফায়ে ইব্রাহিমিয়া’ শিরোনামের গ্রন্থটি এখনও প্রাপ্য আছে।

শায়খ খাজা মুহাম্মদ উসমান দামানী নকশবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ- ১৩১৪ হিজরি, সমাধি- মূসা জাই শরীফ, দীরা ইসমাঈল খান, পাকিস্তান।

হযরত শায়খ মুহাম্মদ উসমান দামানী নকশবন্দি মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হযরত হাজী দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা। স্বীয় পীরের ইন্তিকালের পর তিনি খানক্বায়ে মূসা জাই শরীফের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জন্ম ও জীবন

হযরত উসমানের জন্ম হয় ১২৪৪ হিজরি সনে বর্তমান পাকিস্তানের দীরা ইসমাঈল খান জিলাধীন তেহসিল কুলাচি অঞ্চলের লুনি নামক একটি গ্রামে। তাঁর পূর্বপুরুষরা হচ্ছেন, পিতা- মাওলানা মুহাম্মদ মূসা জান, তাঁর পিতা- মুল্লা আহমদ জান, তাঁর পিতা- মুল্লা আবদুল হালিম, তাঁর পিতা- মুল্লা আবদুল করিম, তাঁর পিতা- মুল্লা কাজি শামসুদ্দিন। আফগানিস্তানের বিখ্যাত দুরানী গোত্রের আচাখজাই শাখার বংশধর ছিলেন হযরত উসমান দামানী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর পূর্বপুরুষ শামসুদ্দিন ছিলেন আহমদ শাহ আবদালী দুরানী [১৭২২-১৭৭২ ঈ.][54] সময়কার কান্দাহারের কাজি।

অল্প বয়সে ইয়াতীম

তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন তাঁর পিতা মাওলানা মুহাম্মদ জান মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি ও তাঁর ছোট ভাই মুহাম্মদ সাঈদ ইয়াতীম হয়ে গেলেন। হযরতের মামার নাম ছিলো মাওলানা নিযামুদ্দিন। তিনি ভাগিনাদ্বয়ের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। নিজেই একজন আলিম, সুতরাং ভাগিনাদ্বয়কে ইলমে দ্বীন শিক্ষাদানে ব্রত হলেন।

---

[54] তিনি আহমদ খান আবদালী নামেও খ্যাত। দুরানী সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিলো বর্তমান আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং উত্তর-পূর্ব ইরানের কিছু অঞ্চল পর্যন্ত। দুরানী সম্রাজ্য থেকেই আধুনিক আফগানিস্তানের জন্ম। সূত্র: উইকিপিডিয়া.কম।

ইলমে তাসাওউফের প্রতি আকর্ষণ

ইলমে শরীয়ত দ্বারা মাওলানা মুহাম্মদ উসমান দামানী সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাযকিয়ায়ে নফস্ অর্জন মূলত প্রত্যেক মু'মিনের জন্য ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন সর্বযুগের ফকীহবৃন্দ। কিন্তু তা অর্জনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে কোনো হক্কানী পীরের সুহবত লাভ। তাযকিয়ায়ে নফস খুব অল্পজনই নিজে নিজে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এর কারণ হলো, এটি সুহবত ও অনুসরণ দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়- অন্য কোনো পথ নেই।

তখনকার দিনে খানক্কায়ে মূসা জাই শরীফের প্রতিষ্ঠাতা এবং শরীয়ত ও তরিকতের উচ্চ পর্যায়ের শায়খ ছিলেন হযরত খাজা হাজী দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং খাজা মুহাম্মদ উসমান রাহিমাহুল্লাহ তাঁরই সুহবতে যেয়ে ইলমে তাসাওউফের চর্চা শুরু করেন। মুর্শিদের নির্দেশ মুতাবিক তিনি প্রথমত নকশবন্দি তরিকার জিকির-শুগল-মুরাক্কাবা করে উৎকর্ষ লাভ করেন। এরপর অন্যান্য প্রসিদ্ধ তরিকায়ও উচ্চ পর্যায়ের মাক্কামে আরোহণ করেন।

দীর্ঘদিন মুর্শিদের সুহবত ও খিদমতে থেকে খাজা উসমান দামানী রাহিমাহুল্লাহ ৮টি তরিকায় খিলাফত লাভ করেন। এই আটটি তরিকা ও এগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের নাম হচ্ছে:
১. চিশতিয়া - প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৩২৯ হি., দামেস্ক, সিরিয়া]
২. ক্বাদিরিয়া - প্রতিষ্ঠাতা গাউসুল আজম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৫৬১ হি., বাগদাদ]।
৩. সুহরাওয়ার্দিয়া - প্রতিষ্ঠাতা খাজা উমর ইবনে মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৬৩২ হি., বাগদাদ]
৪. কুবরাবিয়া - প্রতিষ্ঠাতা খাজা নাজমুদ্দিন ইবনে উমর কুবরা রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৬১৮ হি., খোওয়ারিজম]।
৫. নকশবন্দিয়া - প্রতিষ্ঠাতা খাজা মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৭৯১ হি., বুখারা]।

৬. মাদারিয়া - প্রতিষ্ঠাতা হযরত বদিউদ্দিন আহমদ জিন্দা শাহ মাদার রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৮৩৭ হি., মকনপুর, ইউপি, ভারত]।
৭. ক্বলন্দরিয়া - প্রতিষ্ঠাতা হযরত শায়খ শরফুদ্দিন বু-আলী শাহ ক্বলন্দর রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৭২৪ হি., পানিপথ]।
৮. শাত্তারিয়া - প্রতিষ্ঠাতা শায়খ সিরাজুদ্দিন আবদুল্লাহ শাত্তার রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৮০৮ হি., ভারত]

তাঁর কারামত ও কাশফ

কাশফ ও কারামত ওলি হওয়ার কোনো শর্ত নয়। তবে সময় সময় কোনো কোনো ওলির ক্ষেত্রে বিশেষ কারণবশত এগুলোর প্রকাশ ঘটতে পারে। আর সব কারামত ও কাশফ একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই হয়ে থাকে। মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুজনদেরই নির্বাচন করেন। হযরত খাজা উসমান দামানী রাহিমাহুল্লাহর মাধ্যমেও বেশ কিছু কাশফ ও কারামতের প্রকাশ ঘটেছিল। আমরা এখানে কয়েকটির বর্ণনা দিচ্ছি।

১. আওলিয়ারা অনেক গোপন তথ্য জানেন: একদিন তাঁর এক মুরিদ মাওলানা হুসাইন আলী ভাবলেন, সত্যিকার অর্থে কী আউলিয়ারা কাশফ ও কারামতের অধিকারী হতে পারেন? একথা ভাবতে ভাবতে তিনি স্বীয় শায়খের সামনে উপস্থিত হলেন। হযরত তখন পাস্তু ভাষায় কিছু মুরিদানের সাথে আলাপ করছিলেন। মাওলানা সাহেব কক্ষে প্রবেশ করে শ্রোতাদের পেছনে বসে পড়লেন। হযরত উসমান দামানী রাহিমাহুল্লাহ হঠাৎ মাওলানার দিকে তাকিয়ে ফার্সি ভাষায় বললেন, "মৌলভী সাহেব! আউলিয়ারা অনেককিছু জানেন, কিন্তু সবকিছু প্রকাশ করতে তাঁদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় নি!"
২. অনুরূপ আরেকটি ঘটনা: মাওলানা হুসাইন আলী আরেকবার আউলিয়ারা সময় সময় কাশফের মাধ্যমে অজানা খবরা-খবর জানতে পারেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। তিনি তখন হযরতের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হযরত বললেন, "মৌলভী সাহেব! তোমার বাড়িতে চলে যাও। এরপর ফিরে এসো। যাকিছু সেখানে ঘটবে সে ব্যাপারে আমি তোমাকে তখন সব বলে দেবো। এতে কোনো হেরফের ঘটবে না।" বাস্তবেই তা-ই হলো।

৩. এক কেজি আটা খেয়ে একমাস: হযরত শায়খ দামানী রাহিমাহুল্লাহ খুব অল্প খাবার খেতেন। একদা দীর্ঘ এক মাসের ভ্রমণে যেয়ে মাত্র আধা কেজি গমের আটার তৈরি রুটি খেলেন। অথচ এরপরও তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও স্বাভাবিক ছিলেন। এটা সাধারণত সম্ভব নয়। মানুষ এ ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করলো।

৪. পকেট থেকে মুদ্রা বের হওয়া: একদিন তিনি ১০০ রুপি পরিমাণ মুদ্রা তাঁর পকেট থেকে বের করলেন। তিনি এগুলো তাঁর খাদিম নূর আলম খানকে দিলেন। বললেন, "লঙ্গরের [সুফি-দরবেশদের জন্য খানক্কার রান্নাঘরে তৈরিকৃত খাবার] জন্য একটি বকরি ক্রয় করে নিয়ে এসো।" নূর আলী অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, কীভাবে ছোট্ট একটি পকেট থেকে এতো মোটা মোটা একশটি মুদ্রা তিনি বের করলেন? বাস্তবে তিনি এভাবে খানক্কার সমস্ত খরচের টাকা পকেট থেকে বের করতেন। যে কোনো ভাবেই হোক হযরত শায়খ দামানী খাদিমের চিন্তা-ভাবনা ধরে ফেললেন। বললেন, "ফকিরের [নিজের ব্যাপারে বলছিলেন] পকেট হচ্ছে আফগানী একটি থলে। এর ভেতরের মাল শেষ হবে না, অন্তত আমার জীবদ্দশায় নয়!"

হযরতের খুলাফাবৃন্দ

শায়খ মুহাম্মদ উসমান দামানী রাহিমাহুল্লাহর খুলাফার সংখ্যা ত্রিশের উর্ধ্বে ছিলো। নিচে আমরা ১৬ জনের নাম তালিকাভুক্ত করলাম।

১. তাঁর পুত্র হযরত শায়খ মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিন নকশবন্দী মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৩৩৩ হি., খানক্কায়ে মূসা জাই শরীফ]।

২. হযরত মাওলানা সাঈদ লাল শাহ হামাদানী বিলাওয়ালী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৮৯৬ ঈ, দানা শাহ বিলাওয়াল, পাঞ্জাব]

৩. মাওলানা মাহমুদ সিরাজী রাহিমাহুল্লাহ।

৪. শায়খ ফাজিল আওয়ান রাহিমাহুল্লাহ।

৫. মাওলানা মুহাম্মদ রাসূল লূন খুরাশানী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৩১৪ হি.]।

৬. হাফিজ সাঈদ আহমদ আলী দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৩০০ হি.]।

৭. মাওলানা সাঈদ আকবর আলী দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ ['মাজমুয়া ফাওয়াইদ উসমানিয়া' গ্রন্থের লেখক]।

৮. মাওলানা নূর খান আওয়াস চক্রালবী রাহিমাহুল্লাহ।

৯. মাওলানা মুহাম্মদ হাশিম ভাগরবী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৮৯৬ ঈ., খানক্বায়ে ভাগার শরীফ, ইসলামাবাদ]।

১০. খাজা মাইরা ক্বলন্দর পাশিন রাহিমাহুল্লাহ।

১১. সাঈদ আমির শাহ হামাদানী বিলাওয়ালী রাহিমাহুল্লাহ।

১২. মাওলানা হুসাইন আলী রাহিমাহুল্লাহ।

১৩. মাওলানা বেগ মুহাম্মদ খুরাশানী রাহিমাহুল্লাহ।

১৪. কাজি আবদুর রাসূল আংভী রাহিমাহুল্লাহ।

১৫. মাওলানা মাহার মুহাম্মদ আওয়ান আংভী রাহিমাহুল্লাহ।

১৬. সাঈম মুহাম্মদ শাহ হামাদানী বিলাওয়ালী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন হযরত সাঈদ লাল শাহ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহর ভাতিজা।

হযরতের ইন্তিকাল

হযরত মুহাম্মদ উসমান দামানী রাহিমাহুল্লাহ দুনিয়া ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করেন ২২ শা'বান ১৩১৪ হিজরি সনে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করতে থাকেন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন স্বীয় পুত্র হযরত শায়খ মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ। হাজার হাজার মানুষ তাঁর জানাযার নামাযে শরীক হন। তিনি তাঁর প্রিয় মুর্শিদের কবরের পাশে মূসা জাই শরীফে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোপন রহস্যাবলী সংরক্ষণ করুন।

শায়খ মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিন নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ- ১৩৩৩ হিজরি, সমাধি- মূসা জাই শরীফ, দীরা ইসমাঈল খান, পাকিস্তান।

হযরত শায়খ মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিন নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন স্বীয় পিতা হযরত শায়খ মুহাম্মদ উসমান দামানী নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা। তিনি ১৫ মুহাররম ১২৯৭ হিজরি সনে বর্তমান পাকিস্তানের দেরা ইসমাঈল খান এর খানক্কায়ে মূসা জাই শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ১৪ বছর বয়সেই শেষ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুল্লা শাহ মুহাম্মদ আখন্দ [কুরআন] এবং মাওলানা মাহমুদ সিরাজী ও মাওলানা হুসাইন আলী [হাদিস ও অন্যান্য বিষয়]।

হযরত মাহমুদের পিতা তাঁকে নকশবন্দী তরিকায় দীক্ষা প্রধান করেন। তিনি তাঁকে তাসাওউফ শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব যেমন 'মাকতুবাতে ইমামে রব্বানি' কিতাবের ওপর দরসদানও করেছিলেন।

খিলাফত লাভ ও খানক্বার দায়িত্ব গ্রহণ

হিজরি ১৩১১ সনের জিলকদ মাসের ৩ তারিখ হযরতের পিতা তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন। তখনও হযরত মাহমুদের বয়স অল্প ছিলো। কেউ কেউ বলেছেন তখন তিনি মাত্র চৌদ্দ কিংবা পনেরো বছরের বালক ছিলেন। খিলাফত লাভের ৩ বছর পর ১৩১৪ হিজরি সনে তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। ফলে এই অল্প বয়সেই খানক্বায়ে মূসা জাই শরীফের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়।

পবিত্র হজ্জ পালন

হযরত মাহমুদ সিরাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ ১৬ জন বন্ধু ও সাথীদের নিয়ে ১৩২৪ হিজরি সনে পবিত্র হজ্জ পালনের নিয়তে মুক্কা মুকারমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এ পবিত্র ভ্রমণকালে সবাই বিশেষ ফয়েজ ও বরকত লাভ করেছিলেন। হজ্জব্রত পালন করে কাফেলা মদীনা মুনুওয়ারায় উপস্থিত হয় রওজা মুবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে।

সেখানে অবস্থানকালে একদিন খাজা সাহেব সালাম জানাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে গেলেন। পবিত্র সবুজ গম্বুজের নিকট তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো গম্বুজের রক্ষীর সঙ্গে। তিনি তাঁকে একটি আরবি জুব্বা ও মোমবাতি দিলেন। তিনি জুব্বা পরে বাতি জ্বালিয়ে পবিত্র রওজায়ে আতহারের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে দীর্ঘ সময় কাটালেন। ধ্যানস্থ অবস্থায় পবিত্র পরিবেশে থেকে বিশেষ ফয়েজ-বরকত হাসিল করলেন।

হযরত সিরাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর জীবন ছিলো সংক্ষিপ্ত। অথচ এরই মধ্যে তিনি অসংখ্য মানুষকে নকশবন্দী তরিকার দিক-নির্দেশনা দিয়ে উপকৃত করেছেন। কেউ কেউ মা'রিফাতের উচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অনেক আলিম-উলামাও তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তাঁর কাশফ ও কারামত সর্বজনখ্যাত। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি-ক্ষমতার কথা সবাই অবগত ছিলেন।

হযরতের খুলাফাবৃন্দ

হযরত শায়খ মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর মোট ৩৬ জন খলিফা ছিলেন বলে জানা যায়। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন পীর ফজল আলী নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহ। অতীতে তিনি হযরত লাল শাহ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফজল আলী রাহিমাহুল্লাহ হযরত সিরাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ হন। দীর্ঘ ১৭ বছর তিনি হযরতের সুহবতে থেকে খিদমাত করেন। একদা খানক্বায়ে মাজহারিয়ায় থাকাকালে হযরত সিরাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ পীর ফজল আলী রাহিমাহুল্লাহকে খিলাফত প্রদান করেন। তাঁর খলিফাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম নিচে লিপিবদ্ধ করলাম।

* হযরত শায়খ পীর ফাজল আলী কুরেশী নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ.১২৭০ হি.]।
* হযরত মাওলানা পীর গোলাম হাসান সিওয়াগ রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৩৫৮ হি.]।
* হযরত মাওলানা সাঈদ বরকত আলী শাহ রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৩৪৫ হি.]। তিনি কলকাতা ও মুম্বাইয়ে নকশবন্দি খানক্বা প্রতিষ্ঠা করেন।
* হযরত মাওলানা গোলাম হুসাইন কানপুরী রাহিমাহুল্লাহ।

* হযরত মাওলানা আবু সাদ আহমদ খান নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৯৪১ ঈ.]।
* হযরত সাঈদ বেলায়েত শাহ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহ।

মাকতুবাত

হযরত সিরাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর মাকতুবাত সংকলিত হয়েছে। এতে মোট ৪৭টি পত্র স্থান পেয়েছে। তাঁর জীবদ্দশায় কেউ কেউ খানক্কার মধ্যে সুফি সাধনার বিরোধিতা করতেন। তিনি তাদেরকে উপযুক্ত জবাব প্রধান করেন। শরীয়তে যে সুফি সাধনার অনুমতি আছে তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রমাণসহ উপস্থাপন করেন। তবে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে উদ্বুদ্ধ নতুন ওয়াহাবী ফিতনার কঠোর বিরোধিতা করেন। ভারতে তখন এই ফিতনা প্রবেশ করেছিল।

ইন্তিকাল

হযরত শায়খ মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ নশ্বর এ দুনিয়ার মায়া ছেড়ে অনন্ত জিন্দেগীর দিকে পাড়ি জমান ২৬ রবিউল আউয়াল ১৩৩৩ হিজরি। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। দিনটি ছিলো পবিত্র জুমুআর দিন। মৃত্যুকালে হযরতের বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বছর। তিনি তাঁর প্রিয় পিতার নিকটে খানক্কায়ে মূসা জাই শরীফে সমাহিত আছেন। আল্লাহর নিকট আমাদের আবদার, হে প্রভু আপনি তাঁর মাক্বামাতকে বুলন্দ করুন।

والحمد لله وصلى الله على النبي الكريم

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

কে কোথায় সমাহিত আছেন



হযরত সালমান ফারসি রাদিআল্লাহু আনহুর সমাধি সালমান পাক, মাদাইন, ইরাক।



হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, কুদাইদ, সৌদি আরব।



হযরত জাফর সাদিক্ব রাহিমাহুল্লার সমাধি, জান্নাতুল বাকি মদীনা মুনুওয়ারা, সৌদি আরব।



হযরত বায়েজিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি বিস্তাম, ইরান।



হযরত আবুল হাসান খারকানী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি বিস্তাম, ইরান।



হযরত আবু আলী ফারমাদী রহিমাহুল্লাহর সমাধি (ডানে) তুস, খুরাশান, ইরান।



হযরত আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, বাইরাম আলী, মার্ভ তুরকেমেনিস্তান।



হযরত আবদুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, গুজদাওয়ান, বুখারা উজবেকিস্তান।



হযরত খাজা আরিফ রিওগারি রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, রিওগার, বুখারা উজবেকিস্তান।



হযরত মাহমুদ আনজির ফাগনুউই রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, ওয়াবানকা [ডাবকেন্ত] উজবেকিস্তান।



হযরত আলী রামিতানী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি (মাঝে) খাওয়ারিজম, আফগানিস্তান।



হযরত খাজা মুহাম্মদ বাবা সামাসী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, সামাস, রামিতান বুখারা, উজবেকিস্তান।



হযরত সায়্যিদ আমির কুলাল রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, সুকহার, বুখারা, উজবেকিস্তান।



হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, বুখারা উজবেকিস্তান।



হযরত আলাউদ্দিন আত্তার রাহিমাহুল্লাহর সমাধি (ছবিঃ নেই) জাগানিয়ান, বুখারা উজবেকিস্তান।


হযরত ইয়াকুব চারখী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি বালফানুর, তাজিকিস্তান।


হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, কামান কাশান, সমরকন্দ, উজবেকিস্তান।


হযরত মাওলানা জাহিদ ওয়াখসী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, সমরকন্দ, উজবেকিস্তান।


হযরত খাজা দরবেশ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর সমাধি (ছবি- নেই), শাহরিসাবজ, উজবেকিস্তান।


হযরত মাওলানা খাজিগী আমকাঙ্গি রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, আমকানা, উজবেকিস্তান।


হযরত মুহাম্মদ বাকি বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর সমাধি দিল্লী, ভারত।


হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, সিরহিন্দ, পাঞ্জাব, ভারত।


হযরত মা'সুম ফারুকী সিরহিন্দী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, সিরহিন্দ, পাঞ্জাব, ভারত।


হযরত মাখদুম আদম তাত্তাবী সিন্ধী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি (ছবিঃ নেই) মাকলি, তাত্তা, সিন্ধু।


হযরত সাইফুদ্দিন সিরহিন্দী ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, সিরহিন্দ, পাঞ্জাব, ভারত।


হযরত নূর মুহাম্মদ বাদাউইনী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, দিল্লী, ভারত।


হযরত মির্জা মাজহার জানে জানান রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, খানক্বায়ে মাজহারিয়া, দিল্লী, ভারত।


হযরত গোলাম আলী দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, খানক্বায়ে মাজহারিয়া, দিল্লী, ভারত।


হযরত খালিদ বাগদাদী কুর্দী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, দামেস্ক, সিরিয়া।


হযরত আবু সাঈদ ফারুকী দেহলবী (পেছনে) রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, খানক্বায়ে মাজহারিয়া দিল্লী, ভারত।



হযরত শরীফ ইসমাঈল সুদানী, সমাধি (অজানা)।



হযরত আহমদ সাঈদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, জান্নাতুল বাকি, মদীনা মুনওয়ারা।



হযরত সাঈদ জামালুদ্দিন গুমুকী হুসাইনী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।



হযরত হাজী দুস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, মূসা জাই শরীফ, পাকিস্তান।



হযরত খাজা উসমান দামানী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, মূসা জাই শরীফ, পাকিস্তান।



হযরত সিরাজুদ্দিন নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহর সমাধি, মূসা জাই শরীফ, পাকিস্তান

তথ্যসূত্র

১. সিরাতুস সিদ্দীক - মাওলানা হাবিবুর রহমান খান শিরওয়ানী।

২. হালতে মাশাইখে নকশবন্দিয়া - মাওলানা মুহাম্মদ হাসান নকশবন্দী মুজাদ্দিদী।

৩. আক্বওয়ালে সালাফ - মাওলানা শাহ মুহাম্মদ কামরুজ্জামান।

৪. মাকতুবাতে ইমামে রব্বানি - শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহ।

৫. তাযকিরাহ খাজা বাক্বি বিল্লাহ - মাওলানা নাসিম আহমদ ফরিদী।

৬. মাকতুবাতে মা'সুম - মাওলানা নাসিম আহমদ ফরিদী।

৭. Biographies of the Naqshbandi Mujaddidi Mashaikh - Mawlana Mahbub Ahmad, Qamruz Zaman Nadwi Ilahabadi

৭. http://naqshbandi.org

৮. https://www.thesufi.com

৯. https://ghayb.com